জাতিভেদ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৫৩ ফাল্গুন

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

ঈশোপনিষদের একটি মন্ত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অতিশয় প্রিয় ছিল। মন্ত্রটি এই—

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতাভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

পরমেশ্বর কবি বলিয়াই সকল মনের নিয়ন্তা। তিনি পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ বলিয়াই ইহা সম্ভব। অনন্তকাল ধরিয়া তিনি সকলের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন।

অর্থাৎ পরমেশ্বরও কবি। তিনি কবিমাত্র নহেন। তিনি সকলের মনের নিয়ন্তা এবং সকলের সর্ববিধ অভাবের পূরণ কর্তা। সেই পরমেশ্বরের সেবক রবীন্দ্রনাথই বা কেমন করিয়া শুধু মনের নিয়ন্তা কবিমাত্র হইয়া থাকিতে পারেন। তাই তিনিও সকলের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। শুধু তাঁহার দেশবাসীর বা স্বজাতীয় লোকের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে নাই। সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের সর্বপ্রকার দুঃখেই তিনি যথাশক্তি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের মনে দিনরাত্রি এই প্রশ্ন যে, ভারতের মূলীভূত সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য সাধনা কি? সেই সাধনায় ভারত কোন্ কোন্ সম্পদ জগতকে দিতে পাবে? সেই সাধনার জন্য জগতের কাছেই বা ভারতকে কি লইতে হইবে? তিনি মনে করিতেন, ভারতের এই লেন-দেন যেদিন শুদ্ধ ও অব্যাহত হইবে সেদিন জগতের বহু দুঃখ-দুর্গতির অবসান ঘটিবে।

ভারতের এই লেন-দেন সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে তিনি একটি অখণ্ড যোগদৃষ্টির দ্বারা যুক্ত করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, বৈদিক যুগের আর্যেরা যজ্ঞের দ্বারা শুধু দেবতাদের কাছে কাম্য ফলই কামনা করেন নাই, তাঁহারা যজ্ঞের বেদিতে নানাভাবে ইষ্টকাগুলি সাজাইয়া বিশ্বের কাছে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুল প্রার্থনা যেন জানাইতে চাহিয়া গিয়াছেন। তাহার একটু ইঙ্গিত মেলে কঠোপনিষদের এই মন্ত্রে—

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা। —১, ১৫

পরে, এই কারণেই, তিনি স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যজ্ঞকথাগুলি অতিশয় প্রণিধানের সহিত পড়িতেন।

যজ্ঞকথার মধ্যে যজ্ঞ কি (১৭০ পৃঃ), বিশ্বযজ্ঞ (পৃঃ ১৬৭, ১৬৯), আদি যজ্ঞ

(পৃঃ ১৬১), যজ্ঞের ক্রমবিকাশ (৫৭ পৃঃ), যজ্ঞ ও জীবন যে অভিন্ন (১৭৬ পৃঃ) এগুলি তিনি বার বার পড়িতেন ও ভাবিতেন।

যোগদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন ভারতের সাধনা ও আদর্শ বিরাট। বৈদিক উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃত সাধক কবীর দাদূ প্রভৃতি সন্ত ও আউল প্রভৃতিদের বাণীতে ভারতের মূল সাধনার ধন সেই ঐকই বিরাট সত্যের জন্যই নানাভাবে নানাদিক হইতে ব্যাকুল অন্বেষণ। তাঁহার বিশ্বভারতী স্থাপনার মূলেও তাঁহার এই যোগদৃষ্টি। এই যোগকে জীবনে চরিতার্থ করিয়াই তিনি বিশ্বের প্রতি তাঁহার কর্তব্য পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

অনেক দিনের কথা, তখনও বিশ্বভারতী স্থাপনা হয় নাই, তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম লইয়াই আছেন। তখনই তিনি আমাকে আদেশ করিলেন মধ্যযুগে ভারতের প্রাকৃত অক্ষরজ্ঞানহীন জাতিপংক্তিহীন সাধকদের সাধনার মধ্যে সেই একই সত্য যে আগাগোড়া চলিয়াছে তাহা সকলের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিতে। শাস্ত্র ও গ্রন্থের মধ্য দিয়া যেই সংস্কৃত সাধনা দেখান যায় সেইখান হইতে তিনি আমাকে অন্য ক্ষেত্রে সরাইয়া নিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা যখন অনুভব করিলাম তখন আর তাহাতে কোনো আপত্তি করিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেন, পাণ্ডিত্য আরও বহু স্থলে আছে কিন্তু আমার এখানকার কাজের মূলে আমার একটি বিশেষ ধ্যান ও আদর্শ থাকিবে।

তবে এই "জাতিভেদ" গ্রন্থ লেখা কেন ? ইহাতেও তো অনেক শাস্ত্রীয় বিচার ও আলোচনা আছে। সেই কথাই এখানে একটু বলা দরকার।

বিশ্বের সঙ্গে ভারতের লেন-দেনের মধ্যে একটা মস্ত বাধা ভারতের জাতিভেদ। একথা কিছুদিন পূর্বে বলিলে এদেশে হয়তো কেহ ক্ষমা করিতেন না; কিন্তু এখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও নানা দুর্গতিতে ঘা খাইয়া সকলে বুঝিয়াছেন জাতিভেদ আমাদের একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সেইজন্য অনেক বর্ণাশ্রমসমর্থনকারীদের মতামতও ক্রমশঃ একেবারে বদলাইতে বসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, "এই জাতিভেদের দরুন ভারতের অধিকাংশ লোক তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্বমানবকে দিয়া যাইতে পারে নাই। ভারতের সেই অধিকাংশ লোক হইল শূদ্র। নারীরাও শূদ্রের সামিল। তবু ভারতে নারী ও শূদ্রদের কিছু কিছু সম্পদের যেখানে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতেই বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের সব সম্পদ বিনা বাধায় বিকশিত হইতে পারিলে ভারতের ও জগতের রূপ বদলাইয়া যাইত। সামান্য একটু মাটির জমী পতিত থাকিলে কত দুঃখ আমরা করি, আর

এতখানি মানব-জমীন বৃথাই পড়িয়া রহিল। তখনই রামপ্রসাদের কথা মনে হয়,

মন রে, কৃষি কাজ জান না

এমন মানব-জমীন রইলো পতিত

আবাদ কল্লে ফলতো সোনা।"

"ভারতের এই নির্বাকদের পরিচয় যথাসম্ভব দেওয়া দরকার। সেই কাজ আপনাদের করিতে হইবে।"

এই সব কথার উপলক্ষ্যে তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার কাছে ভারতের সংস্কৃতির একটি দিক যেন খুলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, "আমি নৌকায় নৌকায় বহু দিন কাটাইয়াছি। যেখানে দুই নদীর মোহনা, সেখানে যদি দুই নদীর জলের দুই রকম রঙ হয় তবে বহু দূর পর্যন্ত দুই ধারার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আমি চিরদিন আগ্রহ সহকারে তাহা লক্ষ্য করিতাম।"

"ভারতের সংস্কৃতিতেও আর্য ও আর্যেতর দুই ধারারই দুই রঙ দেখা যায়। দুইয়েরই নিজ নিজ মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। আর্যেরা প্রধানত জ্ঞানপন্থী, আর্যেতরেরা ভাবপন্থী। ভক্তি পূজা এই সবই দ্রাবিড়দের কাছে পাওয়া সম্পদ।"

"তবে জাতিভেদটা কাহাদের?"

"আর্যেতরদের মধ্যেই ছোঁয়াছুঁয়ি লইয়া অনেক বাচ-বিচার। দক্ষিণেই জাতি-ভেদের প্রকোপ প্রচণ্ড। আর্যেরা চিরদিন অদ্বৈত-অভেদকেই বড়ো বলিয়া জানেন। তাঁহাদের কথা জীবই তো শিব (স্কন্দ উ, ৬; ১০)। তাঁহাদের কথায় আরও দেখি,

অভেদদর্শনং জ্ঞানম্। —স্কন্দ, উ, ১১

পণ্ডিতেরা সর্বত্র যে সমদৃষ্টির দ্বারা দেখেন সেই কথাই গীতায় পাই। আর্যেরা বলেন,

পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ —গীতা, ৫, ১৮

গীতা তাহার পরে আবার বলিলেন, যাঁহারা যোগযুক্তাত্মা তাঁহারা সর্বত্র সমদৃষ্টির দ্বারাই দেখেন।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ —গীতা, ৬, ২৯

ভগবানকে পাইতে হইলে সর্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্বভূতহিতে রত হইতে হইবে।

সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ॥ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ —গীতা, ১২, ৪

ভগবানের কথা ছাড়িয়া দিলেও আর্যঋষিদের মতে যদি কেহ এই লোকে বসিয়াই সকল সৃষ্টিকে পাইতে চায় তবে তাহার মন সাম্যে স্থির হওয়া চাই।

ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ॥ —গীতা, ৫, ১৯

এই সব দেখিয়া মনে হয় জাতিভেদটা আর্যদের নয়। আর্যপূর্ব জাতিদের কাছেই ভারতে আসিয়া আর্যেরা জাতিভেদটি পাইলেন। আর্যদের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক যুগে খুব বেশি জাতিভেদ ছিল না।"

এই সব বিষয়ে প্রায়ই আমাদের অনেক কথাবার্তা হইত। অনেক কাল পরে একদিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যজ্ঞকথার মধ্যে তিনি আপন কথার সায় পাইয়া তাহা আমাকে দেখাইলেন, আর্যেরা আপনাদিগকে দ্বিজ ও আশ্রিত অনার্যদের শূদ্র বলিতেন (যজ্ঞকথা, ১ পৃঃ)। ক্রমে আচারভেদে ও বৃত্তিভেদে দ্বিজদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন ভাগ কল্পিত হইল। তবে বেদপন্থী সকলেই আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন। "ইতিহাসে দেখিতে পাই বহু অনার্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।" (ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, পৃঃ ২)।

বেদপন্থী "সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিনের যে কোনো বর্ণেরই হউক, অথবা যে কোনো মিশ্র বর্ণেরই হউক, সে-ই দ্বিজ। যে একবার নৈসর্গিক মানবজন্ম পাইয়াছে; আর একবার বেদবিদ্যালাভে সংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া পূত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম, নূতন সমাজিক জন্ম পাইয়াছে সেই ব্যক্তিই দ্বিজ।... সমুদয় বেদ-বিদ্যায়, ষোল আনা কর্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে, ইহাদের সকলেরই ষোল আনা অধিকার জন্মিয়াছে। সেই অধিকারে কেহ তাহাদের বঞ্চিত করিতে পারে না।" (ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, পৃঃ ৭)

"শ্রৌত কর্মের অধিকাংশই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। খুব সম্ভব, বৌদ্ধবিপ্লব এজন্য দায়ী। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী, বৈদিক কর্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন।" (ঐ, ২১ পৃঃ)

"ব্রাহ্মণেরাও অনেক সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা লইয়া প্রাচীন কালে বহু হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৫শ অধ্যায়টি পড়িয়া দেখা উচিত।" (ঐ, ৭১-৭২ পৃঃ)

স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয়েও দেখি, "ঋষিদের বংশাবলীর পরিচয় দ্বারা আর একটি উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, প্রজাপতিদের দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইলেন। পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় আখ্যা ধারণ করিলেন।" (পৃঃ ৯২-৯৩)

তীর্থগুরুদের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। গয়ার গয়ালী আর মথুরায় চৌবেরা শুধু নিজ তীর্থেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত (পৃঃ ৪১০)। কাশীর গঙ্গাপুত্রের কন্যার গর্ভে যুগী জাতির উৎপত্তি (পৃঃ ৬৫৭)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রধান কাজ ছিল বৈদিক যজ্ঞ কথার মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া। জাতিভেদ বিষয়ে দুই একটা কথা তিনি বাধ্য হইয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের যজ্ঞকথা দেখিবার বহু পূর্বেই আমাকে জাতিভেদ বিষয়ে কবিগুরু ভালো করিয়া আলোচনা করিতে ও লিখিতে আদেশ করেন।

আমি বলিয়াছিলাম, আমি আপনাকে শাস্ত্র ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিব। তবে বক্তব্য কথা আপনিই বলিবেন। তিনি রাজি হন নাই। কারণ, তাঁহার হাতে আরও বহু কাজ ছিল। অগত্যা আমি কতকটা কাজ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দিলাম। সেই লেখাটা দেখিতে দেখিতে তিনি মাঝে মাঝে কিছু কিছু মন্তব্য করিলেন। ভাবিয়াছিলাম, তিনি সময়ান্তরে তাহাতে কিছু কিছু লিখিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা আর হয় নাই। তাই এখন ভূমিকা স্বরূপে সেই আগের লেখাটিই এই খানেই দেওয়া হইল। তাঁহার মন্তব্যগুলি যতটা মনে আছে তাহার মাঝে মাঝে দিলাম।

এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরেও বার বার বলিয়াছেন, "আর্য-আর্যেতর দুই ধারাতেই উদার ও গোঁড়া এই দুই রকম মনোবৃত্তিই একই সঙ্গে সমাজজীবনে দেখা যায়। বেদের মধ্যেও এই দুই ধারাই দেখি, পুরাণেও দেখি। মহাভারতেও এই দুই ধারাই দেখা যায়। তাই জাতিভেদ ও শূদ্রদের বিষয়ে একদল খুব কঠিন শাসন কায়েম রাখিতে চান। বিশেষতঃ স্বার্থের যখন তাহা অনুকূল। স্বার্থের মলিনতাটুকু ঘুচাইবার জন্য তাঁহারা তাহাকে ধর্ম-অধিকার-লোকস্থিতি প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। এখনো যেমন আমাদের দেশের বিষয়ে একদল গোঁড়া ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা ক্রমাগত সকলকে চাপিয়াই রাখিতে চান এবং তাহাতে জগতের সুখ শান্তি law and order প্রভৃতির দোহাই দেন। আসলে এই সব বড়ো কথার তলে রহিয়াছে তাঁহাদের স্বার্থ। সেই কুৎসিত বস্তুটাকে তাঁহারা ভদ্র বেশভূষায় চাপা দিয়া চিরকাল ভারতকে শোষণ করিতে চান।"

"ভারতীয় শাস্ত্রেও একদল আছেন যাঁহারা উদার। তাঁহারা নিজেদের বা দল-বিশেষের স্বার্থ না দেখিয়া উৎপীড়িতদের ন্যায্য দাবিই মানিতে চান। কাজেই শাস্ত্রে মাঝে মাঝে শূদ্রদের উপর দারুণ কঠোর বিধিও দেখি, উদার বিধিও দেখি। আবার দাসীপুত্র বিদুর প্রভৃতির মত মহাত্মাও দেখি। বিদুরের কথাটা আমাদের

ভালো করিয়া জানা উচিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন, দাসীপুত্র বলিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে পারে এমন সাহস কাহার ?"

"এখনকার দিনেও আমাদের সমাজে উদার ও অনুদার দুই ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে। তবে কেন যেন মনে হয় দিনে দিনে উদার ধারাটি ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইংরাজী শিক্ষায় দেখা যায় বরং আমাদের গোঁড়ামি আরও বাড়িতেছে। ইংরাজেরা রক্ষণশীল জাতি, তাঁহাদের স্পর্শে কেহ বা সাহেব অর্থাৎ আমাদের হিসাবে অনাচারী বনিয়া যায়, আর কেহ বা আমাদেরই সমাজের বিধিতে গোঁড়া বনিয়া যায়। তাই ইংরাজী পড়া ইংরাজের চাকুরিতে সমৃদ্ধ পয়সাওয়ালা পণ্ডিতদের চেয়ে খাঁটি সংস্কৃত পড়া বিত্তহীন পণ্ডিতের দল উদার। রামমোহন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দয়ানন্দ স্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির দল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতও ছিলেন না। সর্ববিধ উদার চেষ্টায় ইঁহাদের দলই অগ্রণী।"*

"গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা যখন শূদ্র ও তথাকথিত অন্ত্যজদের বিচার করেন তখন যেন ভাবিয়া দেখেন ইংরাজেরা তাঁহাদের কি ভাবেন ? এইসব ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের কাছে অস্পৃশ্য শূদ্র মাত্র। শূদ্রাদির কল্যাণার্থই তাঁহারা এইরূপ করেন এই ওজুহাত ব্রাহ্মণেরা যখন দেখান তখন যেন তাঁহারা মনে রাখেন ইংরাজেরও এই একই যুক্তি। এইভাবেই তাঁহারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছলতা বজায় রাখিতেছেন এই কথাই তাঁহারাও বলেন। কাজেই সেই হিসাবে ব্রাহ্মণ ও ইংরাজদের একই পন্থা।"

"অবশ্য দেখা গিয়াছে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে স্বীকার করিলেও, শূদ্র কিন্তু বাগ্‌দীকে স্বীকার করিবে না। বাগ্‌দী ডোমকে, ডোম হাড়িকে, হাড়ি মুচিকে লইবে না। নমঃশূদ্রেরা ঋষিদের ছোঁয়া জলও খায় না। অথচ উচ্চতর বর্ণদের দোষ তাহারা দেখাইতে চায়। এইরূপ-মনোবৃত্তি আমাদেরও যে নাই তাহা নহে। তবে সর্বত্রই ইহা অন্যায়।"

বিশ্বভারতী স্থাপনার অনেক পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবিগুরু বলিলেন—

"যখন নমঃশূদ্র, ছুতার, জেলে, মুচি, ভুইমালি প্রভৃতি কুলে উৎপন্ন বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমাদের মনে হয় এমন সবকথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইতাম। ইহাই খাঁটি, শাশ্বত ও সার্বভৌম গণসাহিত্য। আধুনিক এদেশী কৃত্রিম

* মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায় তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দল হইতে খাঁটি মৌলবীরা উদার। খাঁটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত উদার লোক বিলাতে-শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে দুর্লভ।

গণসাহিত্যগুলি তো বিদেশের উচ্ছিষ্ট ও অধম অনুকরণমাত্র। আমাদের দেশের এইসব প্রাকৃত ভক্তদের বাণী সংগ্রহ করিতে হইবে।"

"সামর্থ্য থাকিলে এই কাজে আমিই হাত দিতাম। কিন্তু আপনারা এইসব কাজ একদিন সম্পন্ন করিবেন এই দাবি না জানাইয়া পারি না। এইসব কুলহীন-দের অবজ্ঞা করিয়া সকলে জাতিভেদে ভারতের যে কত সম্পদ চাপা দিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাতেই যে ভারতের আজ এমন দুর্গতি এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই।"

"ভারতীয় চৌষট্টি কলার অনেক কলাই আর্যপূর্বসংস্কৃতির। গান বাদ্যকে তো পুরাণে নারী ও শূদ্রদের বিদ্যাই বলিয়াছে। এই বিষয়েও আপনাদের কাছে আমাদের দাবি আছে। প্রাচীন ভারতে নারীদের অধিকার ও সাধনার কথাও আমাদের জানা দরকার।"

"বৈদিক ঋষিরা ইষ্টকার ভাষার দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মায়া আজ্‌তেগ সংস্কৃতির লক্ষণগুলির মতো, আজ সে সংস্কৃতি নির্বাক্ হইয়া আছে। ইহাদের ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন?"

"তীর্থ ও কুম্ভ প্রভৃতি মেলাগুলিও আর্যেতর সংস্কৃতির দান। এগুলির ইতিহাস ও পরিণতি দেখাইতে পারিলে দেশের একটা বড়ো কাজ হয়। এইসব কাজের জন্য দাবি জানাইতে পারি কি?"

"এইসব তীর্থের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমাদের দেশে সাধুসন্ন্যাসীদের মঠে ও সম্প্রদায়ে একটা গঠনরীতি ও বিধি (constitution) আছে। তাহা ভালো করিয়া আলোচনা করিলে বিলাতি গণবাদ হইতে ভালো অনেক রকম পথ আমরা পাইতাম। সেই কাজে আপনারা হাত দেন না কেন? স্বদেশী যুগে যখন 'স্বদেশী সমাজ'-এর জন্য খুঁটিনাটি সব বিধিবিধান রচনা করিয়াছিলাম তখন একবার এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিধিগুলির কথা মনে হইয়াছিল। কিন্তু এইসব জিনিস সংগ্রহের কাজ তো আমার নহে। আমার রচিত সেই বিধিবিধানগুলি আমি যাঁহাদের দিয়াছিলাম তাঁহারা এক সময় পুলিশের সার্চের ভয়ে সেগুলি যে কোথায় কি ভাবে সরাইয়া ফেলিয়াছেন কি নষ্ট করিয়াছেন তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। ভারতের গ্রামে গ্রামে যে পঞ্চায়তী প্রথা, তাহার একটা আগাগোড়া রূপ পাইলে ভারতের সত্যকার গণ-রাষ্ট্রনীতির পরিচয় পাওয়া যাইত।"

"আমার নিজের একটা বিষয় লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা মহাভারতের মর্মকথা। মহাভারতের মহাযুদ্ধের দারুণ দুর্গতি যে কতই শোচনীয় তাহা আমার মনেই

রহিয়া গেল। আগে সময় পাই নাই। এখন আর পারিয়া উঠিতেছি না।"

জীবনের শেষভাগে অনেক সময় তিনি বলিতেন, "আমি যদিও চলিলাম আমার বিশ্বভারতী তো রহিল। যে কাজ নিজে করিতে না পারিলাম, আশা রহিল তাহা একদিন এই বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়াই বাহির হইবে। তাই ইহাকে আমি কেবলমাত্র একটি পণ্ডিতী প্রতিষ্ঠান করিতে চাই নাই। ভারতের মর্মগত সত্য যাহাতে ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া ওঠে তাহাই আমার কাম্য। সেই সত্য অনেক সময় পণ্ডিতেরা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের সন্ত সাধকেরা ও আউল বাউল প্রভৃতি নিরক্ষরের দল বরং সেই মর্মগত সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। আমার বড়দাদার মুখে প্রায়ই একটি বাউল গানে শুনিতাম—

গোলমালে মাল মিশে আছে,
গোল ছেড়ে মাল্ লও রে বেছে।
বালি চিনি মিশলে পরে,
কেবা তারে আলগ করে,
(সেথা) মত্ত হস্তী হার মেনে যায়
চিউটি তার মরম পেয়েছে।"

"ভারতের সেই চিউটি অর্থাৎ ক্ষুদ্র পিঁপড়েদের মরমকথা যেন মত্ত হস্তীদের পদতলে চাপা না পড়ে। নহিলে এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে আমি এত চেষ্টা করিয়া তাহাদেরই একটা অক্ষম অনুকরণের প্রয়াস করিতাম না। শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যকে আমি সম্মান করি, কিন্তু 'এহো বাহ্য'। 'আগে কহো'র ভার যেন বিশ্বভারতী লইতে পারে এই আমার কামনা। আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। উত্তরকালের জন্য এই সব দায় রাখিয়া গেলাম। আশা করি আমার আন্তরিক ব্যাকুল বেদনার কথা পরবর্তীরা ভুলিবেন না।"

আমরা তো পরবর্তী হইয়াও তাঁহার সাধনা ও কামনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ। ইষ্টকার মধ্যে বৈদিক আর্যেরা কি বলিতে চাহিয়াছেন সে কথা আমরা ভুলিয়াছি। তীর্থে তীর্থে কেমন করিয়া আর্যেতর সংস্কৃতি চলিয়া আসিয়াছে তাহার খবরও এখন আমরা জানি না। ভারতের নানা মঠের ও নানা স্থানের পঞ্চায়তী প্রথার বৃত্তান্ত অল্পই জানি। মহাভারতের মর্মকথাটি কবিগুরুই বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাহার কি বুঝিব? আমরা মহাভারত লইয়া বাহিরে বাহিরে চোখ বুলাইতে মাত্র পারি। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় তাহা 'এহো বাহ্য' মাত্র।

যাহা হউক ভারতীয় জাতিভেদ সম্বন্ধে পুথিপত্র দেখিয়া একটুখানি লেখা তাঁহাকে

দেখাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি সম্মতিই জানাইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি যাহা মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা দিয়া সেই লেখাটুকু এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে "জাতিভেদের পুরাবৃত্ত" নামে বাহির করিলাম।

সেই লেখাটুকু আগাগোড়া দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এই সবই তো শাস্ত্রের কথা। সমাজ তো পুরাপুরি শাস্ত্রের অনুশাসনমতো চলে না। বাংলাদেশের সামাজিক জীবন হইতে জাতি ও কুলের কথা কিছু বলিতে পারেন? হয়তো বাংলার সমাজশাস্ত্র আলোচনা করিলেও অনেকখানি জীবন ও তখনকার সচলতার কথা বলিতে পারিবেন।"

তাঁহার এই কথায় বিপদে পড়িলাম। সামাজিক ইতিহাস বা কুলশাস্ত্র তো তেমন করিয়া কখনো আলোচনা করি নাই। অবশেষে কিছু কুলশাস্ত্র এবং বিশেষ করিয়া স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থখানার শরণ লইমাম। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃতির লোক। পুরাতন বহু কুলশাস্ত্র লইয়া তিনি অনেক আলোচনা করিয়া প্রাচীনভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। বেদে, পুরাণে বা কুলশাস্ত্রে বহু কলুষ ও দুষ্কৃতির খবর আছে। আলোচনা করিতে হইলে যতই দুঃখ হউক তবু তাহা বলিতেই হইবে। দৈহিক ক্লেদ মলের দিকে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য কলুষিত হইয়া ওঠে তেমনি সামাজিক দোষ ত্রুটির দিকে অন্ধ হইয়া থাকিলে সামাজিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কলুষ ও দুষ্কৃতি সর্বত্রই আছে। অপরেরও আছে, অন্য দেশেও আছে, হয়ত আরও বেশি আছে। তাঁহারা যদি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজশাস্ত্র রচনা করিতেন তবে তাহা বুঝা যাইত। হয়তো সে সব শাস্ত্র থাকিতেও পারে, তাহার খবর তো রাখি না। যাহা হউক আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজের ও অতি প্রাচীন বেদপুরাণের যুগের অনেক দুষ্কৃতির আলোচনা বাধ্য হইয়া করিতে হইল। শাস্ত্রে যতটুকু দোষের কথা আছে তাহার চেয়ে অনেক বেশি দোষ নিশ্চয়ই সত্যকার জীবনে ছিল। মানুষে তাহার আপন অপরাধের আর কতটুকু প্রকাশ করিয়া বলে। যাহা বলে তাহার চেয়ে তাহার না বলা পাপের পরিমাণ যে আরও বেশি সে কথা সকলেই জানেন।

কুলশাস্ত্র লইয়া দেখি বাংলাদেশের তখনকার সমাজেও বহু দুষ্কৃতির কথা তাহাতে আছে। তাহা লইয়া বাগ্‌বিস্তার করিতে মন চাহে না। অথচ তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে না। তাই শাস্ত্রালোচনার জন্য বাধ্য হইয়া সেইসব দোষের উল্লেখ মাত্র করিয়া আর একটু অংশ লিখিলাম। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে "জাতিভেদ ও কুলশাস্ত্র" নামে তাহা বাহির হইল।

এই অংশটুকু যখন তাঁহাকে দেখাইতে গেলাম, তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ও শরীর জীর্ণ তাই তিনি আর তাহা পড়িতে পারিলেন না। মুখে মুখে তাঁহাকে আমার সংকোচের কথাটাও একটু বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমাদের দিনগত জীবনে আমরা খাওয়া-দাওয়ায় চলা-ফেরায় কত দোষ ত্রুটিই করি। তবু আমাদের প্রাণশক্তির জোরে সেইসব দোষ ত্রুটির উপরে আমরা জয়ী হইয়া চলিতেছি। তেমনি সমাজজীবনেও সর্বত্রই বহু স্খলন ঘটে। সমাজের প্রাণশক্তি আছে বলিয়াই এইসব জয় করিয়া চিরদিন মানুষ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কথা যদি আমরা না ভুলি, তবে এইসব আলোচনায় কোনো ক্ষতি নাই।"

জাতিভেদের আলোচনা সম্বন্ধে তাঁহার আদেশটুকু তাঁহার জীবদ্দশায় পালন করিতে পারি নাই। এতদিনে কোনো মতে সমাপ্ত করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিতেছি। শ্রদ্ধাপ্রণত আমার এই পূজাঞ্জলি তাঁহারই মহনীয় স্মৃতিতে আজ উৎসর্গ করিলাম।

বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী
পৌষ উৎসব, ১৩৫৩

ক্ষিতিমোহন সেন

সূচীপত্র

জাতিভেদ

জাতিভেদ ভারতে ও বাহিরে

অন্য সকলের অপেক্ষা নিজের মান ও গৌরব অধিক হউক এই আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে। বংশগৌরব প্রভৃতি নানাভাবে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। বংশগৌরবও একটি প্রধান পথ হওয়ায় সকল দেশেই এই বংশগৌরব লাভ করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অশেষবিধ প্রয়াস দেখা যায়। এইভাবেই নানা দেশে নানারকমের বংশগত কৌলীন্য বা জাতিভেদের উৎপত্তি।

মিশর দেশ অতি প্রাচীন সভ্যতার স্থান। এখানে পুরাকালে ভূম্যধিকারী, শ্রমিক ও ক্রীতদাস এই তিন শ্রেণী ছিল। ক্রমে সেখানে যোদ্ধা ও পুরোহিতের উচ্চ স্থান ও আধিপত্য হইল ও তার নিচে হইল শিল্পী ও ক্রীতদাসদের স্থান। যোদ্ধা ও পুরোহিতদিগের মধ্যেই কেহ কেহ লেখক হইলেন।

এই সব দেখিয়া ১৮২০ সালে কেরী সাহেব তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় অনুমান করিয়াছেন যে মিশরীয় সভ্যতা ভারত হইতে আনীত। Bigand তাঁহার *Ancient and Modern History*-তে এই চারি জাতি দেখিয়াও এই একই কথা বলেন (পৃ. ৬৭)। অন্য দেশে শ্রেণীভেদ থাকিলেও মিশরে এবং ভারতে তাহা ধর্মসম্মত (পৃ. ৬৯), তাই এই দুই সভ্যতার মধ্যে সম্বন্ধ আছে[১]। নানা প্রমাণে অনেকে মনে করেন দ্রাবিড়জাতির ও দ্রবিড় সভ্যতার সঙ্গে মিশরের যোগ আছে। অন্তত মিশর আর্য নহে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তবে কি এই জাতিভেদ দ্রাবিড়জাতিরই বিশেষত্ব? অন্তত অন্য কোনো আর্যদেশে এইভাবে তো জাতিভেদ দেখা যায় না।

চীনদেশে, ভদ্রলোক কৃষক শিল্পী ও বণিক এই চারি শ্রেণী দেখা যাইত। বণিকদের স্থান ছিল সবার নিচে। জাপানেও এই চারি শ্রেণী; তাহা ছাড়া Eta ও Hinin-রা ছিল অন্ত্যজদের মত। তবে ইহাদের মধ্যে একেবারে মেলা-মেশা বা পরিবর্তন কি খাওয়াদাওয়া অথবা ছোঁয়াছুঁই অসম্ভব ছিল না।

সে-সব দেখা যায় পৃথিবীর নানা অসভ্য দেশে। যে-দেশের লোক যত আদিম অবস্থায় আছে ততই তাহাদের ছোঁয়াছুঁইর দারুণ বিচার। স্পর্শের দ্বারা নিজেদের শক্তিবিশেষ হারাইয়া যাইতে পারে, অন্যের কাছে হইতে নানা অমঙ্গল আসিতে

১ Capt. N. A. Willard, *Music of Hindusthan, intro :* p. 18

পারে এই রকম সব ভাব। ইহাকেই প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপগুলিতে অসভ্য জাতির লোকেরা Mana বলিত। এখন সব দেশের পণ্ডিতেরা এই Mana (ম্যানা) কথাটিই ব্যবহার করেন[১]। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় Mana সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তাহা প্রত্যেকের দেখা উচিত।

Encyclopædia of Religion and Ethics-এর 'Mana' নামক কথাটির সূচী দেখিলে নানাদেশের এই স্পর্শাস্পর্শবিচারের খবর মেলে। আফ্রিকা, ফিজি, প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি নানা স্থানেই এই বিচার আছে। বোর্নিওতে গুটিতিনেক শ্রেণীও আছে। মেক্সিকো দেশেও তিন জাতি। শুদ্ধ স্পেনীয়রা উত্তম, মিশ্রিতরা মধ্যম, আদিমজাতীয়রা অধম।

সেমেটিকরা যদিও গর্ব করেন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না তবু ইহুদিদের মধ্যে নানারকমের আভিজাত্য দেখা যায়। তাহাতেই বুঝা যায় তাঁহাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। আরবদেশের দক্ষিণভাগে শিল্পীরাই অন্ত্যজ। তাহাদের বাস গ্রাম বা নগরের বাহিরে। ফেদারম্যান সাহেব বলেন, তাহাদের অপেক্ষাও হতভাগা অন্ত্যজ সে-দেশে আছে, তাহারা নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

আর্যরা প্রায় সব দেশেই এই সব বিষয়ে একটু উদারচিত্ত। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কম মানেন। রোমে যদিও অভিজাত ও প্রাকৃত (অনভিজাত) এই দুই শ্রেণী ছিল তবু তাহাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল না। পরাজিত শত্রুরা অবশ্য দাস ছিল। ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাকসন যুগেও ঠিক এই ব্যবস্থাই ছিল। গ্রীসে ও প্রাচীন জার্মানিতে অভিজাতগণের একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল।

পারসী আচার্য ধল্লা বলেন ইরানদেশীয়দের মধ্যেও চতুর্বর্ণ ছিল, যদিও এক বর্ণের লোক গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণান্তরভুক্ত হইতে পারিত। আবার কেহ কেহ বলেন জেন্দাবেস্তাতে তিন রকমের বর্ণ দেখা যায়। এক দল করেন মৃগয়া, আর এক দল করেন পশুপালন, তৃতীয় দল করেন কৃষিকর্ম[২]। কিন্তু এই কথা অন্যান্য পারসিক আচার্যেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন পারসিকদের মধ্যে জাতিভেদ কখনই ছিল না। হয়তো ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধল্লা মহাশয়

১ *Encyclopædia of Religion and Ethics* VIII, পৃ. ৩৭৫

২ *Tribes and Castes of the N. W. P* and Frontier Provinces, vol. I, XVI

নিজেদের সামান্য সামান্য ভেদকেই বর্ণভেদরূপে কল্পনা করিয়াছেন। পারসীরা যখন স্বদেশে নির্যাতনবশত ভারতে আসেন তখন গুজরাতে নামিবার সময় রানা যদুর নিকট নিজেদের পরিচয় দেন। এই দেশে আশ্রয় পাইবার জন্য এদেশের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মের যতটা সম্ভব মিল তাহা দেখাইবার চেষ্টাই তখন তাঁহারা করিয়াছেন। যদু রানার কাছে তাঁহাদের প্রদত্ত পরিচয়-শ্লোকগুলিই তাহার সাক্ষী। তাহার মধ্যেও জাতিভেদের কথা নাই। চাতুর্বর্ণ্য যদি তখন তাঁহাদের মধ্যে থাকিত, তবে এমন একটা সময়ে বর্ণাশ্রমবাদী রাজার রাজ্যে প্রবেশ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাহা গোপন করিবার কোনো হেতু থাকিতে পারে না।

ভারতের জাতিভেদের স্বরূপ একটু বিভিন্ন, ঠিক ভারতীয় ভিন্ন ইহা ঠিকমত বুঝিতে পারে না। এই জাতিভেদ এখন জাতিগত। গুণকর্মবশত বিভাগের কথা শাস্ত্রে শোনা গেলেও এখন তাহা আর নাই। ভারতের বাহিরেও তো বহু আর্যজাতি আছে। কিন্তু ভারতের মত ঠিক এইরকম জাতিভেদ নাই। একমাত্র ভারতবর্ষের আর্যদের মধ্যে এই জাতিভেদটা আসিল কিরূপে?

এই বিষয়েরই আলোচনা এখানে যথাসাধ্য করিবার চেষ্টা করা যাইবে। আমরা সাধারণত প্রাচীন শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির উপরই আমাদের আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। দেশপ্রচলিত প্রথা ও আচারের আলোচনাও বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনায় সব সিদ্ধান্তই যে পরম ও চরম সত্য হইবে তাহা না-ও হইতে পারে। ভুলভ্রান্তিও থাকিতে পারে। তবু এই বিষয়ে যদি কাহারও কাহারও বিচার ও বিতর্ক জাগ্রত হয় তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

ভারতীয় জাতিভেদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ইতিপূর্বে অনেকে অনেক কাজ করিয়াছেন। আমি ঠিক সেই পথে কাজ করি নাই। তবু যখন যখন পূর্ববর্তী কাঁহারও ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তখন তাঁহাদের নাম করিয়াছি। এইরূপে কেতকর, উইলসন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রিজলী, ক্রুক প্রভৃতির সেন্সস-রিপোর্ট, ক্যাম্পবেল, ঘুরে প্রভৃতির নাম করিয়াছি। ডাক্তার *G. S. Ghurye* প্রণীত *Caste and Race in India* পুস্তকখানি খুব উপাদেয়। তাহার অন্তভাগে এই বিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞের নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাহা দেখিলে অনেকেই উপকৃত হইবেন।

২

ভারতের জাতিভেদ

ভারতে জাতিভেদের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে জাতি কথাটার একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত। জাতি জিনিসটা কি তাহা এই দেশে আমরা সবাই বুঝি। তাই বলিয়া ভাষাতে তাহার একটা সংজ্ঞানির্দেশ করা সহজ নহে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নানা ভাবে এই বিষয়টা বুঝাইতে গিয়া অনেক সময় হার মানিয়াছেন। এদেশে জাতি জন্মগত। জাতির বাহিরে বিবাহ নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পরে শবসৎকার এবং জীবিত থাকিতে আহারাদি, স্বজাতির মধ্যেই এতকাল সীমাবদ্ধ ছিল। এখন শহরে বাস, বিদেশে ভ্রমণ, হোটেল-রেস্টরাণ্ট প্রভৃতির ফলে এবং নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আহারাদিগত আচারবিচার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এদেশে উচ্চতম জাতি ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের মধ্যেও উচ্চনীচ অসংখ্য ভেদ। প্রদেশগত ভেদও গণনার অতীত। তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন্ শ্রেণী উচ্চতম তাহা বলা অসম্ভব। বহু প্রদেশের বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণই সর্বোচ্চতার দাবি করেন। নিম্নতম জাতি যে কী তাহাও বলা কঠিন। এই উভয় কোটির মধ্যে স্তরের আর অন্ত নাই।

যে-সব জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির লোকেরা ব্যবহার করেন তাহারা জল-আচরণীয় অর্থাৎ ভালো জাতি। যাহাদের দেওয়া ঘৃতপক্ক খাদ্য ও মিষ্টান্ন ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন তাহারা আরও ভালো জাতি। সাধারণত স্বশ্রেণীর লোকের হাতে ছাড়া কাহারও হাতে ভাত ডাল বা রুটি ব্রাহ্মণেরা খান না।

দক্ষিণ-ভারতে স্পর্শবিচার আরও প্রবল। সেখানে যাহাদের স্পর্শে ব্রাহ্মণেরা অশুচি হন না ও যাহাদের জল ব্রাহ্মণের আচরণীয় তাহারাই ভালো জাতি। যাহাদের জল ব্রাহ্মণীরাও আচরণ করিতে পারেন তাহারা আরও ভালো জাতি। যাহাদের স্পর্শে ও জলে ব্রাহ্মণ বিধবারও অশুচিত্ব ঘটে না তাহারা তদপেক্ষা ভালো জাতি।

নীচ জাতির জল অনাচরণীয়, তাহাদের স্পর্শে অশুচিত্ব ঘটে। যাহাদের স্পর্শে মৃৎপাত্রও অশুচি হয় তাহারা আরও নীচ জাতি। যাহাদের স্পর্শে ধাতুপাত্র পর্যন্ত অশুচি হয় তাহাদের স্থান আরও নীচ। ইহাদের অপেক্ষাও যাহাদের জাতি নীচ তাহারা মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেও মন্দির অশুচি হয়। কোনো কোনো জাতি গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিলে গোটা গ্রাম বা নগরই অশুচি হয়। এই সব বিষয়ের

বিচার শ্রীযুক্ত শ্রীধর কেতকর মহাশয় তাঁহার রচিত *The History of Caste in India* নামক পুস্তকে ভালো করিয়া করিয়াছেন (পৃ. ২৪, ২৫)।

এখনকার দিনে এই সব ছোঁয়াছুঁই ব্যাপারে অনেক স্থলে লোকের মতামতের অনেকখানি নড়চড় দেখা দিয়াছে। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে উচ্চজাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও অনেক সময় এতটা বাছবিচার পছন্দ করেন না, আর যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত নীচজাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও আর নিজেকে একেবারে হীন বা পতিত বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি নহেন এবং উচ্চপক্ষীয়দের সমকক্ষতা দাবি করেন। নীচজাতির মধ্যে এখনও কিন্তু অনেক সময়েই নীচতর জাতিকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াসটি রীতিমতই দেখা যায়।

উচ্চতর জাতীয় লোকেরা অনেকেই এখনো বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে ভালোই বলেন। স্বামী দয়ানন্দ বলেন, "ভারতের এই অসংখ্য জাতিভেদের স্থলে মাত্র চারিটি জাতি থাকুক, সেই চাতুর্বর্ণ্যও নির্ণীত হউক গুণকর্মের দ্বারা। বেদের অধিকার হইতে কোনো বর্ণ ই বঞ্চিত না হউক।"

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরোধী কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রমের বিরোধী নহেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নরসু *A Study of Caste* নামক পুস্তকে মহাত্মাজীর কিছু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন (P. 131)। তাহাতে দেখা যায় মহাত্মাজী বলেন, "Varnashrama is inherent in human nature, and Hinduism has reduced it to a science. It does attach by birth. A man cannot change his Varna by choice." অর্থাৎ, "বর্ণাশ্রম মানুষের স্বভাবনিহিত, হিন্দুধর্ম তাহাকেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণীত, ইচ্ছা করিলেও ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না।" দেখা গেল এই বর্ণভেদ জন্মগত। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বৈশ্য, শূদ্র হইতে শূদ্র উৎপন্ন। এখন এই ভেদের মূল কোথায়?

সাধারণত সকলে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তকেই (১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত) এই বর্ণভেদের মূল মনে করেন। তাহাতে দেখা যায়,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ —ঋগ্বেদ, ১০, ৯০, ১২

অর্থাৎ, "সেই প্রজাপতির মুখ হইল ব্রাহ্মণ, বাহু হইল রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ইহার উরু হইল বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে জন্মিল শূদ্র।" ইহাতে দেখা যায় জাতি লইয়াই মানুষ সৃষ্ট হইল। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ শব্দ খুবই বিরল, তাহাও জ্ঞানী বা

পুরোহিত অর্থে ব্যবহৃত। ক্ষত্রিয় শব্দও বড় একটা দেখা যায় না। বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ দেখা যায় মাত্র পুরুষসূক্তের ঐ শ্লোকটিতেই।

এখন পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অনেকটা অর্বাচীন অর্থাৎ আধুনিক। তাহাতে দেখা দেখা যায় মাত্র চারিটি বর্ণ। তাহার দ্বারা আমাদের দেশের অসংখ্য জাতিবিভাগের মীমাংসা হয় কেমন করিয়া? মুখে আমরা চাতুর্বর্ণ্য বলিলে কি হইবে? সেন্সস দেখিলে দেখা যায় জাতি তো প্রায় চারি হাজার, তাহার মধ্যেও ভেদ-বিভেদের আর অন্ত নাই।

চারি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই যে সংশয় ও মতভেদ ইহা সেই যুগেও ছিল। প্রাচীনকালেও পুরুষসূক্তের এই মত সকলে মানিয়া লইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরাণ আর এক স্থানে বলেন, "ভার্গ হইতে ভার্গভূমি পুত্র হইলেন। তাঁহা হইতেই চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তিত হইল।"

ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮, ৯

দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে জাত।

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষপ্রজাপতিঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ১, ৫

মহাভারতে দেখি আদি সৃষ্টির কথা কহিতে গিয়া জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন, "ব্রহ্মার ছয়টি মানসপুত্র, মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে এই সব প্রজা সৃষ্ট।"

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষন্মহর্ষয়ঃ।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাৎ তু ইমাঃ প্রজাঃ॥ —আদিপর্ব, ৬৫, ১০-১১

ব্রহ্মার মানসপুত্রদের কথা সকল পুরাণেই আছে। তাঁহাদের সন্ততিই তো ব্রাহ্মণেরা। ব্রহ্মার বরুণযাগের অগ্নি হইতে ভৃগুর জন্ম, তাহার পর চলিল তাঁহার সন্ততিধারা (আদিপর্ব, ৫, ৭-৮)।

গীতাতে তো দেখি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "চাতুর্বণ্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি গুণকর্মানুসারে।"

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ॥ —৪, ১৩

বিষ্ণুপুরাণের মতে গৃৎসমদের পুত্র শৌনকই চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তিত করেন।

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্তয়িতাভূৎ॥ —বিষ্ণুপুরাণ, অংশ ৪. ৮, ১০

হরিবংশও বলেন, "শুনক হইলেন গৃৎসমদের পুত্র। শুনক হইতে শৌনক নামে পরিচিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতীয় বহু পুত্র জন্মে।"

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥ -২৯ অধ্যায়, ১৫১৯-২০

এই হরিবংশেই আর একটি মতেরও উল্লেখ দেখা যায়। শিবির সন্তান রাজা বলিকে ব্রহ্মা বর দেন, "তুমি বর্ণচতুষ্টয়ের স্থাপয়িতা হইবে।"

চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ ত্বং চ স্থাপয়িতেতি হ॥ —ঐ, ৩১, ১৬৮৮

হরিবংশে আরও একটি মতের কথা জানা যায়। "অক্ষর হইতে ব্রাহ্মণেরা, ক্ষর হইতে ক্ষত্রিয়েরা, বিকার হইতে বৈশ্যেরা, ধূমবিকার হইতে শূদ্রেরা উৎপন্ন।

অক্ষরাদ্ ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রা ধূমবিকারতঃ॥—হরিবংশ, ভবিষ্য পর্ব, ২১০, ১১৮১৬

নানাপুরাণে সৃষ্টিকথা নানাভাবে বর্ণিত। এখানে সকলগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নহে। তবু আরও দুই-একটা কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদ্ একমেব তদেক্যসন্ ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ক্ষত্রম্।—১, ৪, ১১

একমাত্র এই ব্রহ্মই অগ্রে ছিলেন, একা বলিয়া তিনি বৈভবহীন ছিলেন, তাই তিনি শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন। এখানে প্রথমে ক্ষত্রিয়সৃষ্টির কথাই পাইতেছি।

মহাভারতে শান্তিপর্বে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "দেবদেব বরপ্রদ নারায়ণের বাক্যসংযমকালে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণ প্রাদুর্ভূত হইল।"

বাক্যসংযমকালে হি তস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং প্রাদুর্ভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষা বর্ণাং প্রাদুর্ভূতাঃ॥ —মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪২, ২১

তাহার পরে দেখা যায় যেহেতু ব্রাহ্মণ হইতেই অন্য তিনটি বর্ণ সৃষ্ট তাই তাহারাও ব্রাহ্মণের জ্ঞাতির স্বরূপ।

তস্মাদ্বর্ণা ঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ
সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব॥ —মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৬০, ৪৭

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন, "যেহেতু তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই যজ্ঞস্রষ্টা, তাই তাহা হইতে জাত সকল বর্ণই যজ্ঞসংযোগবশতঃ ঋজু অর্থাৎ সাধু।"

যস্মাৎ ত্রিষু বর্ণেষু ব্রাহ্মণো যজ্ঞস্রষ্টা তস্মাৎ সর্বেঽপি বর্ণা ঋজবঃ সাধবঃ এব যজ্ঞসংযোগাৎ। (তত্র টীকা)

মহর্ষি জৈমিনিও বলেন, "চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাঁহাদেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে।"

সসর্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ স চতুর্মুখঃ।
সর্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥—পদ্মপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ৩৮, ৪৪

এইজন্যই মহাভারত বলিলেন, "পূর্বে জগতে একমাত্র বর্ণ ছিল, তারপর কর্মক্রিয়া-বিশেষবশতঃ চতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল।"

একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
কর্ম-ক্রিয়াবিশেষেণ চতুর্বর্ণং প্রতিষ্ঠিতম্॥

শান্তিপর্বের ১৮৮ অধ্যায়ে দেখা যায় মহর্ষি ভৃগুরও বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একই মত। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে কয়েকটি অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে মনুর নানা পুত্র হইতেই নানা জাতির উৎপত্তি।

বিভিন্ন প্রদেশের পুরাণে আবার জাতিসৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের কথা পাওয়া যায়। মহিশূর প্রদেশের একটি পুরাণ কথাতে পাই যে বৈশ্যবংশ নিজপাপে ব্রহ্মার শাপে নির্মূল হইয়া যায়। পরে বল্কল ঋষি কুশনির্মিত সহস্র মানুষকে প্রাণ দান করিয়া সহস্র গোত্রের বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন।[১] কাজেই মানুষ ও জাতি সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে অসংখ্য মত রহিয়াছে। ভাগবতেও দেখিতে পাই,

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একাগ্নির্বর্ণ এব চ॥ —৯, ১৪, ৪৮

শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যানুসারে অর্থ পাই যে পূর্বে সর্ববাঙ্ময় প্রণবই একমাত্র ছিল বেদ। একমাত্র দেবতা ছিলেন নারায়ণ, আর কেহ নহেন। একমাত্র লৌকিক অগ্নিই ছিলেন অগ্নি, এবং একমাত্র বর্ণ ছিল যাহার নাম হংস।

কারণ পুরাণেও আছে,

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতম্।

আদিতে সত্যযুগে মানুষের হংস নামেই একমাত্র জাতি ছিল।

সেই সত্যযুগে পাপপুণ্যের সৃষ্টি হয় নাই, তখন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা হয় নাই, কাজেই তখন বর্ণসঙ্করও ছিল না।

অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ॥ —বায়ুপুরাণ, ৮, ৬০

১ Nanjun Dayya Ananta Krishna Iyer, *Mysore Tribes and Castes,* Vol. IV. p. 403

ব্রাহ্মণাদি জাতির পরিচয়

শান্তিপর্বে দেখা যায় দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। ভৃগু সেই সব প্রশ্নের উত্তরে যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে যেন বেদের এই চাতুর্বর্ণ্যের মত চলে না।

ভরদ্বাজকে বুঝাইতে গিয়া মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত, শূদ্রগণের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।"[১]

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥ —শান্তি, ১৮৮, ৫

ভরদ্বাজ বলিলেন, "তাই যদি হয়, অর্থাৎ যদি বর্ণের দ্বারাই বর্ণভেদ বুঝা যায় তবে তো সকল বর্ণের মধ্যেই বর্ণসঙ্কর দেখা যায়।"

চাতুর্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥ —ঐ, ৬

"আমাদের মধ্যে সকলেই দেখি সমানভাবে কাম ক্রোধ ভয় লোভ শোক চিন্তা ক্ষুধা শ্রমের দ্বারা পরাভূত, তবে বর্ণভেদ হয় কিসে?"

কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥ —ঐ, ৭

"স্বেদ মূত্র পুরীষ শ্লেষ্মা পিত্ত ও শোণিত সকল শরীরেই সমানভাবে ক্ষরিত হইতেছে, তবে বর্ণভেদ হয় কিসে?"

স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥ —ঐ, ৮

"তাহার পর অশেষবিধ স্থাবর ও অশেষ জাতির জঙ্গম, তাহাদের বর্ণের বিভিন্নতা কিসে বিনিশ্চিত হইবে?"

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥ —ঐ, ৯

তাই যুক্তিযুক্ত কথা ভৃগু বলিলেন, সৃষ্টিকর্তার কোনো দোষ নাই। "বর্ণসকলের কোনো তারতম্য নাই, ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময়ই করিয়াছিলেন, পরে কর্মানুসারে সকলে নানাবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

১ মহাভারত, বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ —শান্তি, ১৮৮, ১০

"যে-সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয় তীক্ষ্ণস্বভাব ক্রোধন প্রিয়সাহস স্বধর্মত্যাগী রাজসিক ও লোহিতবর্ণ, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইলেন।

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতা॥ —ঐ, ১১

"গোরক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে-সকল ব্রাহ্মণ কৃষিকর্মোপজীবী হইলেন সেই সব স্বধর্মত্যাগী পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্য হইলেন।"

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ —ঐ, ১২

"যে-সকল ব্রাহ্মণ হিংসানৃতপ্রিয় লুব্ধ সর্বকর্মোপজীবী শৌচপরিভ্রষ্ট সেই সব কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইলেন।"

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ —ঐ, ১৩

"এই সকল কর্মদ্বারা পৃথক্‌কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তর গমন করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের পক্ষে যজ্ঞক্রিয়া নিত্যবিহিত ধর্ম, তাহা কখনই নিষিদ্ধ নহে।

ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥ —ঐ, ১৪

"এই চারিবর্ণেরই বেদে অধিকার, ইহাই ব্রহ্মার দ্বারা পূর্বে বিহিত, লোভবশতই লোকে অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥ —ঐ, ১৫

জাতি সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ উদার মত দেখা গেলেও বহুতর স্থান মহাভারতে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে orthodox অর্থাৎ গোঁড়া মতই বেশি। তবু মহাভারতের মধ্যে যে-সব প্রাচীন উদারতার নিদর্শন পাই তাহা আজিকার যুক্তিপ্রধান যুগেও বিস্ময়কর। যদিও এই দেশে ক্রমে ক্রমে গোঁড়া মতের দ্বারা এই সব মত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তবু মহাভারত ও পুরাণাদির মধ্যে স্থানে স্থানে যে-সব উদার মতবাদ রহিয়া গিয়াছে তাহার দ্বারাই আমাদের বিচার অগ্রসর হইতে পারিবে। মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান ভৃগুকে প্রশ্ন করিতেছেন,

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্‌ব্রূহি বদতাং বর॥ —শান্তিপর্ব, ১৮৯, ১

"হে দ্বিজোত্তম, হে বিপ্রর্ষে, হে বক্তৃবর, ব্রাহ্মণ হয় কেমন করিয়া? কেমন করিয়া বা হয় ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র তাহা বলুন।" ভৃগু উত্তর করিলেন, "যিনি যথাবিধি সংস্কৃত শুচি বেদাধ্যয়নরত ষট্‌কর্মান্বিত আচারশীল বিঘসাশী[1] গুরুপ্রিয় নিত্যব্রতী সত্যপরায়ণ তিনিই ব্রাহ্মণ, যাঁহাতে সত্য দান অদ্রোহ মৈত্রী লজ্জা ক্ষমা ও তপশ্চর্য্যা বিরাজিত তিনিই ব্রাহ্মণ।"

জাতকর্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্মস্ববস্থিতঃ ॥ ২
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ক্ষমা।[2]
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪ —শান্তিপর্ব, ১৮৯, ২-৪

তাহার পর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেমন করিয়া হয় তাহা বলিয়া ভৃগু বলিলেন, "যে নিত্য সর্বভক্ষরতি যে অশুচি সর্বকর্মকর যে ত্যক্তবেদ আচারহীন সেই তো শূদ্র।

সর্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্বকর্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ —ঐ, ৭

তাহার পর মহর্ষি বলিতেছেন এই তো গেল ভিন্ন ভিন্ন জাতির লক্ষণের কথা। তার পর শূদ্রেও যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখা যায় তবে তাহাকে আর শূদ্র বলা চলে না। ব্রাহ্মণেও যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না থাকে তবে তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

শূদ্রে চৈতদ্‌ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥ —ঐ, ৮

এই শ্লোকটি বনপর্বেও আছে (১৮০ অধ্যায়, ২৫)।

সেইখানে সর্পরূপী নহুষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিতেছেন, "হে রাজন্‌ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়?"

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্‌ রাজন্‌ ॥ —বনপর্ব, ১৮০, ২০

যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "হে নাগেন্দ্র, যে মানুষে সত্য দান ক্ষমা শীল আনৃশংস্য তপস্যা কৃপা দেখা যায় সে-ই তো ব্রাহ্মণ।"

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ —ঐ, ২১

"সর্বদা শুচিতা সদাচার ও সর্বভূতে মৈত্রী ইহাই হইল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।"

১ যিনি সকলকে খাওয়াইয়া পরে যাহা থাকে তাহাই খান, তিনি বিঘসাশী।

২ "ঘৃণা" পাঠও আছে।

শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচারসমন্বিতঃ।

সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্ দ্বিজাতিষু লক্ষণম্॥ —শান্তি, ১৮৯, ১৮

যিনি ক্রোধমোহত্যাগী তাঁহাকে দেবতারাও ব্রাহ্মণ বলেন।

যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —বনপর্ব, ২০৫, ৩৩

যিনি সত্যবাদী, গুরুর সন্তোষকারী, হিংসিত হইয়াও যিনি হিংসাহীন তাঁহাকে দেবতারাও ব্রাহ্মণ বলেন।

যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সংতোষয়েত চ।

হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ, ৩৩-৩৪

যিনি জিতেন্দ্রিয় ধর্মপর স্বাধ্যায়নিরত শুচি, কামক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহাকে দেবতারাও ব্রাহ্মণ বলেন।

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।

কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ, ৩৪-৩৫

যেই ধর্মজ্ঞ মনস্বীর পক্ষে সকল লোকই আত্মসম, যিনি সর্বধর্মে রত তাঁহাকে দেবতারাও ব্রাহ্মণ বলেন।

যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।

সর্বধর্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ, ৩৫, ৩৬

ইহার পরে ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ উদার মতের কথাই যুধিষ্ঠির বলিতেছেন।

উদ্যোগপর্বে সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন "হে ক্ষত্রিয়, কেহ কেবল বেদ-শাস্ত্রাদি উচ্চারণের দ্বারাই দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারে ইহা মনে করিও না, যিনি সত্য হইতে প্রচ্যুত না হন তাঁহাকেই জানিবে ব্রাহ্মণ বলিয়া।"

তস্মাৎ ক্ষত্রিয় মামংস্থা জল্পিতেনৈব বৈ দ্বিজম্।

য এব সত্যান্ নাপৈতি স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণস্ত্বয়া॥ —উদ্যোগ, ৪৩, ৪৯

বসিষ্ঠও বলিয়াছেন, "ক্ষমাই ব্রাহ্মণের শক্তি।"

ব্রাহ্মণানাং বলং ক্ষমা। —আদিপর্ব, ১৭৫, ২৯

আদিপর্বে আছে, "সর্বভূতে মৈত্রীই হইল ব্রাহ্মণের ধর্ম।"

সর্বভূতেষু ধর্মজ্ঞ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ —২১৭, ৫

এই কথাই আরও বহু স্থানে দেখা যায়।

মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। —শান্তি, ৬০, ১২; ২৩৭, ১৩; অনুশাসন, ২৭, ১২

শান্তিপর্বে (৬০, ৯) দেখা যায় ইন্দ্রিয়দমনই হইল ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম।

"অহিংসা সত্যবচন ক্ষমা বেদধারণা এই সকলই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম।"

অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিশ্চিতম্।

ব্রাহ্মণস্য পরো ধর্মো বেদানাং ধারণাপি চ॥ —আদিপর্ব, ১১, ১৫-১৬

"যিনি একাকী থাকিলে শূন্যস্থানও জনাকীর্ণ বোধ হয় যাঁহার অভাবে জনপূর্ণ প্রদেশও মনে হইয়া থাকে শূন্য, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।"

যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্বদা।

শূন্যং যেন জনাকীর্ণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —শান্তিপর্ব, ২৪৪, ১১

"সম্মানিত হইলেও যিনি হৃষ্ট হন না অপমানিত হইলেও ক্রোধ করেন না, যিনি সর্বভূতে অভয় দান করেন, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন।"

ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।

সর্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ, ১৪

ব্রাহ্মণের বহু লক্ষণ ও ধর্ম এখানে বর্ণিত। তাহার মধ্যে দুই-একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে। "যাঁহার জীবন ধর্মের জন্য, ধর্ম হরির জন্য, দিন এবং রাত্রি পুণ্যকর্মের জন্য তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন।"

জীবিতং যস্য ধর্মার্থং ধর্মো হর্য্যর্থমেব চ।

অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ ২৩

"যিনি নিরামিষ অনারম্ভ যিনি স্তুতি ও নমস্কারহীন যিনি সর্ববন্ধন বিমুক্ত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন।"

নিরামিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।

নির্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্বৈস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ —ঐ, ২৪

মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "চরিত্রই যে ব্রাহ্মণত্বের কারণ ইহাতে আর সংশয় নাই।"

কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ। —বনপর্ব, ৩১২, ১০৮

মহাভারতেই দেখা যায় উমাকে মহেশ্বর বলিতেছেন "বৃত্তই দ্বিজত্বের কারণ, উৎপত্তি সংস্কার বিদ্যা বা বংশ কারণ নহে।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।

কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব হি কারণম্॥ —অনুশাসনপর্ব, ১৪৩, ৫০

"বৃত্তের দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারে। শূদ্রও বৃত্তস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।"

সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।

বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥ —ঐ, ৫১

"সরল ও সাধুতাসম্পন্ন হইলে লোকের ব্রাহ্মণত্ব জন্মে।"

আর্জবে বর্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে॥ —বনপর্ব, ২১১, ১২

"সদাচার ও কর্মের দ্বারাই শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হয়।"

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
—অনুশাসন পর্ব, উমা-মহেশ্বর সংবাদ, ১৪৪, ২৬

"সৎকর্মফলে আগমসম্পন্ন শূদ্রও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করে।"

এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥ —ঐ, ৪৬

"ব্রাহ্মণও অসদ্‌বৃত্ত ও সর্বসঙ্করভোজনবশত জাতি হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্র হইয়া যায়।"

ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্বসঙ্করভোজনঃ!
ব্রাহ্মণ্যং স সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥ —ঐ, ৪৭

"পবিত্র কর্মের দ্বারা শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎ সেব্য, এই কথা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন।"

কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্‌॥ —ঐ, ৪৮

"ধর্মের সহায়তায় শূদ্রও দ্বিজ হয়, ধর্ম হইতে বিযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণও যে শূদ্র হইয়া যায় সেই গুহ্য কথাই উমাকে মহেশ্বর বলিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্মাদ্‌ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥ —ঐ, ৫৯

শান্তিপর্বে ৭৬তম অধ্যায়ে ৪-৮ শ্লোকে যে যে কারণে ব্রাহ্মণ পতিত হন তাহাও বলা হইয়াছে। অনুশাসন পর্বে ১৩৫ তম অধ্যায়ে ৬-২০ শ্লোকেও সেই কথাই অন্য ভাবে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির অনেকটাই আপস্তম্ব সংহিতাতে নবম অধ্যায়ে দেখা যায়। তাহাতে দেখা যায় শূদ্রের চাকরী করিলে ব্রাহ্মণ হয় কুকুরের মত হীন। কুকুরের মত মাটিতে তাহাকে অন্ন দিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্য সদাকালং শূদ্রপ্রেষণকারিণঃ।
ভূমাবন্নং প্রদাতব্যং যথা হি শ্বা তথৈব সঃ॥ —৯, ৩৫

বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলেন চারি বর্ণ ই স্বধর্ম পালনের দ্বারা বিপ্রতা প্রাপ্ত হইতে পারে (উত্তর খণ্ড, ১, ১৪)। তাহার পরে বলেন স্বধর্মপালনে শূদ্র বৈশ্যত্ব, বৈশ্য ক্ষত্রত্ব ও ক্ষত্রিয় বিপ্রত্ব লাভ করে (ঐ, ১৫-১৬)।

শাস্ত্রমতে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ চাকুরিয়া যবনসেবী কুশীদজীবী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শূদ্রেরও অধম। অথচ আজিকার দিনে সনাতন ধর্মের প্রচারে অগ্রগণ্য অনেকের মনে এই

কথা প্রবেশ করে নাই। এই সব শাস্ত্রবাক্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে অনেকের ধর্মাভিমান হয়তো একটু শান্ত ও সংযত হইত।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্মবিভাগ অনুসারে যে বর্ণভেদের কথা বলিয়াছেন (৪, ১৩) তাহা যদি ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে জাতিভেদের দ্বারা ভারতের উপকারই হইত। তাহা হইলে সমাজে একটা নড়াচড়া ও প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইত। এইরূপ সচলতার কথা মনুও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন স্থল-বিশেষে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে (মনু, ১০, ৬৫)। কিন্তু এই সব বড় কথা ও উদার বিধি এই দেশে ক্রমে অচল হইয়া আসিল। সংস্কৃত পুরাণ-নাটকাদিতে চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ ও উচ্চবৃত্তি শূদ্রের অভাব নাই। চরিত্রে ও কর্মে অনেক স্থলে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু গুণকর্মবিভাগ অনুসারে জাতির ব্যবস্থা না থাকাতে সবারই নৈতিক আদর্শ ক্রমে হীন হইতে লাগিল। যে যেখানে জন্মিল সেখানেই তাহার চিরন্তন স্থিতি, ইহার অপেক্ষা তামসিকতা আর কি হইতে পারে?

৪

পূর্বমীমাংসায় জাতি

প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল গোদাবরী নদীর তীরে ধর্মপুরী নামক স্থানে রামানুজচার্য নামে একজন নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত তন্ত্ররহস্য নামে গ্রন্থের তিনখানি পুঁথি মহীশূর গবর্ণমেণ্ট গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়। শামশাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শামশাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে বৈদিক জ্ঞানের একটি ধারা উপনিষদাদি-উক্ত উত্তরমীমাংসার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া, অন্য ধারা পূর্বমীমাংসা-উক্ত কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া। এই পূর্বমীমাংসার আদিগুরু হইলেন জৈমিনি। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের যুগে এই পূর্বমীমাংসা মতের আবার দুইটি ধারা দেখা যায়। ভট্ট কুমারিলের অনুবর্তীরা অতিশয় রক্ষণশীল আর প্রভাকর বা গুরুর অনুবর্তিগণ উদারমতের। কুমারিল বলেন, গো-অশ্ব-অজ প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণ জন্মতই একটি স্বতন্ত্র জাতীয় জীব। প্রভাকর বলেন, ব্রাহ্মণ সেইরূপভাবে ভিন্নজাতীয় নহে, তাহার কর্ম ও ব্যবসা ভেদে সে ভিন্ন শ্রেণী।[১] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দেখা যায় তপস্যা, জ্ঞান এবং জন্ম ইহাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। তপস্যা ও জ্ঞান না থাকিলে সে কেবল জাতি-ব্রাহ্মণ। পতঞ্জলি আরও বলেন, সন্দেহ থাকিলেও ব্রাহ্মণ যে একটি স্বতন্ত্র জাতি তাহা বুঝা যায় প্রত্যক্ষ ইহা দেখিয়া যে সে গৌরবর্ণ, শুচি-আচার, পিঙ্গলচক্ষু ও কপিল কেশ।

সন্দেহাৎ তাবদ্ গৌরং শুচ্যাচারং পিঙ্গলং কপিলকেশং দৃষ্ট্বাধাবস্যতি ব্রাহ্মণোঽয়মিতি।

—মহাভাষ্য, ২, ২, ৬

কৃষ্ণকায়, মাষরাশির মত বর্ণযুক্ত, আপণে আসীন লোককে দেখিলেই বুঝা যায় যে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহে।

ন হ্যয়ং কালং মাষরাশিবর্ণম্ আপণে আসীনম্ দৃষ্ট্বা অধ্যবস্যতি ব্রাহ্মণোঽয়মিতি—ঐ

ইহাতে বুঝা যায় মহাভাষ্যের সময়েও ভারতের ব্রাহ্মণেরা য়ুরোপীয়দের মত দৈহিক লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন।[২]

পরে কুমারিলের সময়ে অর্থাৎ নবম শতাব্দীতে বর্ণাদির দ্বারা ব্রাহ্মণকে আর চেনা যাইত না। কাজেই অব্রাহ্মণও আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া দিতে

১ তন্ত্ররহস্য, Gaekwad's Oriental Series, no. XXIV, Intro. p. 3

২ তন্ত্ররহস্য ভূমিকা, পৃ. ৩

পারিতেন। কুমারিল বলেন জন্মত যিনি ব্রাহ্মণ নহেন এমন ব্রাহ্মণব্রুবও যদি ব্রাহ্মণোচিত শুদ্ধাচার পুরুষানুক্রমে পালন করিয়া যান তবে গৌতম এবং আপস্তম্ব-মতে পঞ্চম বা সপ্তম পুরুষে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইবেন।[১]

অর্থাৎ গৌতম বলেন, বর্ণবিশুদ্ধি না থাকিলেও শুদ্ধবর্ণের সংস্রবে সপ্তম পুরুষে শুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব হয়। অন্য অনেক আচার্য বলেন পঞ্চমপুরুষেই তাহা হয়।

আপস্তম্বেও আমরা এইরূপ মতই পাই।[২]

বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমেন—গৌতমধর্মসূত্র, ৪, ২২

পঞ্চমেনাচার্যাঃ—ঐ, ৪, ২৩

রক্ষণশীল কুমারিল ভট্ট বলেন সুনীতি ও সদাচার হইল বেদসম্মত আচার। যুক্তিবাদী প্রভাকর বলেন[৩] তাহাই সদাচার ও সুনীতি যাহা শ্রেষ্ঠ সামাজিকদের সম্মত।

জাতি বিষয়েই প্রভাকর বলেন, "ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি নহে" কারণ গো-অশ্ব-অজাদির মত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ লক্ষণ নাই।

অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণত্বক্ষত্রিয়ত্বাদিকমপি ন নির্বহতি —তন্ত্ররহস্য, প্রমেয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ২২

কুমারিলের সব গ্রন্থই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। প্রভাকরের উদার মতের গ্রন্থগুলি রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তেমন যত্ন করিয়া রক্ষাও করেন নাই আর প্রভাকর-রচিত মীমাংসাসূত্রের গুরু বৃহতী ও লঘু বৃহতী ছাপা হয় নাই। প্রভাকরের দুইখানি টীকা করিয়াছিলেন ভট্টনাথ। তন্ত্ররহস্য প্রভাকর মতের গ্রন্থ। ইহাতে প্রভাকর-মতের অনেক পূর্বাচার্যদের নাম পাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রকরণপঞ্চিকাকার শৈলিকনাথ একজন।[৪] শৈলিকনাথ ছিলেন গৌড়দেশীয়।[৫] শৈলিকনাথের মতামত অন্যদের অপেক্ষা যে উদার ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

১ তন্ত্ররহস্য ভূমিকা, পৃ. ৬-৭

২ ঐ, পৃ. ৭

৩ ঐ, পৃ. ৩

৪ ঐ, পৃ. ৫

৫ গোপীনাথ কবিরাজ, কুসুমাঞ্জলিবোধিনী ভূমিকা, পৃ. vii—viii

৫

জাতি অসংখ্য

জাতি বলিতে শাস্ত্রানুসারে বুঝায় চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। মুখে আমরা এখনও বলি বটে "চাতুর্বর্ণ্য" কিন্তু জাতির যে আর অন্তই নাই। ভারতের সেন্সাস দেখিয়া জানা গিয়াছে যে এদেশে তিন হাজারেরও অধিক জাতি আছে। ইহার উপরে উপবিভাগগুলি ধরিলে তো অবস্থা দাঁড়ায় আরও সাংঘাতিক। এক ব্রাহ্মণেরই গৌণ ভাগগুলি ছাড়াই মুখ্যভাগই আট শতের বেশি। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম চলে না।[১]

ব্লুমফিল্ড বলেন ব্রাহ্মণদের মধ্যেই দুই হাজার ভাগ আছে।[২] এক সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ৪৬৯ শাখা, ক্ষত্রিয়দের ৫৯০ শাখা, বৈশ্যশূদ্রাদির শাখা ছয় শতেরও অধিক।[৩] ভারতের সকল প্রদেশে এই একই দশা। গুজরাটে দেখিয়াছি এক-এক গ্রামে মাত্র দশ বারো ঘর লইয়া এক-একটি ব্রাহ্মণসমাজ। সুরত জেলায় মোতা গ্রামে মোতালা ব্রাহ্মণেরা এইরূপ একটি শ্রেণী, এমন আরও বহু শ্রেণী আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একমাত্র সুরত শহরে বণিকদের মধ্যে ৬৫ ভাগ ছিল।[৪]

মনু লিখিলেন বটে বর্ণ মাত্র চারিটি, পঞ্চম বর্ণ নাই (১০, ৪) কিন্তু তাঁহার সময়েই দেখা যায় বহু বর্ণ। তাহাদের কথা না বলিয়াও মনু পারেন নাই। বর্ণ তো চারিটি অথচ এতগুলি জাতি, এই সমস্যার সমাধান কি করিয়া হয়? তাই চারি বর্ণের অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা তিনি জাতিবাহুল্যের কারণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়ের অষ্টম হইতে ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে মনু ৫০টি জাতির নাম করিয়া তাহার পর ৪০ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলিলেন ইহা ছাড়া আরও বহু জাতি আছে। এই রকমে ৪৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত গিয়া আমরা মনুর মধ্যেই ৬২টি জাতির নাম

১ Ketkar, *History of Caste*, p. 5

২ *Religion of the Vedas*, p. 6

৩ Lala Baijnath, *Hinduism Ancient and Modern*, Meerut, 1869, p. 9

৪ Captain Hamilton, *A New Account of the East Indies*, Vol I, 1740, p. 151

পাই, ইহা ছাড়া আবার "ইত্যাদি" আছে। ইহার মধ্যে বহু জাতিই তখনকার দিনে নানা মানবশ্রেণী বা ethnic group অর্থাৎ race বা tribe, যথা মগধ বৈদেহ আভীর আবন্তা ঝল্ল মল্ল লিচ্ছবি খস দ্রবিড় অন্ধ্র প্রভৃতি শ্রেণী। তাহা ছাড়া নাকি ক্রিয়ালোপ অর্থাৎ ব্রাত্যত্ববশত পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পহ্লব চীন কিরাত দরদ খস প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি। ইহার মধ্যে অনেক জাতিই যে আর্যদের সংস্পর্শে আগত নানাশ্রেণীর মানবমণ্ডলী তাহা সহজেই বুঝা যায়।

তখনকার অনেক মানবশ্রেণী বা ethnic group নানা নামে ক্রমে ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নামগুলির মধ্যে এখনও তাহাদের প্রাচীনতর পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। এমন কি মনে হয় আর্যধর্মাশ্রিত সকল আর্যেতর বর্ণকে যে শূদ্র বলা হয়, শূদ্রও প্রথমে ভারতের একটি বিশেষ ethnic group ছিল। কলিকাতার বঙ্গবাসী-সংস্করণের মহাভারতের ভীষ্মপর্বে নবম অধ্যায়ে বহু নদী ও জনপদের নাম আছে। তাহাতে সেই সব জনপদ tribes ও racesএর নাম পাই। তাহাতে দেখা যায় আভীরাদির পর দরদ-কাশ্মীরাদির উল্লেখের পরে "শূদ্র"দেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

শূদ্রাভীরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ॥ —ভীষ্মপর্ব, ৯, ৬৭

দ্রোণপর্বে শিবি শূরসেনদের সঙ্গে "শূদ্র"দের উল্লেখ দেখা যায়।

শিবয়ঃ শূরসেনাশ্চ শূদ্রাশ্চ মলয়ৈঃ সহ। —দ্রোণপর্ব, ৬, ৬

পুরাণেরও অনেক স্থলে এইভাবে বাহ্লীক আভীর প্রভৃতির সঙ্গে শূদ্রদেরও উল্লেখ মেলে। গ্রীকদের বর্ণিত Oxydrace বোধ হয় এই দল হইতে পারে, পরে এইনামেই সমধর্মতাবশত আর্যদের বশতাপন্ন সকল অনার্যেরই নামকরণ হইয়াছে "শূদ্র"। ক্ষত্রিয় জাতিরও এইরূপ উল্লেখ মেলে গ্রীকদের বর্ণিত Xathroiদের কথায়।[১]

যুগে যুগে দেখা যায় অনেক পুরাতন জাতি লুপ্ত ও নূতন জাতি উদ্ভূত। তাই বোধ হয় বেদে-উল্লিখিত বহু জাতি স্মৃতিতে নাই, স্মৃতিতে উল্লিখিত বহু জাতির কোনো সংবাদ বেদে মেলে না। বেদের অনেক জাতি পরে কি হইয়া গেল বলা কঠিন। যুগে যুগে নামেরও পরিবর্তন হইতে পারে। তবেই চাতুর্বর্ণ্যের বাঁধা নাম দিয়া সব যুগের একই জাতিকে সব সময় বুঝানো যায় না। এমন অনেক জাতি আছে

১ McCrindle, *Ancient India*: Its invasion by Alexander the Great, p. 156

যাহাদের নাম স্মৃতিতে দেখি কিন্তু বেদের মধ্যে কোথাও তাহাদের কোনো পরিচয় মেলে না।

মাগধ, বৈদেহ প্রভৃতিরা তত্তদ্দেশীয় মানুষ। চণ্ডালও ঠিক জাতি নহে। আবৃত, আভীর, ধিগ্‌বন, পুক্কস, কুক্কুটক, শ্বপাক, বেণ, ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ, ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়, সুধন্বাচার্য, কারুষ, বিজন্ম, মৈত্র, সাত্বত, সৈরিন্ধ্র, মার্গব, কারাবর, মেদ, পাণ্ডু-সোপাক, আহিণ্ডিক, সোপাক, অন্ত্যাবসায়ী, ঔড্র, যবন, শক, পহ্লব, চীন, দরদ, চুঞ্চু, মদ্‌গু, বন্দি প্রভৃতি জাতির নাম বেদে নাই। কম্বোজ নামে একজন জ্ঞানীর কথা বেদে (যাস্ক, ২, ২) পাই, কিন্তু জাতি নহে। "সূত" বেদে একটা জাতি নহে তাঁহারা রাজাদের নানাভাবে সহায়তা করিতেন মাত্র। বৃহদারণ্যকের "উগ্র" কোনো বিশেষ জাতির নাম নহে।

বেদে ও স্মৃতিতে যদিও বহুসংখ্যক ভারতীয় জাতির নাম আছে বটে কিন্তু তাহাও আমাদের বর্তমান কালের জাতির সংখ্যার তুলনায় কিছুই নয়। সাড়ে তিন হাজারের পাশে শতখানেক নাম হইলেই বা আর কি হইল? বেদে স্মৃতিতে এত যে জাতির নাম পাইলাম তাহাদের অনেকেরই এখন কোনো খোঁজ মেলে না। অথচ এখনকার দিনের অনেক প্রসিদ্ধ জাতির নামও স্মৃতিতে বেদে দেখা যায় না।

বাংলা দেশের হাড়ী ডোম বাগদি বাউরী কাওরা প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত জাতির নাম বেদে-স্মৃতিতে নাই। উড়িষ্যার পাণ কণ্ড্রা প্রভৃতির নামও দেখা যায় না। বিহার ও উত্তর-পশ্চিমের পাসী, দোসাদ, মুসহর, কাহার, কূর্মি, খটিক, তুরহা প্রভৃতি জাতির নামও নাই। দক্ষিণ-ভারতের থিয়া চেরুমা পারিয়া প্রভৃতি অনেক সংখ্যাবহুল শ্রেণীরও উল্লেখ নাই। Thirston সাহেব লিখিত *Castes and Tribes of Southern India* সাত খণ্ড গ্রন্থে ও নানা প্রদেশের আদমসুমারির রিপোর্টগুলি দেখিলে দেখা যায় হাজার হাজার যে-সব জাতি আজ রহিয়াছে তাহাদের কোনো পরিচয়ই বেদে-স্মৃতিতে মেলে না।

এখনকার দিনে অনেক সময় খোঁজ করিলে দেখা যায় একই জাতির মধ্যেও বহু জাতি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে—ধরা যাউক বাংলার তাঁতিদের কথা। বাংলাতে কার্পাস ও বয়ন বহুদিনের ব্যবসা, তাই বহু তাঁতি। তাহাদের মধ্যে ধোবা, সকলী, সরাক প্রভৃতি শাখা আছে[১]। হয়তো কোনো কালে এইসব শ্রেণী বয়নকর্মকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করাতে তাঁতিদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

১ *E. R. E.* III, ২২৩

পুরাণকাররা এই কথা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই দেখি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণও এমন দুই-একটি জাতির পরিচয় দিয়ে গিয়াছেন যাহাদের কথা বেদ স্মৃতি কিছুই বলে নাই। হাড়ী ডোমের (হড্ডীডমৌ) কথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায় ১০৫ শ্লোকে আছে। বাগদীর কথাও আছে (১১৮ শ্লোক)। জোলা শরাকের নামও আছে। সেখানেও জাতির উৎপত্তির সম্বন্ধে পুরাণকার মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদিগেরই মত অনুসরণ করিতে গিয়াছেন কিন্তু তাহাতে ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা এই,

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলা জাতির্বভূব হ। —১২১ শ্লোক

আবার—

জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ —ঐ

কুবিন্দ অর্থ তাঁতি। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা মুসলমান হইল তাহাদের নাম "জোলা"! সরাক, বৈরাগী, যুগী, গোঁসাই প্রভৃতি জাতি প্রাচীন সাধকসম্প্রদায়গুলির অবশেষ। পরে এই সব সম্প্রদায় এক-একটি জাতি হইয়া কোনোপ্রকারে বর্ণাশ্রমের জগতে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। বাংলায় নাথ ও যুগীরা পূর্বে বেদবিরুদ্ধ একটি সাধকসম্প্রদায়ী ছিলেন পরে তাঁহারা গৃহস্থ হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের আচারনিষ্ঠা অন্যদের অপেক্ষা বেশি বই কম নহে। বাংলায় যুগীরা অনেকে এখন নিজেদের "গৃহস্থ যোগী" বলেন। নাথ যুগীরাই মুসলমান হইলে হইতেন জোলা। কাশীর রায়সাহেব কৃষ্ণদাস বলেন কাশী-আলাইপুরার জোলারা নিজেদের পরিচয় দেন "গৃহস্থ" বলিয়া। জোলারা যে পূর্বে সাধকসম্প্রদায়ী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় গোস্বামী তুলসীদাসের বাণীতে,

ধূত কহৌ অবধূত কহৌ রজপূত কহৌ জোলহা কহৌ কৌউ ॥[১]

তখন অবধূতদের মত জোলা এবং রাউতও (রাজপুত) সাধকসম্প্রদায় ছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে শরাক হইল প্রাচীন শ্রাবকদের অবশেষ। কাজেই এইরূপ উৎপত্তি দিবার মূল্য কি তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই অধ্যায়ে কোচ, যুগী, রাজবংশী, কাপালী, মালাকার, কর্মকার, শাঁখারী, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার, পটুয়া, রাজমিস্ত্রী, তেলি, লেট, মাল্ল, মল্ল, ভড়, কোল, কলন্দর, শুঁড়ি, আগুরি, গণক, অগ্রদানী, বেদে, বৈদ্য, সূত, ভাট প্রভৃতি অনেকের উৎপত্তি দেখা যায়। যদিও সেই উৎপত্তি এখনকার দিনে লোকে মানিতে চাহিবে না।

১ রামনরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিত-মানসের ভূমিকা, পৃ. ২১

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ১০৩ অধ্যায়ে গঙ্গাপুত্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়,

লেটাৎ তীবরকন্যায়াং গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্তিতঃ। —১১৭ শ্লোক

তীবর হইল অন্ত্যজ ব্যাধজাতিবিশেষ। লেট হইল তীবরের বর্ণসঙ্কর সন্তান। এই লেট-তীবরে গঙ্গাপুত্রের জন্ম। অথচ কাশীতে গঙ্গাপুত্রেরা ভারতের সকল বর্ণের তীর্থগুরু। গঙ্গাপুত্রদের সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণদের কিন্তু সামাজিক ব্যবহার নাই, গয়ালী বা গয়ার তীর্থগুরুদের সঙ্গেও নাই। সেন্সাস রিপোর্টে আছে গয়ালীরাও অন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃত নহেন। এই সব কথা অন্যত্র দেখান গিয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে ধীবর জাতির এ একটি শ্রেণীও গঙ্গাপুত্র নামে পরিচিত।

দেখা যাইতেছে এই সব অনেক জাতি নানা সময়ে আগত সব মানবমণ্ডলী (ethnic group)। ভারতে যুগে যুগে কত যে জাতি (ethnic group) আসিয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব জাতিকে হারাইয়া সরাইয়া নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই হিসাবে নানা জাতির স্তরের উপর নদীর পলিভূমির (delta) মত ভারতের মানবসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয়দের মত ইহারা একে অন্যকে উচ্ছেদ করে নাই। আপন আপন ধর্ম কর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া চিরদিন সকলেই পাশাপাশি বাস করিয়াছে। ইহাতে ভারতে ধর্ম ও মতের বহু বৈচিত্র্য হইয়াছে বহু জাতির ও সমস্যারও উদ্ভব ঘটিয়াছে।

৬

সেকালের জাতি

[১]

প্রাচীনকালে যখন জাতিভেদ প্রবর্তিত হইল তখনও উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে দোষ হইত না, ইহাকেই বলে অনুলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ অবশ্য নিন্দনীয় ছিল। নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে বলে প্রতিলোম। তাহাতে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই মনোবৃত্তি অল্প-বিস্তর প্রায় সব দেশেই আছে। মোট কথা জাতিভেদপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সর্ববিধ কড়াকড়ি আরম্ভ হয় নাই, সেগুলি ক্রমে ক্রমে পরে আমদানী হইয়াছে।

দেখা যায় তখনকার দিনে বংশশুদ্ধি না থাকিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে বাধা হইত না। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১৪, ১, ১৭) বলেন দীর্ঘতমা ঋষির মাতার নাম উশিজ। বৃহদ্দেবতার মতে উশিজ ছিলেন শূদ্রা দাসী। সেখানে দেখা যায় উশিজ ছিলেন কক্ষীবান প্রভৃতি ঋষির মাতা। দীর্ঘতমাই উশিজের গর্ভে এই সব ঋষির জন্মদান করেন (৪, ২৪-২৫)। কণ্ববংশীয় বৎসকেও দাসীপুত্র বলা হইয়াছে (১৪, ৬, ৬)। অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা মহর্ষি বৎস আপন ব্রাহ্মণত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইলূষ ছিলেন একজন অনার্য দাসী। তাঁহার পুত্র ঐলূষ কবষ সরস্বতী নদীতীরে সোমযাগে দীক্ষিত হন। অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই কিতব অব্রাহ্মণ দাসীপুত্র কিরূপে আমাদের মধ্যে সোমযাগে দীক্ষিত হইল?" এই বলিয়া তাঁহারা ঐলূষ কবষকে সরস্বতী নদী হইতে দূরে জলহীন দেশে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি সেখানে "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু" মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সরস্বতীকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। তখন ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া ঐলূষ কবষকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।[১] দাসীপুত্র আচার্য ঐলূষ কবষ তখন ঋষির পূজ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

জবালার পুত্র সত্যকামের কথা সকলেই জানেন। সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুর কাছে যাইবেন। মাতা জবালাকে সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমার

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ৮ম অধ্যায়

কি গোত্র ?” মাতা বলিলেন, “কেমন করিয়া জানিব বাছা তোমার কি গোত্র ? যৌবনে বহুচারিণী হইয়া পরিচারিণী আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, তাই আমি জানি না তোমার কি গোত্র।”

বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি ॥ —ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪, ৪, ২

“আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, তাই জবালাপুত্র সত্যকাম বলিয়াই তুমি আত্মপরিচয় দিও।”

জবালাতু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ॥ —ঐ, ৪, ৪, ২

সত্যকাম তখন হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়া বলিলেন, “হে ভগবন্, আপনার কাছে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিতে চাই, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি” (ঐ ৪, ৪, ৩)।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সৌম্য তোমার গোত্র কি ?” সত্যকাম বলিলেন, “আমার গোত্রের পরিচয় তো আমি জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন ‘যৌবনে পরিচারিণী আমি বহুচারিণী হইয়া তোমাকে পাইয়াছি তাই আমি জানি না তোমার গোত্র কি, জবালা আমার নাম সত্যকাম তোমার নাম’; তাই, হে ভগবন্, জবালা-পুত্র সত্যকাম এইটুকুই আমার পরিচয়” (ঐ ৪, ৪, ৪)।

তখন ঋষি গৌতম তাঁহাকে বলিলেন, “এমন সত্য কথা যথার্থ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে খুলিয়া বলিতে পারে ? অতএব হে সৌম্য তুমি সমিধ্ লইয়া আইস, আমি তোমাকে উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।”

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সৌম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি ॥ —ঐ, ৪, ৪, ৫

উপনিষদে আগাগোড়াই একটি উদার সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাই। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের বড় বড় সব উপদেষ্টা ক্ষত্রিয়। রাজা অজাতশত্রু জনক অশ্বপতি-কৈকেয় প্রবাহণ-জৈবলি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বড় বড় ব্রহ্মবিৎ মহাজ্ঞানী। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ যাইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২, ১, ১) আছে গর্গবংশীয় বালাকি বাগ্মী এবং অহংকারী ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন, “তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিব।” পরে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম বুঝিলেন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদেও (৪, ১) আখ্যানটি আছে।

প্রাচীনকালে ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জন শার্করাক্ষ্য, বুডিল আশ্বতরাশ্বি এই পাঁচজন মহাশালাপতি মহাশ্রোত্রিয় আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ উদ্দালক-আরুণির কাছে গেলেন। উদ্দালক বলিলেন, রাজা অশ্বপতি কৈকেয়ের কাছে যাওয়াই ভালো। সকলে রাজার কাছে গিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেন (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৫, ১১) ।

রাজর্ষি জনক ছিলেন বিদেহপতি। তিনি এত বড় ব্রহ্মবিৎ ছিলেন যে ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার কাছে মাথা নত করিতেন। তাঁহার একটি বহুদক্ষিণ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩, ১, ১) আছে। তাঁহার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের সমাগম-কথা আছে ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১, ১ ; ২, ১ ইত্যাদি)। বুডিল আশ্বতরাশ্বিকে জনকের উপদেশের বর্ণনা আছে ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে (৫, ১৪, ৮) ।

ব্রহ্মবিদ্ রাজা প্রবাহণ-জৈবলির সঙ্গে আরুণেয় শ্বেতকেতুর সমাগমের কথা দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬, ২, ১)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১, ৮, ১)শিলক-শালাবত্য, চৈকিতায়ন-দাল্‌ভ্যের সঙ্গে প্রবাহণ-জৈবলির ব্রহ্মবিষয়ে তত্ত্বকথার বিবরণ পাওয়া যায় ।

[২]

ক্ষত্রিয়রা যে তখনকার দিনে শুধু ব্রহ্মবাদী হইতেন তাহাই নহে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-পরিচালনের যোগ্যতা এবং অধিকারও তাঁহাদের ছিল। তাই বৈদিক যুগে দেখা যায় রাজারা নিজেরাই যজ্ঞাদি সমাধা করিতেন। দেশে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি, রাজা শান্তনু বৃষ্টিলাভের জন্য যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞের পুরোহিত হইলেন রাজা ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি (ঋগ্বেদ, ১০, ৯৮)। বৃহদ্দেবতা বলেন শান্তনু ও দেবাপি দুই ভাই।

আর্ষ্টিষেণস্তু দেবাপিঃ কৌরব্যশ্চৈব শান্তনুঃ।
ভ্রাতরৌ কুরুষু ত্বেতৌ রাজপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ৭, ১১৫

নিরুক্তেও এই কথাই জানা যায়। ২, ১০

আবার ভৃগুবংশীয়গণ রথ নির্মাণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। "ভৃগবো ন রথম্" (ঋগ্বেদ, ১০, ৩৯,১৪)। ঋগ্বেদেই দেখি ঋষি আঙ্গিরস বলিতেছেন, "আমি স্তব রচনা করি, আমার পিতা ভিষক্, আমার মাতা শিলার দ্বারা শস্যচূর্ণকারিণী।"

কারুরহং ততো ভিষগ্ উপলপ্রক্ষিণী ননা। —ঋগ্বেদ, ৯, ১১২, ৩

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪, ১, ১০) দেখা যায় শ্যাপর্ণ শায়কায়ন ছিলেন একজন বিখ্যাত পুরোহিত। যজুর্বেদিরচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত। সেই শ্যাপর্ণ শায়কায়ন বলিতেছেন, তাঁহার সন্তানেরা গুণানুসারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য যে কোনো জাতি হইয়া যাইতে পারেন।

কাঠক সংহিতায় (১৯, ১০ ; ২৭, ৪) এবং শতপথব্রাহ্মণে (১২, ৮, ৩, ১৯) যে ব্রহ্মপুরোহিত দেখা যায়, অনেকে মনে করেন যে হয়ত ব্রাহ্মণ ছাড়াও পুরোহিত যে হইত এই কথাই তাহাতে সূচিত হয়[১]।

পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার অনুক্রমণিকায় (পৃ. ৯০) লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণ ঋষিই অনেক, কিন্তু রাজন্য ঋষিও ছিল। সায়নাচার্য ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে ঋজ্রস্ব, সহদেব, অম্বরীষ, ভয়মান, সুরাধস্ প্রভৃতিকে রাজর্ষি বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, পৃথিবৈন্য, কক্ষীবান্ প্রভৃতি বহু সংখ্যক রাজর্ষি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বেদসূক্তের রচক বা ঋষি ছিলেন। দুই-এক স্থলে শূদ্র ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ ঐলূষ নামে দশম মণ্ডলে একজন নিষাদ ঋষি আছেন, সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে বৈদিক যুগে আধুনিক জাতিভেদ ছিল না।"

রাজা বিশ্বামিত্র যে স্বীয় তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। ক্ষত্রিয়বল যখন ব্রহ্মবলের নিকট পরাজিত হইল তখন "তিনি ক্ষত্রভাবে নির্বিণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্ ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল।"

> বিশ্বামিত্রো ক্ষত্রভাবান্ নির্বিণ্ণো বাক্যমব্রবীৎ।
> ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্ ॥ —মহাভারত, আদিপর্ব, ১৭৫,৪৫

তাহার পর তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

> ততাপ সর্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥ —ঐ, ৪৮

ক্ষত্রভাব হইতে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

> ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ ॥ —উদ্যোগপর্ব, ১০৬, ১৮

উগ্র তপস্যাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকাম বিশ্বামিত্র দেবতার মত সারা জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

> স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ।
> বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ ॥ —শল্যপর্ব, ৪০, ২৯

১ G. S. Ghurye, *Caste and Race in India* p. 44

তাই ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মবংশের কারক হইলেন।

> ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
> ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥ —শল্যপর্ব, ৪, ৪৮

পরে শল্যপর্বেই দেখা যায় বিশ্বামিত্র মহাদেবকে আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। "ব্রাহ্মণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় আমি মহাদেবকে আরাধনা করি।"

> ব্রাহ্মণোঽহং ভবানীতি ময়া চারাধিতো ভবঃ॥ —শল্যপর্ব, ১৮, ১৬

তাঁহার প্রসাদেই দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

> তৎপ্রসাদাৎ ময়া প্রাপ্তং ব্রহ্মণ্যং দুর্লভং মহৎ॥ —ঐ, ১৮, ১৭

পুরাকালে বহু ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বসিষ্ঠের এইজন্য এত বাদ বিবাদের কথা প্রসিদ্ধ কেন?

ম্যাকডোনাল ও কীথ সাহেব[১] দেখাইয়াছেন বসিষ্ঠ একজন নহেন। বিশ্বামিত্রও একাধিক ছিলেন। বিশ্বামিত্র এক সময়ে সুদাসের পুরোহিত ছিলেন (ঋগ্বেদ ৩, ৩৩, ৫) পরে এই পুরোহিত পদ হইতে অপসারিত হওয়ায় সুদাসের শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিশ্বামিত্র যোগ দেন। বসিষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গেও বিশ্বামিত্রের কলহের আভাষ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (৩, ৫৩, ১৫-১৬; ২১-২৪)। সদ্‌গুরু-শিষ্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় সুদাসের পৌরোহিত্য প্রভৃতি স্বার্থ লইয়াই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রসিদ্ধ কলহের উদ্ভব। এই বিষয়ে *Vedic Index* গ্রন্থে আরও অনেক কথা আছে। যাঁহাদের কৌতূহল হয় তাঁহারা দেখিতে পারেন।

আসলে জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের দাবী যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাইবে বসিষ্ঠও স্বর্গের নর্তকী উর্বসীর সন্তান। মিত্রাবরুণের ঔরসে তাঁর জন্ম।

> উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্
> বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধিজাতঃ॥ —ঋগ্বেদ, ৭, ৩৩, ১১

বসিষ্ঠের জন্মের মধ্যে একটু গোলমাল ছিল বলিয়াই ঋগ্বেদে কোথাও তাঁহাকে উর্বসীর পুত্র কোথাও বা তৃৎসুর বংশ বলিয়া বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে (৭, ৮৩, ৮) ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়াও অনেক স্থলে বসিষ্ঠের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

> ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রোবসিষ্ঠোঽরুন্ধতীপতিঃ॥ —আদি, ১৭৪, ৫

মনুসংহিতায় (১, ৩৫), বায়ুপুরাণে[২] (৯, ৬২-৬৩) এবং মৎস্যপুরাণে ১৭১তম

১ *Vedic Index* Vol. II, 274-277; 310-312

২ বায়ুপুরাণ, Bibliothica Indica সংস্করণ

অধ্যায়ে এই কথা আছে। অগ্নি হইতে তাঁহার জন্মের কথাও পাওয়া যায় (বায়ু, উত্তরভাগ ৪, ৪৬-৪৭)। মৎস্যপুরাণেও এই কথা সমর্থিত। পুরাণকারেরা যে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সংবাদ দিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। শিবপুরাণে ধর্মসংহিতায় ৬০ এবং ৬১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে ব্রহ্ম-পুরাণ চমৎকার আলোকপাত করিয়াছেন। মান্ধাতার বংশে বিদ্যা ও প্রভাবসম্পন্ন ত্রয়্যারুণির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র মহাবল সত্যব্রত (৭ম অধ্যায়, ৯৭)। ত্রয়্যারুণির একটু চরিত্রদোষ ছিল (৭, ৯৮-৯৯)। পিতা তাই তাহাকে পরিত্যাগ করেন (৭, ১০০)। পুত্র বলেন, "যাই কোথায়?" পিতা বলিলেন, "চণ্ডালদের সঙ্গে বাস কর" (৭, ১০১)। ভগবান বসিষ্ঠ ঋষি সব দেখিলেন কিন্তু কোনো বাধা দিলেন না (৭, ১০৩)। ত্রয়্যারুণিও বনবাসব্রত গ্রহণ করিলেন। পরে যখন রাজ্য অরাজক হইল, বসিষ্ঠই রাজ্যরক্ষক হইয়া বসিলেন (৮, ৪)। এই সত্যব্রতই পরে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতমতে (৯, ৭, ২-৫) মান্ধাতার বংশের পুরুকুৎস নাগকন্যা বিবাহ করেন, এবং পুরুকুৎসের বংশেই সত্যব্রতের জন্ম।

[৩]

দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি ও দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল (বায়ু, ৭, ১০৪-১০৫)। বিশ্বামিত্র তখন পরিবার হইতে দূরে গিয়া তপস্যায় রত (৭, ১০৬)। তাঁহার সন্তানেরা দুর্ভিক্ষে মরিবার মত হইলে সত্যব্রতই তাঁহাদিগকে বাঁচাইলেন। ৭, ১০৬-১০৯

বসিষ্ঠের প্রতি সত্যব্রতের বহুকালের ক্রোধ সঞ্চিত ছিল। বসিষ্ঠ তাঁহাকে কখনও সাবধান করেন নাই এবং তাই পিতা তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তখনও বসিষ্ঠ বাধা দেন নাই (৮, ৫-৬)। বরং সত্যব্রত রাজ্য ত্যাগ করিলে বসিষ্ঠই রাজ্যচালনার ভার লইলেন (৮, ৪)। সত্যব্রত এদিকে মৃগয়ার দ্বারা নিজেকে ও বিশ্বামিত্রের পরিবারকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন (৮, ১-২)। অভাববশতই হউক বা ক্রোধবশতই হউক পরে তিনি বসিষ্ঠের গাভীটিও বধ করিয়া নিজের এবং বিশ্বামিত্রের পরিবারের অন্নসংস্থান করিলেন। বসিষ্ঠ তাহাতে সত্যব্রতকে শাপ দিলেন এবং তাঁহার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিলেন (৮, ১৯)। কৃতজ্ঞ বিশ্বামিত্র তখন আসিয়া পুরোহিতহীন সত্যব্রতের সহায় হইয়া তাঁহার পৌরোহিত্যে ব্রতী হইলেন (৮, ২০-২৩)। সত্যব্রতও আসিয়া নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বসিষ্ঠ যদিও তাঁহার পৌরোহিত্য ছাড়িয়াছিলেন বিশ্বামিত্র সেই

শূন্যতা পূরণ করিলেন। রাজ্যপরিচালনার জন্যও বসিষ্ঠের আর কোনো প্রয়োজন রহিল না, পৌরোহিত্যও গেল। এইখানেই বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহের প্রধান হেতু পাওয়া যাইতেছে।

সুদাস রাজার পৌরোহিত্যে বিশ্বামিত্র অধিষ্ঠিত দেখা যায়। সেখানে তিনি আপন পরিচয় দিয়াছেন কুশিকবংশীয় বলিয়া।

বিশ্বামিত্রো যদ্ অবহৎ সুদাসম্
অপ্রিয়াযত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ ॥ —ঋগ্বেদ, ৩, ৫৩, ৯

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭, ৮, ৮ ; ৮, ৭, ৭) দেখা যায় বসিষ্ঠও সুদাসের পুরোহিত। সুদাসের এই পৌরোহিত্য লইয়াও উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকিতে পারে। ঋগ্বেদেই (৩, ৫৩, ১৫-১৬)। দেখা যায় বসিষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা। এই অতি পুরাতন উপাখ্যানটি মহাভারতে আদিপর্বের ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬-তম অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেখানে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ক্রোধপরায়ণ এবং বসিষ্ঠ ক্ষমাশীল। বহু পুরাণেই কল্মাষপাদের প্রতি বসিষ্ঠের শাপের কথা দেখা যায়। সেখানে বসিষ্ঠ ধ্যানযোগে কল্মাষপাদকে নির্দোষ জানিয়াও "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ দেন। রাজা কল্মাষপাদও বসিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন (ভাগবত, ৯, ৯, ২৪)। বিষ্ণুপুরাণে (৪, ৪, ৩০) এই বৃত্তান্তটি একটু বেশি বিস্তারে বলা হইয়াছে। কল্মাষপাদের এই শাপব্যাপারে কিন্তু ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়কেই অধিক ক্ষমাশীল দেখা গেল। কল্মাষপাদের সন্তান ছিল না। স্ত্রী-সম্ভোগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইজন্য পরে কল্মাষপাদের বংশ লোপ হয় বলিয়া বসিষ্ঠ কল্মাষপাদের অনুরোধে মদয়ন্তীতে পুত্র উৎপাদন করেন।

বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ —ভাগবত, ৯, ৯, ৩৯

বিষ্ণুপুরাণও বলেন পুত্রহীন রাজার অনুরোধে বসিষ্ঠ মদয়ন্তীতে গর্ভাধান করিলেন,

বসিষ্ঠশ্চ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং চকার ॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ৪, ৩৮

[৪]

শক যবন কাম্বোজ পারদ পহ্লব হৈহয় তালজঙ্ঘাদি জাতির লোকেরা পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সগরের পৈত্রিক রাজ্য ইঁহারা অপহরণ করাতে সগর তাঁহাদের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া সগরগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন

হইলেন (ঐ, ৪, ৩, ১৮)। বসিষ্ঠ এখানে খুব কূটরাজনীতিবিদের মত আচরণ করিলেন। তিনি শত্রু-হত্যায় উদ্যত সগরকে উপদেশ দিলেন "এই সব জাতির রক্তে বৃথা হস্ত কলুষিত করিও না।" শক যবনাদিকে হাতে না মারিয়া ভিতরে ভিতরে সংস্কৃতির দিক দিয়া মারিবার ব্যবস্থা বসিষ্ঠ করিলেন। সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইলে মানুষ তো জীবন্মৃত মাত্র। তাই তিনি সগরকে বলিলেন, "জীবন্মৃতদের মারিয়া আর লাভ কি ?"

অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ॥ —ঐ, ৪, ৩, ১৯

বসিষ্ঠ সগরকে কহিলেন, "তুমি ইহাদের উচ্ছেদই তো চাও? বেশ, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমিই ইহাদের ধর্ম্ম এবং সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণের সংসর্গ বন্ধ করিয়া দিলাম।"

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপালনায় নিজধর্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। —ঐ, ৪, ৩, ২০

হাতে না মারিয়াও মানুষকে ভিতরে ভিতরে যে এমনভাবে সমূলে বিনষ্ট করা যায়, এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট করিলেই তাহা ঘটে, এই কথা গুরু বসিষ্ঠের কাছে জানিয়া সগর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বসিষ্ঠ-উপদিষ্ট এবং হাতে না মারিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে মারিবার এই রাজনীতি সগরের অত্যন্ত মনঃপূত হইল। তখন সগর বলিলেন, "বেশ তবে তাহাই হউক," এই বলিয়া তাহাদের অস্ত্রে না মারিয়া তাহাদের বেশভূষা অন্যবিধ করিয়া দিলেন।

স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ॥ ঐ, ৪, ৩, ২১

তিনি যবনগণের মাথা মুণ্ডিত করাইলেন, শকদের অর্ধমুণ্ডিত করাইলেন, পারদদের লম্বিতকেশ করাইলেন, পহ্লবদের শ্মশ্রুধারী করাইলেন। ইঁহাদিগকে ও তাদৃশ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম হইতে বিচ্যুত করিলেন।

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্
পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্
এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার॥ —ঐ, ৪, ৩, ২১

ব্রাহ্মণদের সংসর্গরহিত হইয়া ও নিজধর্ম পরিত্যাগ করাতে তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল।

তে চ নিজধর্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ॥ —ঐ

আমাদের ইতিহাস ক্রমাগত এইরূপ আপনজনকে পর করিবার ইতিহাস। অতি পুরাতন কালে যে-কাজ সনাতনধর্ম্মনিষ্ঠ বসিষ্ঠ করিয়াছিলেন আজও সেই কাজ

চলিয়াছে। এমন করিয়াই আমরা ঘরের লোককে ক্রমাগত পর করিতেছি। কিন্তু পরকে ঘরের লোক করিয়াছেন ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিপন্থীরা। সে কথা অন্যত্র হইবে। নিজেদের সংস্কৃতি নিজেদের বেশভূষার যে কত গভীর ঐতিহাসিক মূল্য তাহা এই সব পুরাণকথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এখনকার দিনের পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীরাও যখন এই পথটিকে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন তখন তাঁহাদিগকে দোষ দিতে গিয়া মনে পড়ে এই পথের আদি প্রবর্তকদের মধ্যে বসিষ্ঠই একজন প্রধান।

যাহা হউক বসিষ্ঠ কিন্তু পরে বিশ্বামিত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র রোহিতকে বরুণ-যজ্ঞে বলি দিবার কথা ছিল। রোহিতের পরিবর্তে পরে শুনঃশেপকে যজ্ঞে বলি দিবার আয়োজন হয়। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ছিলেন হোতা, জমদগ্নি ছিলেন অধ্যর্যু, বসিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মা, অয়াস্য আঙ্গিরস ছিলেন উদ্গাতা।

তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্ জমদগ্নির্ অধ্যর্যুর্ব্যসিষ্ঠো ব্রহ্মাঽয়াস্য উদ্গাতা ॥

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ৩, ৪

এই কথা ভাগবতেও দেখা যায়—

বিশ্বামিত্রোঽভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্।
জমদগ্নিরভূদ্ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥ —৯, ৭, ২২

একই যজ্ঞে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র পৌরোহিত্যে ব্রতী হওয়াতে বুঝা যায় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব বসিষ্ঠ মানিয়া লইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পৌরোহিত্যের দাবী বিশ্বামিত্রেরই বেশি। কারণ সত্যব্রতকে সপরিবারে দুর্দিনে বিশ্বামিত্রই রক্ষা করেন। কিন্তু তবু এই দারুণ নরমেধ যজ্ঞে বসিষ্ঠকেও ব্রতী দেখা গেল। এই যজ্ঞেই দেখা গেল তিনি ও বিশ্বামিত্র একসঙ্গে পৌরোহিত্যের ব্রতে দীক্ষিত। কাজেই বুঝা যায় তখন এমন দারুণ যজ্ঞের ভার লইয়াও তিনি বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিলেন।

যদিও Vedic Index-এ বলা হইয়াছে বসিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তি তবু এখানেও আবার ভাল করিয়া বলা উচিত বসিষ্ঠ নামে পরিচিত বহু ঋষি ছিলেন এবং বিশ্বামিত্র নামে পরিচিতও বহু ঋষি ছিলেন। সকল বসিষ্ঠের সঙ্গে সকল বিশ্বামিত্রের বিরোধ হয় নাই। একের সঙ্গে যখন আর একজনের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই বিরোধ ঘটিয়াছে। সকল বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের

পরিচয় এখানে দিবার আবশ্যক নাই। পুরাণাদি গ্রন্থ দেখিলেই তাহা ভালো করিয়া বুঝা যাইবে।[১]

বিশ্বামিত্র ছাড়াও বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি মন্ত্রেরই ঋষি হইলেন মধুচ্ছন্দা (ঐতরেয় আরণ্যক ১, ১, ৩; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, ১৮, ২) তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭, ১৭, ৭)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুরবা ঋগ্বেদের মন্ত্রের ঋষি (১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত, ১, ৩, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৭ ঋক্)। দেবাপি আর্ষ্টিষেণের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। এই সব নাম ছাড়াও কোলব্রুক সাহেব আরও অনেক রাজর্ষির নাম করিয়াছেন।[২]

যে নারীরা এককালে বেদের বহু বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন সেই নারীরা এখন শূদ্র মাত্র, বেদের একটি কথাও উচ্চারণ এমন কি শ্রবণ করিবার অধিকারও তাঁহাদের নাই। নারীঋষিদের নাম এখন এত সুপরিচিত যে সেইজন্য আর এখানে তাঁহাদের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইল না।

ঋগ্বেদের দেবাপি (১০, ৯৮, ৫·৬·৮) রাজার কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে, তাঁহার কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। সেখানে তিনি আর্ষ্টিষেণ নামে পরিচিত, ইহা তাঁহার পিতার নামে প্রাপ্ত পরিচয়। দেখা যায় উগ্রতপাঃ তপঃকৃশ ধমনিব্যাপ্ত-কলেবর সর্বধর্ম-পারগ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্যসমূহে পরিশোভিত আশ্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন (বনপর্ব, ১৫৮, ১০২-২০৩)। পুরোহিত ধৌম্যও সেই রাজর্ষিকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন (বনপর্ব, ১৫৯, ৩)। সেই পুণ্য আশ্রমে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলেন। শল্যপর্বে দেখা যায় কপালমোচনতীর্থের মাহাত্ম্যকীর্তনে বলা হইয়াছে, "সেই স্থানে সংশিতব্রত ঋষিসত্তম আর্ষ্টিষেণ সুমহৎ তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন, রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ মহাতপা দেবাপি এবং মহাতপস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র মুনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

১ ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩৩৭, ভাদ্র, পৃ. ৩৩৭-৩৪৭) দেখিলাম আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী মহাশয় "বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সন্দেশ" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিষয়ে যিনি আরও ভালো করিয়া জানিতে চাহেন তিনি যেন নিশ্চয় ঐ প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখেন। বিশেষত: বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের নানা পরিচয় তিনি অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি যেমন সুচিন্তিত তেমনি সুলিখিত।

২ Asiatic Transactions, Vol. viii 393

যত্রাষ্টি ষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবান্ ঋষিসত্তমঃ॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ।
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ॥ —শল্যপর্ব, ৩৯, ৩৪-৩৭

এখানে যেন মনে হয় দেবাপি ও আষ্টির্ষেণ ভিন্ন ব্যক্তি। রা কথা মহাভারতে নানাস্থানে আছে। তিনি জহ্নুর বংশজাত (অনুশাসন, ৪,৩-৪)॥ দেবাপি আষ্টির্ষেণও বিশ্বামিত্রাদির মত ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন (শল্যপর্ব, ৪০, ১-২, ১০-১১)। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র রাজর্ষি বলাকাশ্ব, তাঁহার পুত্র বল্লভ (অনুশাসন, ৪, ৪-৫)।

বিশ্বামিত্র, রাজা হইয়াও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবংশকারক হইলেন (ঐ, ৪, ৪৮)। তাঁহার বহু পুত্র। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, ব্রাহ্মণবংশ-বিবর্ধন, তপস্বী, ব্রহ্মবিদ্ এবং গোত্রকর্তা।

তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্ধনাঃ।
তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্তার এব চ॥ —অনুশাসন, ৪, ৪০

সেই সব ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মর্ষিগণের নামের দীর্ঘ তালিকাও মহাভারত (ঐ, ৫০-৫৯) দিয়াছেন। মহাভারত আদিপর্বে দেখা যায় রাজর্ষি মনুর সন্তানেরা অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন (৭৫ অধ্যায়, ১২-১৫)। নহুষের ছয় পুত্র, তাহার মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (৭৫, ৩১)। ক্ষত্রিয়বংশজ বহু মহাত্মা ব্রাহ্মণ হইয়া অব্যয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন (আদি, ১৩৭, ১৪)।

ভৃগুমুনি এই বিষয়ে এত উদার যে তিনি জন্মদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব হয় এই কথা মানেনই না। তাঁহার মতে গুণ চরিত্রও আচার অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচয় (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১৮৯ অধ্যায়)। ভীষ্মও বলেন সদাচারযুক্ত শূদ্রও পূজ্য এবং সদাচারহীন ব্রাহ্মণও অপূজ্য (অনুশাসন, ৪৮, ৪৮)। এই সব কথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে।

শত্রু প্রতর্দনের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজা বীতহব্য ভৃগুর আশ্রমে শরণ লইলেন (ঐ, ৩০, ৪৪)। প্রতর্দনও আসিয়া আশ্রমে হাজির। তিনি বলিলেন, তোমার আশ্রমবাসীদের দেখিতে চাই (ঐ, ৪৭)। ভৃগু বলিলেন এখানে ক্ষত্রিয় কেহ নাই, এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ (ঐ, ৫৩)। রাজা প্রতর্দন সব বুঝিয়াও নম্রভাবে ভৃগুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যাহা হউক আমার

আর দুঃখের কারণ নাই। আমার তেজেই আজ আমি বীতহব্যকে স্বজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতি হইতে বহিষ্কৃত করাইলাম" (ঐ, ৫৫)। "এই আশ্রমস্থ সকলেই ব্রাহ্মণ" ভৃগুর এই বাক্যেই বীতহব্য ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলেন।

ভৃগোর্বচনমাত্রেণ স চ ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ॥ —ঐ, ৫৭

তাঁহার পুত্র গৃৎসমদরচিত শ্রুতি ঋগ্বেদে আছে।

ঋগ্বেদে বর্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ॥ —ঐ, ৫৯

গৃৎসমদ ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণদেরও পূজ্য হইলেন।

যত্র গৃৎসমদো রাজন্ ব্রাহ্মণৈঃ স মহীয়তে।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষি শ্রীমান্ গৃৎসমদোঽভবৎ॥ —ঐ, ৬০

গৃৎসমদের পুত্র ব্রাহ্মণ সুতেজা, সুতেজার পুত্র বর্চা, বর্চার পুত্র বিহব্য, বিহব্যের পুত্র বিতত্য, বিতত্যের পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা, শ্রবার পুত্র তম, তমের তনয় ব্রাহ্মণ সত্তমপ্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতিও ছিলেন বেদবেদাঙ্গপরাগ (ঐ, ৬১-৬৪)। প্রমতির ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুর জন্ম। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর পুত্র শুনক নামে ব্রহ্মর্ষির জন্ম। শুনকের পুত্র হইলেন শৌনক (ঐ, ৬৪-৬৫)। মহর্ষির প্রসাদে এইরূপে একটি ক্ষত্রিয়বংশের আগাগোড়া সকলেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলেন।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হইল হরিবংশ। তাহাতেও আমরা এই বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারি। নাভাগরিষ্টের দুইটি পুত্র ছিলেন বৈশ্য তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ হইয়া যান।

নাভাগরিষ্টস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥ —হরিবংশ, ১১, ৬৫৮

বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত অনুবাদে এই শ্লোকের বাংলা দেখিতেছি "নাভাগরিষ্টের দুইটি বৈশ্য পুত্র ছিল, তাহারা উভয়েই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে!" (পৃ. ২২) কিন্তু কেবলমাত্র অনুবাদের নৈপুণ্যে এত বড় একটি বিষয়কে কি চাপা দেওয়া যায়? বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সমস্ত শাস্ত্রেই এই বিষয়ে ভূরি ভূরি পরিচয়, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, রহিয়া গিয়াছে। সবগুলি তো আর এই রকমে সারিয়া দেওয়া যায় না।

গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের শৌনক নামে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতীয় অনেক পুত্র জন্মে (হরিবংশ, ২৯, ১৫১৯ শ্লোক)। গৃৎসমদ্ যে ক্ষত্রিয় বীতহব্যের পুত্র তাহা এইমাত্র মহাভারত হইতে দেখান হইল।

বৎসভূমির ও ভৃগুভূমির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি অসংখ্য পুত্র জন্মিয়াছে (হরিবংশ, ২৯, ১৫৯৭-১৫৯৮)।

বলিরাজার অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র কলিঙ্গ নামে পাঁচপুত্র। তাঁহারা বালেয় অর্থাৎ বলিবংশজ ক্ষত্রিয়, বালেয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সন্তান (হরিবংশ, ৩১, ১৬৮৪-১৬৮৫)।

প্রতিরথের পুত্র রাজা কণ্ব। মেধাতিথি কণ্বের পুত্র। পরে মেধাতিথি হইতেই কণ্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন (ঐ, ৩২, ১৭১৮)।

শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের ঔরসে রাজা ভরতের জন্ম। ক্ষত্রিয় পিতা বলিয়াই ভরত ক্ষত্রিয়। সন্তান পিতার জাতিই প্রাপ্ত হয়। হরিবংশ বলেন "মাতা তো চর্মপাত্র মাত্র, সন্তান হয় পিতার। যাহার দ্বারা উৎপাদিত সন্তান তাহারই স্বরূপ।"

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাত স এব সঃ॥ —হরিবংশ, ৩২, ১৭২৩ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ১৯, ২

ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অনেক পুত্র জন্মে (হরিবংশ, ৩২, ১৭৩৪)।

আঙ্গিরা হইতে ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অনেক পুত্র জন্মে (ঐ, ৩২, ১৭৫৩-১৭৫৪)।

পুরুবংশীয় রাজা ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিক, এই উভয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবংশ যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা লোকপ্রসিদ্ধ।

পৌরবস্য মহারাজ ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সম্বন্ধো হ্যস্যবংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ॥ —ঐ, ৩২, ১৭৭৩

রাজা দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। মিত্রয়ু হইতেই মৈত্রায়ণী শাখা প্রবর্তিত। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত ভার্গবব্রাহ্মণ (ঐ, ৩২, ১৭৮৯-১৭৯০)। মৌদ্গল্যরাও ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৩২, ১৭৮১)।

হরিবংশের সম্পূর্ণ সমর্থন মেলে বিষ্ণুপুরাণে। রথীতরের বংশীয়গণ ক্ষত্রিয়-বংশজাত। তাঁহারা আঙ্গিরস বলিয়া পরিচিত। তাই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ২, ২), অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার পুত্র হরিত, তাঁহা হইতে জাত হারিত আঙ্গিরসবংশ (ঐ, ৪, ৩, ৫)। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক চাতুর্বর্ণ্যেরই প্রবর্তয়িতা (ঐ ৪, ৮, ১)। ভার্গভূমি হইলেন ভার্গের পুত্র, তিনিও চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্তয়িতা (ঐ, ৪, ৮, ৯) নেদিষ্টপুত্র নাভাগ হইয়া গেলেন বৈশ্য (ঐ, ৪, ১, ১৫), অথচ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাহা অন্যত্র দেখান হইয়াছে। গর্গ হইতে শিনি, তৎপুত্রগণ গার্গ্য ও শৈনেয় নামে পরিচিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (৪, ১৯, ৯)। রাজা অপ্রতিরথ হইতে জাত কণ্ব, কণ্ব হইতে জাত মেধাতিথি। তাঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন (ঐ, ৪, ১৯, ২ ; ৪, ১৯, ১০),

মুদ্‌গল হইতে মৌদ্‌গল্যগণ ব্রাহ্মণ হইলেন কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশজাত। ঐ ৪, ১৯, ১৬

ভাগবতের মধ্যেও এই সব ইতিহাসেরই সমর্থন দেখা যায়। ভগবান ঋষভদেবের শতপুত্র। জ্যেষ্ঠ ভরত হইলেন ভারতবর্ষের অধিপতি। কনিষ্ঠ ৮১ জন মহাশালীন মহাশ্রোত্রিয় যজ্ঞশীল কর্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেন (৫ম স্কন্ধ, ৪, ১৩)। ক্ষত্রিয় পুরুবংশ হইতে কোনো কোনো বংশ হইল ক্ষত্রিয় কোনো কোনো বংশ হইল ব্রাহ্মণ (ভাগবত ৯, ২০, ১) রাজা রথীতরের সন্তান না হওয়ায় অঙ্গিরা তাঁহার পত্নীতে সন্তান উৎপন্ন করেন। রাজা রথীতরের বংশে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মিলেন (ঐ ৯, ৬, ৩)। ভরতবংশীয় গর্গ হইতে শিনি, তাঁহা হইতে গার্গ্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন (ঐ ৯, ২১, ১৯)। রাজা দুরিতক্ষয় হইতে তিন পুত্র, এয্যারুণি কবি ও পুষ্করারুণি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন (ঐ, ৯, ১১, ১৯-২০)। ক্ষত্রিয় মুদ্‌গলের বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া মৌদ্‌গল্য নামে পরিচিত হইলেন (ঐ, ৯, ২১, ৩৩)। করূষ ক্ষত্রিয়, তাঁহার বংশীয়গণ ব্রহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (ঐ, ৯, ২, ১৬)। পারের পুত্র নীপ, তাঁহার শতপুত্র। তিনিই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে যোগী ব্রহ্মদত্তকে জন্মদান করেন (ঐ ৯, ২১, ২৪-২৫)। ক্ষত্রিয় মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাঁহার বংশীয়গণ জন্মত ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন (ঐ, ৯, ২, ১৭)। নাভাগোদিষ্টপুত্রেরা কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ আবার বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (ঐ, ৯, ২, ২৩)।

বায়ুপুরাণও (বঙ্গবাসী, ৯৩, ১৪) বলেন রাজা নহুষের পুত্র সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ এই তিন জন মান্ধাতার সন্তান। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। ইঁহারা সকলেই শূর। ইঁহারা আঙ্গিরস এবং ক্ষত্রবংশীয় হইয়াও ব্রাহ্মণ।

এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥ —৮৮, ৭১-৭৩

[৫]

বায়ুপুরাণ আরও বলেন, আদিকালে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই বর্ণসঙ্করও ছিল না।

বর্ণাশ্রমব্যবস্থা চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ॥ —বায়ু, ৮, ৬১

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতে চাই। বায়ুপুরাণের এই স্থানে প্রাচীন কালের গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারের অনেক চমৎকার

ইতিহাসের ইঙ্গিত দেখা যায়, "যেমন মানবেরা পূর্বে যে বৃক্ষাশ্রয়ে অবস্থান করিত তদ্রূপই গৃহ নির্মাণও করিত, পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া তাহারা বৃক্ষনিদর্শনে বৃক্ষের শাখা বিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠ বিস্তার করিয়া উত্তম গৃহ নির্মাণ করিল,"

যথা তে পূর্বমাসন্ বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতা।
তথা কর্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥ —বায়ু, ৮, ১২২-১২৩

শাখাকারে নির্মিত বলিয়াই গৃহের নাম হইয়াছে শালা (ঐ, ৮, ১২৫)।

বায়ুপুরাণের মতে, কর্মের শুভাশুভ অনুসারে সব জাতি নির্ণীত হইল।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা।
ভাবিতাঃ পূর্বজাতীষু কর্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥ —ঐ, ৮, ১৩৯-১৪০

যাঁহারা অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয়।

ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥ —ঐ, ৮, ১৬২

যথাভূতবাদী সত্যবাদী ব্রহ্মবাদীদের করা হইল ব্রাহ্মণ।

সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে॥ —ঐ, ৮, ১৬৩

প্রজাবৃদ্ধির জন্য ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ঠকে ব্রহ্মা মানসপুত্র করিয়া সৃজন করিলেন (ঐ, ৯, ৬৮-৬৯)। ইঁহারা নব ব্রাহ্মণ বলিয়া পুরাণে বর্ণিত।

নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ঙ্গতা॥ —ঐ, ৯, ৬৯

স্থানান্তরে বায়ুপুরাণ মনুকেও এই নয়জনের সঙ্গে ধরিয়া ব্রহ্মার দশটি মানসপুত্রের কথা বলিয়াছেন—

ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ॥ —ঐ, ৫৯, ৮৮

ইঁহারা সকলেই মহর্ষি (ঐ, ৫৯, ৮৯)। মহর্ষি ঋষি মুনিদের পরিচয় ও তাঁহাদের বংশজাত সব ব্রাহ্মণদের পরিচয় এই অধ্যায়েই দেওয়া হইয়াছে।

বায়ুপুরাণ বলেন, অনেক ক্ষত্রবংশজাত মহাত্মা তপস্যার বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া মহর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজা বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনূহবান, ঋথু, আর্ষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয় বংশজ হইয়াও তপস্যাবলে ঋষিত্বলাভ করিয়াছেন (বায়ু ৯১, ১১৫-১১৭)।

রাজা গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে বিভিন্ন কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণই উৎপন্ন হয়েন (বায়ু, ৯২, ৪-৫)। শৌনক ও আর্ষ্টিষেণ ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৬২, ৬)।

নহুষ-পুত্র সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া মুনি হইলেন (ঐ, ৯৩, ১৪)। ব্রহ্মর্ষি কক্ষীব ও চক্ষুষ শূদ্রাগর্ভজাত (ঐ, ৯৯, ৭০)।

দিব্য ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন (ঐ, ৯৯, ১৫৭)। গাগ্রবংশীয়গণ ক্ষত্রিয়বংশজ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন (ঐ, ৯৯, ১৬১)। গ্রাগ্র সাঙ্কৃতি ও বীর্য-বংশীয়গণও ক্ষত্রবংশজাত হইয়া ব্রাহ্মণ হন (ঐ, ৯৯, ১৬৪)। ক্ষত্রিয় কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি, ইঁহা হইতেই কাণ্ঠায়ন ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ (ঐ, ৯৯, ১৭০)। রাজা সংনতির পুত্র কৃত। ইনি কৌথুমশাখী হিরণ্যনাভের শিষ্য ও চতুর্বিংশতি প্রকার সামবেদের বক্তা (ঐ, ৯৯, ১৮৯-১৯০)। তাঁহার প্রবর্তিত সংহিতাগুলি প্রাচ্য নামে খ্যাত (ঐ, ১৯১)। মুদ্‌গলের বংশীয়রা মৌদগল্য, তাঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৯৯, ১৯৮)। রাজা দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ মিত্রযু রাজা। তাঁহার বংশীয়গণ জন্মত ক্ষত্রিয় হইলেও তপোবলে ব্রাহ্মণ (ঐ, ২০৭)।

লিঙ্গপুরাণ (পূর্বভাগ, ৩৮ অধ্যায়) বলেন, মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ অত্রি বসিষ্ঠ সঙ্কল্প ধর্ম ও অধর্মকে বিষ্ণু যোগবিদ্যাবলে সৃষ্টি করেন।

সত্যযুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, বর্ণসঙ্করও তাই ছিল না (ঐ, ৩৯, ১৯)।

পদ্মযোনি প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে ক্ষত্রিয়গণকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বীয় সামর্থ্যবলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিলেন (ঐ ৪৯)।

রাজা যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। এই হরিতবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া হারিত নামে বিখ্যাত হন। ইঁহারা অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপত ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবৃন্দ। এই বিষ্ণুবৃন্দ হইতে বিষ্ণুবৃন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। ইঁহারাও অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৬৫ অধ্যায়)।

ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায় নাভাগ ও ধৃষ্টের ক্ষত্রিয় সন্তানেরা বৈশ্যত্বপ্রাপ্ত হন (৭, ২৬)। বিশ্বামিত্র তপস্যা বিদ্যা ও শমপ্রভাবে ব্রহ্মর্ষিপদ প্রাপ্ত হন (১০, ৫৫-৫৬)। এই বংশে বহু সন্ততি। ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মর্ষির সম্বন্ধহেতুতে এই বংশ ব্রহ্মক্ষত্র নামে বিখ্যাত (১০, ৬৩)। রাজা বলির বংশধরগণ বালেয় ক্ষত্রিয়। বালেয় ব্রাহ্মণেরাও তাঁহারই সন্তান (১৩, ২৯-৩১)। রাজা গৃৎসমতির সন্তানেরা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ ক্ষত্রিয় কেহ বৈশ্য (১৩, ৬৪)। ক্ষত্রিয় বৎসের ও ভার্গের সন্তানদেরও কেহ ব্রাহ্মণ কেহ ক্ষত্রিয় কেহ বৈশ্য কেহ বা শূদ্র (১৩, ৭৮-৭৯)।

ব্রাহ্মণ-ধর্ম আচরণ ও ব্রাহ্মণ-জীবিকা অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

স্থিতো ব্রাহ্মণধর্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥ ব্রহ্মপুরাণ—২২৩, ১৬

শুভ কর্মে বা আচরণে বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হয়, এমন কি শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং গচ্ছেদ্ বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ —২২৩, ৩২

সত্যবাদী, নিরহংকার নির্দ্বন্দ্ব, মধুরভাষী, নিত্যযাজী, স্বাধ্যায়বান, শুচি, দান্ত, ব্রাহ্মণসৎকর্তা, সর্ববর্ণের অনসূয়ক, গৃহস্থব্রত হইয়া দ্বিকালমাত্রভোজী, শেষাশী, বিজিতাহার, নিষ্কাম, গর্বহীন, যজ্ঞশীল, অতিথিপরায়ণ হইলে বৈশ্যও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। (২২৩, ৩৭-৪০)

শূদ্রও যদি আগমসম্পন্ন ও সংস্কৃত হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হয়।

শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ —২২৩, ৫৩

ইহার বিপরীতবৃত্ত ব্রাহ্মণও শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। (৫৪)

শুচিকর্মপরায়ণ শূদ্রকেও ব্রাহ্মণবৎ সেবা করিবে, স্বয়ং ব্রহ্মার এই মত। (২২৩, ৫৫)

জাতি সংস্কার শ্রুতি সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে, চরিত্রই কারণ। সাধু চরিত্রেই-ব্রাহ্মণ হয়, সদ্বৃত্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। সর্বত্র সমদর্শনই ব্রহ্মস্বভাব। নির্মল নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার তিনিই ব্রাহ্মণ।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতির্নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।
সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি।
ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্বত্র মে মতঃ।
নির্গুণং নির্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥ —২২৩, ৫৬-৫৯

ব্রাহ্মণও যাহাতে শূদ্র হয় এবং শূদ্রও যাহাতে ব্রাহ্মণ হয় তাহা বলা হইয়াছে। (২২৩, ৬৫-৬৬)

মোটের উপর দেখা যায় বৈদিক যুগে জাতিভেদের বাঁধাবাঁধিই ছিল না। ক্রমে যখন জাতিভেদ প্রবর্তিত হইল তখনও এখনকার দিনের মত বাঁধাবাঁধি হয় নাই। মহাভারতের যুগে ও পুরাণাদির কালে জন্মগত জাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং ব্রাহ্মণবংশজাত ব্রাহ্মণদের বহু প্রশংসা ও মাহাত্ম্য নানাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

তবু তখনও যে সমাজের মন হইতে প্রাচীন রীতিনীতি ও আদর্শ একেবারে মুছিয়া যায় নাই তাহা দেখাইবার জন্যই মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইল। এইরূপ কথা আরও বহু স্থানে এবং আরও বহু পুরাণে উল্লিখিত আছে কিন্তু আর বেশি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন এবং পাঠকের ধৈর্যের পক্ষেও তাহা কল্যাণকর হইবে না। যাঁহার এই বিষয়ে অনুরাগ আছে তিনি মূলগ্রন্থগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদাদির সাহায্যে এই উদারতার ভাবটাকে অনেকটা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তবু সম্পূর্ণরূপে তাহা চাপা দেওয়া অসম্ভব।

কেরলদেশে পরশুরাম যে ধীবরদের গলায় পৈতা দিয়া তাহাদের ব্রাহ্মণ করিয়াছেন সে-কথা অনেকেই জানেন, পুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে। ভবিষ্যপুরাণ (ব্রাহ্মপর্ব, ৪২ অধ্যায়, ২২) বলেন, ব্যাস ধীবরীগর্ভজাত, পরাশর শ্বপচকন্যার সন্তান, শুকদেব শুকীর পুত্র, অনার্য উলূকীর পুত্র কণাদ ইত্যাদি জ্ঞানী-তপস্বী। বসিষ্ঠের পত্নী অক্ষমালার পূর্বজাতিও ছিল হীন।

ব্রাহ্মণকে চিনিতে হইবে তাঁহার জ্ঞান ও তপস্যা দিয়া। কুলপরিচয়ে জানিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই বৃথা দুঃখ দেওয়া ও পাওয়া মাত্র সার হয়। তাই কৃষ্ণযজুর্বেদ বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আবার বাপমায়ের খোঁজ লওয়া কেন? যদি তাহার মধ্যে জানিবার মত শ্রুত থাকে তবে সে-ই তাহার পিতা, সে-ই তাহার পিতামহ।"

> কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্।
> শ্রুতং চেদস্মিন্ বেদ্যং স পিতা স পিতামহঃ ॥—যজুর্বেদ, কাঠকসংহিতা, ৩১, ১

মহাভারতে শান্তিপর্বের ১৮৮, ১৮৯তম অধ্যায়ে সেই প্রাচীন ভাবেরই প্রতিধ্বনি। এই শান্তিপর্বেই ভীষ্মের কথায় জানিতে পারি, একতা, সত্যতা, মর্যাদা, অহিংসা, সরলতা এবং কর্মে অনাসক্তি ব্রাহ্মণের যেমন বিত্ত এমন বিত্ত আর তাহার কিছুই নাই।

> নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ
> শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥—শান্তিপর্ব, ১৭৫, ৩৭

এই ভাবটি ক্রমেই ভারতে দুর্লভ হইয়া আসিল। তবে ভরসার কথা কচিৎ এখনও মাঝে মাঝে তাহা দেখা দেয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে একদিন কানপুরের নিকট বিঠুরে গঙ্গাতীরে একটি স্নানরত আচারনিষ্ঠ অর্চনার্থী ব্রাহ্মণের গায়ে একটি শূদ্রের জলের ছিটা আসিয়া পড়িতে ব্রাহ্মণ একেবারে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে

মারিতে উদ্যত হইলেন। সেখানে স্নান করিতেছিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা তুলসী হাথরসী। শূদ্র তো লজ্জায় ও সংকোচে কম্পমান। সাধুশ্রেষ্ঠ তুলসী এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শূদ্রের উপর তোমার এমন ক্রোধ কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শূদ্র ভগবানের চরণে জাত নিকৃষ্ট জঘন্য, তাই।" তখন তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গায় আসিয়াছ কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গঙ্গা ভগবানের পাদোদ্ভবা জগৎপাবনী বলিয়া।" তুলসী বলিলেন, "হায়, যেই চরণে উদ্ভূত জলময়ী গঙ্গা পবিত্রতার গুণে জগৎতারণসমর্থা সেই চরণে জন্মিয়াই শূদ্র এমন দীনহীন পতিত যে, সে যাহাকে স্পর্শ করে সেই হইয়া যায় অপবিত্র!"

এই মহাত্মা তুলসী অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বাক্য প্রাচীন যুগের কাঠকসংহিতার মন্ত্ররচয়িতা উদার মহর্ষিদের বংশধরদেরই উপযুক্ত হইল।

৭

বর্ণাশ্রমের আদর্শ

যখন বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবর্তিত হয় তখন তাহার সঙ্গে একটা খুব উচ্চ সামাজিক আদর্শও লোকনেতাদের মনে থাকার কথা ছিল। তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণের স্থান যেমন দিলেন উচ্চে তেমন তাহার দায়িত্বও দিলেন অপরিসীম। সকলে যদি ব্রাহ্মণকে মানে তবে সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীর জ্ঞান, উচ্চ আদর্শ, কঠোর তপস্যার সমন্বয় করিয়া সমস্ত সমাজকে তপস্বী ব্রাহ্মণেরা অতি সহজে অল্প ব্যয়ে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ইহা খুবই বড় কথা। তাই তখনকার দিনে আদর্শরক্ষা অর্থই ছিল ব্রাহ্মণকে রক্ষা। ব্রাহ্মণরক্ষার্থ তখন সর্বত্র সেইজন্য এত ব্যাকুলতা। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে ব্রাহ্মণের নিত্যযোগ না থাকিলে তো এই ব্রাহ্মণরক্ষার কোনো অর্থ হয় না। ইতিহাসের কাছেই প্রশ্ন করিতে হয় এই আদর্শ কি পরে বজায় থাকিল? শ্রদ্ধা ও সম্মান যেখানে সুলভ এবং বিনা তপস্যাতেও তাহা যেখানে লভ্য, সেখানে মানুষ ধীরে ধীরে কি আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া পারে? তখন দিনে-দিনে তপস্যা ও আদর্শ শক্তিহীন নির্বীর্য হইয়া যায়। সাত্ত্বিকতা এমন কি রাজসিকতার স্থানেও অচল হইয়া বিরাজ করিতে থাকে জড় তামসিকতা। এমন করিয়াই তো ক্রমে তপোভূমিগুলি পরিণত হইল তীর্থে ও মঠে, আচার্য ও তপস্বীরা পরিণত হইলেন পাণ্ডায় ও মহন্তে।

আজ যাঁহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া সমাজকে পথ দেখাইবেন তাঁহারা সরল অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন ছাড়িয়া বড় বড় চাকুরি ও জঘন্য সব ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এমন অবস্থায় পুরাতন সম্মানের লোভ পরিত্যাগ না করিলে চলিবে কেন? দুই দিকেরই সুবিধা কি একসঙ্গে দাবি করা যায়? হয় তপস্বিজনোচিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠা উপার্জন করুন না হয়তো এখনকার দিনের আরাম ও ঐশ্বর্য মনের সুখে সম্ভোগ করুন। একসঙ্গে দুই দিকেই লোভ যেন কেহ না করেন।

শাস্ত্র কিন্তু জোরের সহিতই বলেন যে ব্রাহ্মণের আদর্শ উচ্চ ও মহান থাকা চাই, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণও আর ব্রাহ্মণ থাকেন না। তাই স্কন্দপুরাণ বলেন যে ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে থাকিয়া বেদ বিক্রয় করে সে পতিত (প্রভাস খণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ২০৭ অধ্যায় ২২, ২৭)। সদাচারহীন ব্রাহ্মণও শূদ্র (ঐ ২৮-৩২)।। হীনবৃত্তি দ্বারা বা সুদ খাইয়া যে ব্রাহ্মণ বাঁচে সে শূদ্র (ঐ, ৩৩),

দুর্নীতিপরায়ণ (ঐ ৩৪) ব্রাহ্মণও শূদ্র। সুদ খাইলে ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য হয়, তবে আপৎকালে যদি কেহ এই বৃত্তি লইতে বাধ্য হয় তবে স্নান করিলে তখনকার মত মাত্র সে স্পৃশ্য হয় (ঐ ৫৯)। বেদবিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকর্মান্বিত হইলেও শূদ্রমাত্র (সৌরপুরাণ, ১৭ অ, ৩৭)। তাহার পুত্র বেদাধ্যায়ী হইলেও সে শূদ্রপুত্র বলিয়া গ্রহীতব্য ঐ, ২৭, ৩৯। শুধু বেদ পড়িলে হইবে না। বেদ পড়িয়াও বিচার পূর্বক যে ব্রাহ্মণ তাহার তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম সে শূদ্রকল্প এবং অপাত্র। (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২৬, ১৩৫)।

তখনকার যুগে যাঁহারা লোকমতকে চালনা করিতে চাহিতেছিলেন তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে যে মহৎ আদর্শ ছিল সেই আদর্শটি যাহাতে সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলে এই ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। তাই বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মানবমাত্রেরই সার্থকতা ও পরমকল্যাণসাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ থাকে সেখানেই মানুষের বিচারবুদ্ধিও জাগ্রত থাকে। যেখানে কোনো আদর্শ বা লক্ষ্যই নাই সেখানে আবার বিচার কিসের? তাই সেই যুগেও জাতিভেদের দ্বারা তখনকার দিনের মানবজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য যখন সফল হয় নাই তখন সেই যুগেই তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে বিচারবাণীও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার দিনে এই সব বালাই নাই। এখন আদর্শ বা উদ্দেশ্য কোথায়? এখনকার দিনে বিচারই বা হইবে কিসের? প্রাচীন কালের তুলনায় আমাদের চিত্ত এইসব বিষয়ে একেবারে তামসিকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তবু মাঝে মাঝে এক-আধবার মনে বিচারবুদ্ধি যদি জাগে পরক্ষণেই চারিদিকের তামসিক অবস্থার মধ্যে তাহা বিলীন হয়।

এইসব বিচার-বিতর্ক যে শিক্ষিত কাহারও কাহারও মনে আজকালই উঠিতেছে তাহা নহে। আউল-বাউলরা বহুদিন হইতে এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করিতেছেন। কবীর রবিদাস তুকারাম নানক দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইসব বিষয়ে বারবার তাঁহাদের তীব্র বাণী ব্যবহার করিয়াছেন। জাতিভেদ জিনিসটা দক্ষিণ-ভারতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল তাই দক্ষিণ দেশের তামিল ও তেলেগু কবিদের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ঘোষণা দেখা যায়।

তামিলদেশে অগস্ত্যলিখিত বলিয়া প্রথিত তামিল গ্রন্থে আছে, "সহজ অন্নসংস্থানের জন্য জাতিভেদ মানুষেরই রচিত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণপোষণের জন্যই বেদ রচিত।" তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য বলেন, "জন্ম মৃত্যু সবারই সমান। কোথাও ভেদ নাই।" সূক্ষ্মবেদান্ত গ্রন্থেও একই কথা: "যেদিন হইতে নারীরা শূদ্র হইলেন, সেদিন হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত সবাই পারশব। ব্রাহ্মণকন্যা

হইলে হইবে কি, নারীমাত্রই যে শূদ্র। তার পর পারশবের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান তার আবার জাতি কি? এই অনন্তপরম্পরায় যে-সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ জাত তাদের আবার কিসের ব্রাহ্মণত্ব?"

তেলেগু কবি বেমন বলেন, "জন্মকালে কোথায় গায়ত্রী কোথায় উপবীত? সূত্রহীনা মাতা শূদ্রা। তার পুত্র আবার কেমনে হয় ব্রাহ্মণ? সবাই সমান, সবাই ভাই। সবারই জন্ম একভাবে, একই রক্তমাংসে সবার শরীর। তবে কেন এত ভেদ-বিভেদ? ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মত সকলে এক হইয়া কেন রহ না[১]?"

বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বসব ও রময্য উভয়েই সবলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। জৈন ও বৌদ্ধগণও এই প্রথাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাভারতে দেখি রাজা যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "সত্য দান ক্ষমা শীলতা আনৃশংস্য তপ দয়া যে ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় সে-ই ব্রাহ্মণ" (বনপর্ব, ১৮০, ২১)। "শূদ্রবংশ হইলেই কেহ কিছু শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণবংশ হইলেই কিছু ব্রাহ্মণ হয় না; যাঁহাতে এই সব সদ্‌বৃত্ত লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ, তাহা না থাকিলে তিনি শূদ্র" (ঐ ১৮০, ২৫-২৬)। এইখানকার এই আলোচনা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, তবু প্রয়োজনবশত এখানে পুনরায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। মহাভারত-শান্তিপর্বে ঠিক এই কথাই ভৃগু ভরদ্বাজকে একটু বিস্তৃত করিয়া ও স্পষ্টতর করিয়া বলিতেছেন (১৮৯ অধ্যায়, ১-৮)। বর্ণভেদ বিষয়ে ভরদ্বাজকে ভৃগু বলিলেন, "ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত, শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ৫)। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, "তবে তো দেখা যায় সর্বত্রই বর্ণসঙ্কর চলিয়াছে (ঐ, ১৮৮, ৬)। সবারই মানসিক ও দৈহিক ধর্ম এক, তবে বর্ণভেদ হয় কিসে? (ঐ, ১৮৮, ৭-৯)। তাহাতে ভৃগু বলিলেন, "এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, বর্ণসকলের বিশিষ্টতা কিছুই নাই। পূর্বে ব্রহ্মা সব (একভাবেই) সৃষ্টি করেন, নিজ নিজ কর্ম (বৃত্তি) অনুসারে বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১০)। তাহার পর নানা কাজকর্মও মানসিক বৃত্তি ভেদে বর্ণভেদ-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে দেখানো হইয়াছে (বনপর্ব, ১৮৮, ১১-১৮)।

মহাভারতে আদিপর্বে দেখা যায় ভীম কর্ণকে জন্মসম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলে দুর্যোধন ভীমকে বলিলেন, "বীরগণের ও নদীসকলের উৎপত্তিস্থান দুর্জ্ঞেয়।"

শূরাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদাঃ প্রভবাঃ কিল। —আদি, ১৩৭, ১১

"অগ্নির উৎপত্তি হইল জল হইতে, অথচ চরাচর তাহাতে ব্যাপ্ত। দধীচির অস্থি

১ Wilson, *What the Castes are,* Vol. II, p. 90

হইতেই দানবসূদন বজ্রের উৎপত্তি। অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও গঙ্গার সন্তান হইলেন কার্তিক (আদিপর্ব, ১৩৭, ১২-১৩)। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অব্যয় ব্রহ্মত্বলাভ করিয়াছেন (ঐ, ১৩৭, ১৪)। জলপাত্র হইতে জন্মলাভ করিয়াও আচার্য দ্রোণ শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ। গৌতমবংশীয় গৌতমের জন্ম তো শরস্তম্বে (ঐ, ১৩৭, ১৫)। হে পাণ্ডব, তোমাদের জন্মকথাও তো আমাদের অজ্ঞাত নহে (ঐ, ১৩৭, ১৬)।"

এই রকম সব কথাই অতি তীব্রভাবে ঘোষিত হইয়াছিল বজ্রসূচী বা বজ্রসূচিকোপনিষদে। দক্ষিণদেশে "কপিলদ্বীপম্" নামে ঠিক এইরূপ "জাত-পাঁত-তোড়ক" গ্রন্থ আছে। তেলেগু শূদ্র কবি বেমনও বর্ণাশ্রমধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন[১] কিন্তু বজ্রসূচীকোপনিষদের মত অগ্নিময়ী বাণী কাহারও নহে।

বজ্রসূচীর রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। ১৮২৯ সালে নেপালে হডসন সাহেব একখানি হস্তলিখিত বজ্রসূচী গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন গ্রন্থখানির রচয়িতা অশ্বঘোষ। উইণ্টারনিট্জ সাহেবের মতে অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বজ্রসূচীর একখানি পুঁথি নাসিকে পাওয়া যায়। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলেন তাহা শঙ্করাচার্য রচিত। ৯৭৩-৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে চীনভাষাতে একখানি বজ্রসূচী অনুবাদিত হয়। সেখানে বলা হইয়াছে ইহার রচয়িতা ধর্মকীর্তি। ভারতবর্ষে কিন্তু বজ্রসূচীগ্রন্থ উপনিষদ বলিয়াই পরিচিত। উপনিষদের তো আর রচয়িতা থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার কাছে কয়খানা বজ্রসূচিকোপনিষৎ আছে। তাহার কোনোটিতেই এই গ্রন্থরচয়িতার বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণসীকর রচিত গ্রন্থে, খেমরাজ কৃষ্ণদাস প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্র মূল আছে। মান্দ্রাজ আড্যারের মহাদেব শাস্ত্রীর সংস্করণে শ্রীবাসুদেব-শিষ্য উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগীর একটি ব্যাখ্যাও আছে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে বাংলা অনুবাদও আছে। এই গ্রন্থখানিতে বিচার্য, ব্রাহ্মণ কে? জীব বা দেহ বা জাতি বা জ্ঞান বা কর্ম বা ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। অদ্বিতীয়াত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ব্রাহ্মণ হয়।

অতিশয় তীব্রভাষাতে অথচ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে এই গ্রন্থখানি লেখা। রাজা রামমোহন এই গ্রন্থখানি দেখিয়া তাহার বিচারপ্রণালীতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে বুঝা যাইবে না যে বজ্রসূচীর বিচারপ্রণালী কিরূপ সংহত

১ Nanjundayya and Iyer, *Mysore Tribes and Castes*, Vol. IV, p. 468

সংযত অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই বজ্রসূচীগ্রন্থ হইতে কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

তত্রচোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানম্, কিং ধার্মিক ইতি ॥ ২ ॥

"অর্থাৎ প্রশ্ন উঠিতেছে কে ব্রাহ্মণ? জীব দেহ জাতি জ্ঞান বা ধর্মরত, ইহার মধ্যে কে ব্রাহ্মণ?"

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্বশরীরাণাং জীবস্য একরূপত্বাচ্ চ। তস্মান্ ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৩॥

"প্রথমেই বিচার করা যাউক জীবই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহা তো নহে। অতীত ও অনাগত কালে অনেকবিধ ও অনেক জাতীয় দেহের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে যে জীব তাহার তো একরূপত্ব, একই জীবের কর্মবশত অনেক দেহসম্ভবত্ব, সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় জীব তো ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। আচণ্ডালাদিপর্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্য একরূপত্বাৎ জরামরণধর্মাধর্মাদিসাম্যদর্শনাৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৪ ॥

"দেহই কি তবে ব্রাহ্মণ? না, তাহা নহে। আচণ্ডালাদি সকল মানুষেরই দেহ পাঞ্চভৌতিক এবং একরূপ, এবং সর্বত্রই জরামরণধর্মাধর্মের সমতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এমন তো কোনো নিয়ম দেখা যায় না। দেহ ব্রাহ্মণ হইলে পিতার দেহ দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইত। তাহাই বা হয় কই? তাই দেহ ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবাৎ মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বূকো জম্বূকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্তকন্যকায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বসিষ্ঠ উবর্শ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলশে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাঽপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৫ ॥

"তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? তাহা নহে। তবে জাত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক জন্তুতেও অনেক জাতি জন্মিত। মনুষ্যজাতি ছাড়াও নানা স্থানে বহু মহর্ষির উদ্ভব ঘটিয়াছে। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বূক হইতে জাম্বূক, বল্মীক হইতে বাল্মীক, কৈবর্তকন্যাতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশীতে বসিষ্ঠ, কলশের মধ্যে অগস্ত্য জাত এইরূপ শ্রুতি আছে। জাতি বিনাই জ্ঞানসম্পন্ন ঋষি বহুতর আছেন। তাই জাতি ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। ক্ষত্রিয়াদয়ঃ অপি পরমার্থদর্শিনঃ অভিজ্ঞাঃ বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি॥ ৬॥

"জ্ঞানই কি তবে ব্রাহ্মণ? অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ক্ষত্রিয়ও তো বহু আছেন। তাই জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসংচিতাগামিকর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি। তস্মান্ ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি॥ ৭॥

"কর্মই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীরই তো প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্মের সমতা দৃষ্ট হয়। কর্মের দ্বারা অভিপ্রেরিত হইয়াই সকলে ক্রিয়া করে। তাই কর্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।"

তর্হি ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি॥ ৮॥

"তবে কি ধার্মিকই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। হিরণ্যদাতা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রও তো অনেক আছেন। তাই ধার্মিকও ব্রাহ্মণ নহেন।"

তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং...সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং...সাক্ষাদ্ অপরোক্ষীকৃত্য...বর্ততে...স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব॥ ৯॥

"তবে ব্রাহ্মণ কে? অদ্বিতীয় জাতিগুণক্রিয়াহীন সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ আত্মাকে যিনি অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, ইহাই হইল শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ-ইতিহাসাদির অভিপ্রায়। অন্যথা আর কোনো প্রকারেই ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধি হইতে পারে না।"

এইখানে ভবিষ্যপুরাণের নামও করা উচিত। ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্বে ৪১, ৪২ অধ্যায়ে ভীষণ ভাবে তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মকে ঠিক এই রকমেই আক্রমণ করা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ বলেন, "যেহেতু শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের সামগ্রী এবং অনুষ্ঠানগুণ সমতুল্য তাই ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনো ভেদই নাই।"

সামগ্র্যনুষ্ঠানগুণৈঃ সমগ্রাঃ
শূদ্রা যতঃ সন্তি সমা দ্বিজানাম্।
তস্মাদ্বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো
নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা॥ ৪১, ২৯

তার পর জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে যথার্থতঃ কোনো ভেদ নাই তাহা এক-এক করিয়া তীব্রভাবে দেখাইয়া চলিয়াছেন ভবিষ্যপুরাণ (৪১, ৩০, ৩৪)।

তস্মান্ন চ বিভেদোঽস্তি ন বহির্নাংতরাত্মনি।
ন সুখাদৌ ন চৈশ্বর্যে নাজ্ঞায়াং নাভয়েষ্বপি ॥ ৩৫
ন বীর্যে নাকৃতৌ নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চায়ুষি।
নাংগে পুষ্টে ন দৌর্বল্যে ন স্থৈর্য্যে নাপি চাপলে ॥ ৩৬
ন প্রজ্ঞায়াং ন বৈরাগ্যে ন ধর্মে ন পরাক্রমে।
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন রূপাদৌ ন ভেষজে ॥ ৩৭
ন স্ত্রীগর্ভে ন গমনে ন দেহমলসংপ্লবে।
নাস্থিরন্ধ্রে ন চ প্রেম্নি ন প্রমাণে ন লোমসু ॥ ৩৮। ৪১, ৩৫-৩৮

"তাই বাহিরে, অন্তরাত্মায়, সুখে, ঐশ্বর্যে, আজ্ঞায়, অভয়ে, বীর্যে, কৃতিত্বে, জ্ঞানদৃষ্টিতে, ব্যাপারে, আয়ুতে, অঙ্গপুষ্টিতে, দৌর্বল্যে, স্থৈর্যে, চপলতায়, প্রজ্ঞায়, বৈরাগ্যে, ধর্মে, পরাক্রমে, ত্রিবর্গে, নৈপুণ্যে, রূপাদিতে, ভেষজে, স্ত্রীগর্ভে, গমনে, দেহমলসংপ্লবে, অস্থিরন্ধ্রে, প্রেমে, প্রমাণে, লোমে কোথাও তো জাতিতে জাতিতে কোনোই ভেদ দেখা যায় না।"

তার পর পুরাণকার বলেন, "এমন কি দেবতারা একত্র হইয়া যদি অতি যত্নেও অন্বেষণ করেন তবু শূদ্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো ভেদ মিলিবে না।"

শূদ্রব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমাণোঽপি যত্নতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতৈ স্ত্রিদশৈরপি ॥ ৪১, ৩৯

"ব্রাহ্মণেরাও কিছু চন্দ্রমরীচিশুভ্র নহেন, ক্ষত্রিয়েরাও কিংশুকপুষ্পবর্ণ নহেন, বৈশ্যেরাও হরিতালের মতো হরিদ্রাবর্ণ নহেন, শূদ্রেরাও অঙ্গারসমানবর্ণ নহেন।"

ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুভ্রা
ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চেহ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ
শূদ্রা ন চাঙ্গারসমানবর্ণাঃ ॥ ৪১, ৪১

"পাদপ্রচারে, তনুতে, বর্ণে, কেশে, সুখে, দুঃখে, রক্তে, ত্বকে, মাংসে, মেদে, অস্থিতে, রসে সবাই তো সমান। তবে চারিবর্ণের ভেদ কোথায়?"

পাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ
সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্‌মাসমেদোঽস্থিরসৈঃ সমানা
শ্চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবন্তি ॥ ৪১, ৪২

"বর্ণে, প্রমাণে, আকৃতিতে, গর্ভবাসে, বাক্যে, বুদ্ধিতে, কর্মে, ইন্দ্রিয়ে, প্রাণে, শক্তিতে, ধর্মে, অর্থে, কামে, ব্যাধিতে, ঔষধে কোথাও জাতিগত বিশেষ ধর্ম নাই।"

বর্ণপ্রমাণাকৃতিগর্ভবাসবাগ্‌বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়জীবিতেষু।
বলত্রিবর্গাময়ভেষজেষু ন বিদ্যতে জাতিকৃতে বিশেষঃ॥ ৪১, ৪৩

"এক পিতারই যদি চারিটি সন্তান থাকে তবে সেই সন্তানদের একই জাতি। এইরূপ সকল প্রজার এক ভগবানই পিতা, এক পিতা হওয়ায় মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই।"

চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলু জাতি রেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব
পিত্রৈকভাবান্ ন চ জাতিভেদঃ॥ ৪১, ৪৫

"ডুমুর গাছের উর্ধ্বে মধ্যে অধোভাগে যেখানে যে ফল সবই ডুমুর। তবে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মার মুখে ব্রাহ্মণ, পদে শূদ্র উৎপন্ন, সে আবার কেমন কথা? সবারই তো সমান বর্ণ-আকৃতি-স্পর্শ-রসাদি।" ৪১, ৪৬

তাহার পর বজ্রসূচী উপনিষদের মত ভবিষ্যপুরাণও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিতে, দেহে, অবয়বে, কোথাও যে ভেদ নাই তাহা দেখাইয়াছেন (৪১, ৪৭-৫৭)

৪২তম অধ্যায়ে আরও ভয়ংকরভাবে জাতিভেদকে আক্রমণ করা হইয়াছে। তার পর পুরাণকার বলিতেছেন, "জাতি-জাতি যে কর, তবে ঋষি-মুনিদের উৎপত্তিগুলি বিচার করা যাউক। কৈবর্তীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম, চণ্ডালকন্যার গর্ভে পরাশর, শুকীর গর্ভে শুক, উলূকীর গর্ভে কণাদের জন্ম, মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ, গণিকার গর্ভে বসিষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিকার সন্তান, মণ্ডূকীর গর্ভে মুনিরাজ মাণ্ডব্য। এই ভাবেই তো অনেকে বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন।"

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাসরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যস্তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজোঽর্ষ্যশৃঙ্গোঽপি বসিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মংদপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মংডূকীগর্ভসংভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্বমদ্বিজাঃ॥ ২৪। ৪২, ২২-২৪

ইঁহারা সকলেই জাতির দ্বারা নহে, তপস্যার বলে সংস্কারের দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন (৪২, ২৬-৩০)। ৪৩তম এবং ৪৪তম অধ্যায়েও এই জাতি সম্বন্ধেই বিচার চলিয়াছে। তাহাতে ভবিষ্যপুরাণ দেখাইয়াছেন জন্মের দ্বারা নহে, চরিত্রে আচারে ও তপস্যাতেই যথার্থ উচ্চতা বা নীচতা। বাহ্যবিধির উপর

প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ নিতান্তই ভৌতিক ও মিথ্যা। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে ভবিষ্য-পুরাণের এই কয়টি অধ্যায় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

এই রকম কথা আরও নানা গ্রন্থে নানা ভাষাতে পাওয়া যায়। এই দুই-একটা নমুনাই যথেষ্ট। ইহাতেই বুঝা যায় তখনকার দিনেও এইসব বিষয়ে মানুষের মন সচেতন ছিল। লোকে শুধু ব্রাহ্মণকে দোষই দেয় কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রতম আক্রমণ দেখি যে-সব শাস্ত্রে ও পুরাণে তাহা প্রায় ব্রাহ্মণেরই লেখা।

প্রাচীন যুগে বীরশৈবমতস্থাপয়িতা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধঘোষণা করেন সেই আচার্য বসব নিজেই ব্রাহ্মণবংশীয়। এই যুগেও ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রামমোহন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রত্যক্ষত জাতিভেদকে আঘাত না করিলেও ক্রমশ তাঁহাদের সাধনা জাতিভেদের বিরোধী হইয়া উঠিল। আর্যসমাজপ্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত জ্ঞান ও গুণ অনুসারে। মধ্যযুগে রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ, ভক্ত-সাধক ঢেঢরাজ ছিলেন ব্রাহ্মণ। উভয়েই জাতিভেদকে কঠোরভাবে আঘাত করেন। হয়তো বজ্রসূচীপ্রণেতাও ব্রাহ্মণ। মহাত্মা তুলসী হাথরসী প্রভৃতি আরও বহু ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু আছেন যাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন। এখনও এই সব সমাজসংস্কারের কাজে যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই উচ্চবর্ণের লোক। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা এই বিষয়ে প্রতিকূলতা পাইয়াছেন নিম্নবর্ণের লোকেরই কাছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।

সমাজসংস্কারের সকল ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণকে অগ্রগামী দেখা যায়। এই যুগে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ। যিনি প্রথম বিধবা কন্যার বিবাহ দেন ও যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। বেথুন কলেজের প্রবর্তকগণ প্রধানত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের কন্যাকে সেখানে প্রথমে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

পরবর্তীকালের অনুদারতা

ক্রমে এইদেশে চারিদিকের প্রভাববশত প্রাচীন আর্যদিগের সেই সব উদার বিচারবুদ্ধি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন পূর্ব পূর্ব যুগে এইসব বিধি চলিলেও কলিকালে ইহা চলিবে না। নির্ণয়সিন্ধু তাই বৃহন্নারদীয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—সমুদ্রযাত্রা সন্ন্যাসগ্রহণ দ্বিজগণের অসবর্ণাকন্যাবিবাহ কলিতে আর চলিবে না।

> সমুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
> দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপয়মস্তথা॥ তৃতীয় পূর্বার্ধ, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ. ১২৮৭

যতিগণের পক্ষে বিধানানুসারে সকল জাতির অন্নগ্রহণ ও ব্রাহ্মণদের গৃহে শূদ্র পাচক থাকাও কলিকালে নিষিদ্ধ হইল।

> যতেশ্চ সর্ববর্ণেষু ভিক্ষাচর্যাবিধানতঃ...
> ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপিচ। তৃতীয় পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩০০

বৈদ্যনাথের বর্ণাশ্রমকাণ্ডেও দেখা যায় দ্বিজগণ সকল দ্বিজেরই অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। সকল জাতির গৃহেও অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারী প্রয়োজন হইলে সর্বজাতির গৃহেই ভিক্ষাচরণ করিতে পারেন। তবে, ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্রপাচক কলিযুগে আর চলিতে পারে না।[১]

"কলিযুগে চলিবে না" এই কথার দ্বারাই বুঝা যায় পূর্বযুগে ইহা চলিত। ইহা বন্ধ করিবার জন্য বহু শাস্ত্রের বহু দোহাই তাঁহাদের দিতে হইয়াছে। এখন তাহা এমনই অপ্রচলিত হইয়াছে যে শত শাস্ত্র বা যুক্তিতে আর তাহার নড়চড় হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরাশরস্মৃতিতেও দেখি কলিতে এইসব বর্জনীয়:

দ্বিজাতিগণের অসবর্ণা বিবাহ,

> কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

শূদ্র ভৃত্যের হস্তে ব্রাহ্মণাদির অন্নগ্রহণ,

> শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিণাম্।
> ভোজ্যান্নতা...

যতিদের পক্ষে সর্ববর্ণের অন্নগ্রহণ,

> যতেস্তু সর্ববর্ণেভ্যো ভিক্ষাচর্যা বিধানতঃ।

১ R. Shama Shastri, *Evolution of Castes*, p. 7.

পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদির গৃহে যে শূদ্র পাচক থাকিত ক্রমে পরবর্তীকালে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপি চ। [১]

বীরমিত্রোদয়ে দেখা যায়—ব্রহ্মচারী দ্বিজগণের গৃহে বা সকল বর্ণের গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন। ভবিষ্যপুরাণ উদ্ধৃত করিয়া বীরমিত্রোদয় বলেন [২] প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মচারী চারিবর্ণের কাছেই অন্নগ্রহণ করিতেন। কাহারও কাহারও মতে দেখা যায় শূদ্রান্ন ভাল নহে তবে আপৎকালে যদি শূদ্রান্ন খাইতে হয় তাহা হইলে মনস্তাপের দ্বারা শুদ্ধি ঘটে।[৩]

অধ্যাপক ঘুরে[৪] দেখাইয়াছেন যে ক্রমে পরবর্তীকালে জাতিভেদের তীব্রতা এতদূর উগ্র হইয়া উঠিল যে মাধবের মতে শূদ্রের সঙ্গে এক গৃহে বাস বা এক যানে গমন করা পর্যন্ত অবৈধ হইল। শূদ্রের অন্ন অভক্ষ্য হইল। তাঁহার মতে অন্ন যদি ঘৃতে তৈলে বা দুগ্ধে পাক করা হয় তবে নদীতীরে বসিয়া তাহা খাওয়া যায়। পরাশরের মতের উপরই তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চতুর্বর্গচিন্তামণিকার হেমাদ্রি বলিলেন যে শূদ্রের দত্ত বস্তু যদি ব্রাহ্মণ নিজেও পাক করেন তবে তাহাও শূদ্রগৃহে বসিয়া খাইলে পাতক হয়। শূদ্রান্ন যে নিষিদ্ধ তাহা দেখাইতে গিয়া কমলাকর পুরাতন বহু শাস্ত্রবাক্যের অপব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৫]

দক্ষিণ-দেশে ক্রমে এমন হইল যে পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রে লোক দৌড়াইয়া হীনজাতীয় লোককে অপসারিত করিয়া দেয়। লোকেরা ব্রাহ্মণ দেখিলে যানবাহনাদি হইতে নামিতে বাধ্য। অন্তরজন্মাজাতির যদি কোনো কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে মারা যায় তবে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া বিবাহসূত্রে গলায় বাঁধাইলে তবে তাহার দাহ হইতে পারে। শূদ্রের গৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ পথের ধারে এক সারিতে নির্মিত হইতে পারে না। কূর্মপৃষ্ঠবৎ রচিত কাঠের পিঁড়াতে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ বসিলে পূর্বে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। ক্ষত্রিয়কন্যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেরাই

১ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, পরাশর মাধব, ১ম অধ্যায়, আচারকাণ্ড, পৃ. ১২৩-২৫
এবং নির্ণয়সিন্ধু, পৃ. ১২৯৪-১৩০০

২ সংস্কার প্রকাশ, ভৈক্ষচর্যাবিধি

৩ আপস্তম্ব স্মৃতি আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী, নং ৪৮, পৃ. ৮, ২০

৪ *Caste and Race in India*, p. 93

৫ *Ibid.*

সহবাস করিতে পারেন। তাঁহাদের হাতের অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে দূষণীয় নহে।[১] ব্রাহ্মণী ছাড়া অন্য জাতির নারীরা নাভির উপরের অঙ্গ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারেন না।[২]

শবসংকারের বিষয় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন[৩] পূর্বে সূত্রযুগে পদ্ধতি ছিল ব্রাহ্মণাদি জাতির লোকের মৃতদেহ বৃদ্ধ দাসেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত।

অথৈনমেতয়া আসন্দ্যা সহ তত্তল্পেন কটেন বা সংবেষ্ট্য দাসাঃ প্রবয়সো বহেয়ুঃ

অর্থাৎ বৃদ্ধ দাসেরা মাদুরে জড়াইয়া খাটে করিয়া মৃতদেহ বহন করিবে।

মনুর সময়ে দেখা যায় এই ব্যবস্থা আর চলে না। তখন ব্রাহ্মণাদির দেহ শূদ্রে স্পর্শ করিবে ইহা কেহ আর পছন্দ করিতেন না।

মনু বলিলেন :

> ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
> অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা॥ —৫, ১০৪

স্বজাতি বর্তমান থাকিতে শূদ্রের দ্বারা দ্বিজাতিগণের শব বহন করাইতে নাই। মৃতদেহ শূদ্রসংস্পর্শে দূষিত হইলে উহা মৃতাত্মার স্বর্গবিরোধী হয় (অনুবাদ, বঙ্গবাসী)।

বিষ্ণু বলেন :

> মৃতং দ্বিজং ন শূদ্রেণ ন চ শূদ্রং দ্বিজাতিনা···

মৃত দ্বিজকে শূদ্রের দ্বারা বা মৃত শূদ্রকে দ্বিজাদির দ্বারা বহন করাইবে না।

যম বলিলেন, শূদ্রের অগ্নিতে বা শূদ্রবাহিত তৃণকাষ্ঠঘৃতাদিতে দ্বিজগণের মৃতদেহ দাহ করা চলিবে না

> যস্ত্বানয়তি শূদ্রাগ্নিং তৃণ কাষ্ঠ হবীংষি চ···

বৃহন্মনু বলেন, দ্বিজগৃহে যদি কুকুর শূদ্র বা অন্ত্যজ মারা যায় তাহাতেও অশুচিত্ব ঘটে

> শ্বশূদ্রপতিতশ্চান্ত্যা মৃতশ্চেদ্ দ্বিজমন্দিরে।
> শৌচং তত্র প্রবক্ষ্যামি মনুনা ভাষিতং যথা॥[৪]

এখন প্রশ্ন এই যে পূর্বকালে তো এত বাঁধাবাঁধি দেখা যায় না। দেখা

১ J. Wilson, *What Castes are*, Vol. II, pp. 76, 77

২ *Ibid*, p. 79

৩ *Indo-Aryans*, Vol. II, p. 130

৪ *Ibid*, p. 131

যাইতেছে কলির পূর্বে অসবর্ণ বিবাহ চলিত ছিল এবং শূদ্রের হাতে দ্বিজাতিরা খাইতেন, কলিতে ইহা তবে নিষিদ্ধ হইল কেন? শামশাস্ত্রী বলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বৈরাগ্য-প্রধান মতবাদ ও কৃচ্ছ্রাচারই তাহার কারণ।[১] জৈন ও বৌদ্ধদের সমালোচনার ভয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা জীবহিংসা ছাড়িলেন, শূদ্রেরা ছাড়িলেন না। কাজেই একের হাতে অন্যের খাওয়া আর চলিল না।[২] রাজা রাজেন্দ্রলালও বলেন বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের অনুরোধে হিন্দুরা গোমাংস ছাড়িয়াছিলেন।[৩]

এখানে একটা কথা মনে আসে। বৌদ্ধ যুগে বর্ণাশ্রম এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক ওলটপালট ঘটে। সেই রকমের অবস্থা প্রায় হাজার দেড় হাজার বৎসর থাকে। তাহার পরে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম আবার স্থাপিত হইল তখন কি করিয়া ঠিক ঠিক চতুর্বর্ণ ভাগ হইল? যদি কেহ বলেন পরবর্তী বর্ণাশ্রমীরা সকলে আগেকার দিনের বর্ণাশ্রমীদেরই সন্তান, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ণাশ্রমবিদ্রোহী বৌদ্ধরা সবাই নির্বংশ হইল এবং বর্ণাশ্রমীরাই সর্বব্যাপী হইয়া গেল—সে-ই বা কেমন? বাংলাদেশেও পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বে সাত শত ঘর বা দল ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় তখন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বাংলায়। অথচ এখন সপ্তশতী খুব কমই দেখা যায়, নাই বলিলেই হয়। সব ব্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাহ্মণেরই সন্তান। ইহাই বা কিরূপ কথা? সপ্তশতীরা তবে গেলেন কোথায়?

কেহ কেহ মনে করেন উপনিষদের যুগেই ক্ষত্রিয়দের ধর্মমত যাগযজ্ঞ হইতে হইতে ক্রমে একটু সরিতে থাকে। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির সময় সেই ক্ষত্রিয়মত আরও স্বাধীন হয়। হয়তো এইসব মতামতের পার্থক্য হইতেই পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের বিরোধের উৎপত্তি।

কেহ কেহ মনে করেন বেদবিদ্যা হইতে ক্ষত্রিয়দের যে সরাইয়া দেওয়া হইল তাহাতেই ক্ষত্রিয়েরা জৈন ও বৌদ্ধাদি মত প্রবর্তিত করেন।[৪]

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস খোঁজ করিলে দেখা যায় তখন জাতিভেদ প্রথাটা এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের ভেদবিভেদগুলি এতটা সুনির্দিষ্ট হয় নাই।[৫]

১ *Evolution of Castes*, p. 9

২ *Ibid*, p. 11

৩ *Indo-Aryans*, Vol. II, p. 388

৪ *Caste and Race in India*, p. 64

৫ *Secred Book of Budhists*, Vol. II, p. 101

আভিজাত্য বিষয়ে দেখা যায় বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উন্নত ও তাই তাঁহাদের সামাজিক অনুশাসনও বেশি কড়া। রাজা ওক্‌কাক নিজের সুয়োরানীর সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বড় রানীর সন্তানদের নির্বাসিত করেন। তাঁহারা হিমালয়ের পাশে এক শাকবৃক্ষের নিকটে হ্রদের তীরে গিয়া বাস করেন। পাছে তাঁহাদের বংশে হীন রক্তের আমদানি হয় তাই তাঁহারা ভাইয়ে ভগ্নীতে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন তবু হীন জাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিলেন না (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১৬)।

ব্রাহ্মণ পোক্করসাদীর শিষ্য ব্রাহ্মণ অম্বট্‌ঠ বুদ্ধের কাছে আসিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের কিছু বেশি বড়াই করেন (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১০-১৫)। তখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি কোনো ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্ষত্রিয় বিবাহ করে তবে কি ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবে ?" অম্বট্‌ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়ই করিবে।" বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিলেন, "ক্ষত্রিয়েরা কি তাহাকে স্বীকার করিবে ?" অম্বট্‌ঠ বলিলেন, "না, কারণ ক্ষত্রিয়েরা বলিবেন, তাঁহার মাতৃকুল হীন—অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাহ্মণ মাত্র" (ঐ, ২৪-২৫)। অম্বট্‌ঠ ইহাও স্বীকার করিলেন যে ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণকে স্বীকার করে না কিন্তু জাতিচ্যুত ক্ষত্রিয়কে স্বীকার করে (ঐ, ২৬)। কাজেই ক্ষত্রিয়েরাই আভিজাত্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ঐ, ২৭)। সনৎকুমার বলেন যাঁহারা গোত্রবিশুদ্ধি দেখেন তাঁহাদের পক্ষে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। আসলে যিনি বিদ্যায় ও আচরণে শ্রেষ্ঠ তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঐ, ২৮)।

মহাভারতেও সনৎকুমারের একটি ব্যাখ্যায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্র হইলেই মহাশক্তি (বনপর্ব, ১৮৫, ২৫) রাজাই ধর্ম রাজাই ইন্দ্র রাজাই বিধাতা (ঐ, ২৬)। শাস্ত্র প্রমাণ সব আলোচনা করিয়া দেখা যায় রাজাই জগতে শ্রেষ্ঠ (ঐ, ৩১)।

বুদ্ধের কাছে আচার্য সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের পঞ্চ লক্ষণ বলিয়াছেন, (১) জন্মের বিশুদ্ধি, (২) সর্ববিদ্যায় (মন্ত্র, সনিঘণ্টু বেদত্রয়, কর্মানুষ্ঠান, সাক্ষর প্রভেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, লোকায়ত, মহাপুরুষলক্ষণ ইত্যাদি শাস্ত্রে) পারগতা, (৩) দেহের শক্তি প্রমাণ ও সৌন্দর্য, (৪) শীল ও সদাচার, (৫) এবং পাণ্ডিত্য (সোণদণ্ড সুত্ত, ১৩ ও ২০)।

বরং দেখিতে পাই (কন্‌হবংশীয়) কন্‌হায়ণ বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিয়াছিলেন যে অম্বট্‌ঠ এবং সকল ব্রাহ্মণ যাঁহার সমর্থন করিতেছিলেন (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১৭) সেই অম্বট্‌ঠের পূর্বপুরুষ কন্‌হ ছিলেন শাক্যবংশের একজন দাসীর পুত্র (ঐ, ১৬)। রাজা ওক্‌কাকের দিসা নামে এক দাসী ছিলেন। কন্‌হ হইলেন তাঁহার পুত্র (ঐ)।

বুদ্ধদেব এই বার্তাটুকু ব্যক্ত করিলে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "অম্বট্‌ঠকে এমন করিয়া দাসীপুত্র বলিয়া অপমান করিবেন না। অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, কল্যাণ-বাক্‌করণ, পণ্ডিত ও প্রশ্নের সদুত্তরদাতা (ঐ, ১৭)।

বুদ্ধদেব তখন অম্বট্‌ঠকেই জিজ্ঞাসা করিলেন এই সব কথা সত্য কিনা, অম্বট্‌ঠ চুপ করিয়া রহিলেন (ঐ, ১৬-২০) অবশেষে সকলের পীড়াপীড়িতে অম্বট্‌ঠ এই কথা যে সত্য তাহা স্বীকার করিলেন (ঐ, ২০)। তখন ব্রাহ্মণেরা গোলমাল করিলে বুদ্ধই বরং বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি? কান্‌হ দক্ষিণ দেশে গিয়া সর্ববিদ্যাতে এবং সর্বসাধনাতে প্রবীণ হইলেন এবং রাজা ওক্‌কাকের কন্যা মদ্দরূপীকে বিবাহ করিলেন। কন্‌হ একজন মহা ঋষি হইয়াছিলেন, কাজেই দাসীপুত্রের বংশে জন্ম বলিয়া অম্বট্‌ঠের উপর আপনাদের বিরূপ হইবার কোনো হেতুই নাই (ঐ, ২২-২৩)।

যদিও অম্বট্‌ঠের দাম্ভিকতা দেখিয়া বুদ্ধদেব তখনকার কালে ক্ষত্রিয়দের যে প্রবল আভিজাত্যগর্ব ছিল তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কৌলীন্য যে তখন বেশি ছিল তাহা দেখাইয়া দিলেন তবু এই সব বিষয়ে বুদ্ধদেবের মত অতিশয় উদার ছিল। সুত্তনিপাতের আমগন্ধ সুত্ত অতি প্রাচীন শাস্ত্র। তাহাতে দেখা যায় বিশেষ বস্তু খাওয়ায় বা বিশেষ বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির হাতে খাওয়ায় মানুষের অশুচিত্ব ঘটে না। অশুচিত্ব ঘটে অসৎ কর্মে, অসৎ বাক্যে, অসৎ চিন্তায়।[১]

সুত্তনিপাতের বা সেই সুত্তে প্রশ্ন উঠিল কিসে ব্রাহ্মণ হয়। বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সরীসৃপ বা মৎস্যাদির মধ্যে নানা জাতির নানা বাহ্যলক্ষণ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এইরূপ কোনো লক্ষণগত বৈশিষ্ট্য নাই, কাজেই জাতির কোনো ভেদ নাই।[২] বুদ্ধদেব একেবারে বৈজ্ঞানিকদেরই মত বলিলেন, "সকল মানুষই এক-জাতি, বর্ণ বা অন্য কোনো উপাধির দ্বারা তাহাদের মধ্যে ভেদবিভেদ হওয়া সম্ভব নহে।[৩]

তাহার পর বজ্রসূচী, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বসব, কবীর প্রভৃতি সবাই সেই এক কথাই বলিলেন। কবীরের মতে

> গুপ্ত প্রকট হৈ এেকৈ মুদ্রা।
> কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্রা॥

১ *Sacred Book of Budhists,* Vol, II, pp. 103-4

২ *Ibid,* p. 104

৩ *Ibid*

"গুপ্ত প্রকট সবারই এক চিহ্ন। তবে কাকে বলিবে ব্রাহ্মণ, কাকে বলিবে শূদ্র ?"

জৈনধর্মপ্রবর্তক মহাবীরেরও জন্ম কুলীন ক্ষত্রিয়কুলে। তিনি সোরাগকুল-সংভূত (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ১২, ১)। জৈন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাণিয়াদের বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা পল্লীর উল্লেখ দেখা যায়।[১] উড়িষ্যায় ক্ষত্রিয়প্রাধান্য ছিল। মহাবীরের পিতার ক্ষত্রিয় বন্ধু উড়িষ্যায় থাকাতে মহাবীর সেখানে যান, ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কথা।[২]

ক্ষত্রিয়ের দ্বারা জৈনধর্ম প্রবর্তিত হওয়ায় প্রথমে জৈনধর্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল না। যদিও জাতির গৌরব যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। নন্দবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা দাসী মুরার সন্তান। কিন্তু পরে তাঁহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির দাবি করিয়াছেন।[৩] জৈনদের মধ্যে বহু বহু ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি মহা মহা পণ্ডিত জন্মিয়াছেন। তথাপি ভারতের ভূমির গুণে ইঁহাদের মধ্যেও ক্রমে জাতিভেদ এখন আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

কোশলরাজের দ্বারা বিতাড়িত শাক্যবংশীয়দের কেহ কেহ হিমালয়ের ময়ূরবহুল বিভাগে বাস করাতে তাহাদের নাম মৌর্য হইয়াছে। কোনো কোনো পালিগ্রন্থে এইরূপ মত পাওয়া যায়।

বৌদ্ধজাতকে দেখা যায় ক্ষত্রিয়েরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের স্থান তাহার নিচে। বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও ক্রমে উন্নত হইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। যে-কোনো বর্ণের লোক পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধে জাতির গণ্ডী লইয়া মারামারি নাই। ক্ষত্রিয়-বিধবাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতেছেন ইহা দেখা যায়। ক্ষত্রিয়বংশজাত হইলেও বুদ্ধ এক দরিদ্র চাষার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জাতির বাহিরেও বিবাহ চলে তবে জাতির মধ্যে বিবাহ হইলেই ভাল। উচ্চবর্ণের লোকদের নিচে তাঁতি নাপিত কুম্ভকারদের স্থান, চণ্ডাল ও অন্ত্যজদের স্থান সবার নিচে।[৪]

মনুর সময় হইতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতাই অবিসংবাদিত হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষত্রিয়েরা পিছাইয়া গেলেন এবং ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। হয়তো

১ N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, p. 107 and C. T. Shah, *Jainism in Northern India*, p. 103

২ *Ibid*, p. 178

৩ *Ibid*, p. 132

৪ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. I, p. 131

ইতিহাসগত কারণও ইহার জন্য দায়ী। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত যে যুগ তাহাতে বহু জাতি বাহির হইতে ভারতকে আক্রমণ করে। তাহাতে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়েরা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যান। বৌদ্ধধর্ম ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত। বহু শতাব্দী তাহা প্রধান ছিল, পরে তাহা ব্রাহ্মণশাসিত ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণবল হইয়া আসিল। রাজা হর্ষের পর ক্ষত্রিয়দের যে প্রাধান্য ছিল তাহা গেল ব্রাহ্মণদের হাতে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা কথা আছে। নানাভাবেই ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য ভারতে লুপ্ত হইল। [১]

তথাপি দেখা যায় মেগাস্থিনিসের সময়েও ভারতে অস্পৃশ্যতাদোষ ছিল না। হয়তো তাহা কতকটা বৌদ্ধপ্রভাব বলিয়াও হইতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেগাস্থিনিসের যুগ পর্যন্ত কোনো সময়েই অস্পৃশ্যতাদোষ ভারতে দেখা দেয় নাই। [২]

১ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. 1, p. 134

২ *Dayananda commemoration Volome*, 1933, p. 187

৯

ভারতে নানা সংস্কৃতির যোগ

নানা কারণে মনে হয় যে জাতিভেদ জিনিসটা আর্যরা ভারতবর্ষে আসিয়া চারিদিকের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এত বড় একটা জিনিস বাহির হইতে গৃহীত এই কথা মনে করিতেও কেমন একটা সংকোচ মনে উপস্থিত হয়। তবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বর্তমান হিন্দুধর্মে বাহির হইতে আগত মতামত ও আচারব্যবহারের পরিমাণ কম নহে। শুধু যে সামাজিক ব্যবস্থাতেই আর্যরা চারিদিকের অপরিহার্য প্রভাবকে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নহে।

তাঁহাদের যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে অতি পরিপাটি সুনির্দিষ্ট সব সুব্যবস্থা পূর্বমীমাংসাদি শাস্ত্রে দেখা যায়। তাহার আরম্ভ হইয়াছে সংহিতায় ও সূত্রযুগে। ধর্মবিষয়ে চারিদিকের প্রভাব এতদূর কাজ করিয়াছে যে এখন আর্যদের মধ্যে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। শৈব বৈষ্ণব তান্ত্রিক মতের মধ্যে বৈদিক মত এখন ডুবিয়া গিয়াছে। পুরাণগুলি দেখিলেই বুঝা যায় শিব বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা কত রকমের বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া একসময়ে ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল অথচ এখন তাহার প্রভাব কতদূর গভীর।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা বন্ধ করিয়া বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তি স্থাপন করিতে চাহেন। কত তর্ক বাদ-প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহা বুঝা যায় মূল ভাগবতের ঐ স্থানগুলি পড়িয়া দেখিলে।

অনেকে মনে করেন বেদের 'শিশ্নদেব' (ঋগ্বেদ, ৭, ২১, ৫ ; ১০, ৯৯, ৩) কথার মধ্যে আর্যেতর জাতির লিঙ্গদেবতাপূজা সূচিত। আর্যরা তাহা পছন্দ করেন নাই, কেহ কেহ শিশ্নদেব অর্থে মনে করেন চরিত্রহীন। পুরাণের পর পুরাণে দেখা যায় মুনিঋষিরা শিবপূজা ও লিঙ্গপূজা ভারতীয় আর্যদের সমাজে চালাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

মহাদেব নগ্ন নবীন তাপস বেশে মুনিদের তপোবনে আসিলেন (বামন পুরাণ, ৪৩ অধ্যায়, ৫১-৬২ শ্লোক), মুনিপত্নীগণ তাহা দেখিয়া কামমোহিত হইয়া শিবকে ঘিরিয়া ধরিলেন (ঐ, ৬৩-৬৯ শ্লোক)। মুনিরা আশ্রমে স্বীয় পত্নীদের এইরূপ অভব্য কামাতুরতা দেখিয়া, "মার মার" করিয়া কাঠ পাষাণ লইয়া উঠিলেন।

ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমে তু স্বযোষিতাম্।
হন্যতামিতি সম্ভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ॥—ঐ, ৭০

এই বলিয়া তাঁহারা শিবের ভীষণ উর্দ্ধ লিঙ্গ নিপাতিত করিলেন।

পাতয়ন্তি স্ম দেবস্য লিঙ্গমূর্দ্ধং বিভীষণম্ ॥—ঐ, ৭১

পরে মুনিদের মনেও ভয় হইল, ব্রহ্মা প্রভৃতিরাও মুনিদের বুঝাইলেন, অবশেষে মুনিপত্নীদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত শিবপূজা প্রবর্তিত হইল (বামন পুরাণ, ৪৩, ৪৪ অধ্যায়)।

এই রকমের কাহিনী সবগুলি পুরাণে। এখানে বাহুল্যভয়ে সবগুলি লিখিতে ইচ্ছা করি না, দেখিতে হইলে দেখিবেন।

কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৩৭ অধ্যায়ে আছে পুরুষবেশধারী শিব নারীবেশধারী বিষ্ণুকে লইয়া সহস্রমুনিগণসেবিত দেবদারুবনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মুনিপত্নীগণ কামার্তা হইয়া নির্লজ্জ আচরণ করিতে লাগিলেন (১৩-১৭ শ্লোক)। মুনিপুত্ররাও নারীরূপ বিষ্ণুকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। মুনিগণ রোষে শিবকে অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য ও নানাবিধ অভিশাপ দিলেন।

অতীব পরুষং বাক্যং প্রোচুর্দেবং কপর্দ্দিনম্।
শেপুশ্চ শাপৈ র্বিবিধৈর্মায়য়া তস্য মোহিতাঃ ॥—৩৭, ২২

অরুন্ধতী কিন্তু শিবের অর্চনা করিলেন (৩৭, ৩৪-৩৬) ঋষিগণ শিবকে যষ্টিমুষ্টি প্রহার করিতে করিতে (৩৭, ৩৯) বলিলেন, "তুই এই লিঙ্গ উৎপাটন কর্ (৩৭, ৪০)। মহাদেব তাহাই করিলেন (৩৭, ৪২), কিন্তু পরে দেখি এই মুনিরাই মহাদেবকে ও তাঁহার লিঙ্গকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

শিবপুরাণে ধর্মসংহিতায় দশম অধ্যায়ে দেখা যায় শিবই আদিদেবতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁহার লিঙ্গের মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া হার মানিলেন (শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১০, ১৬-২১)

মানবজাতির ধর্মমতের ইতিহাস খুঁজিতে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারাও এই লিঙ্গ পূজার আদি অন্ত কোথায় তাহা আজও ঠাওর করিতে পারেন নাই। সকল দেশে সকল জাতিতে নানা আকারে এই মতের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং নানা আকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া এই মত এখনও জগতের বহু ধর্মের মধ্যেই চলিতেছে।

শিবপুরাণে দেখা যায় দেবদারু বনে সুরতপ্রিয় শিব বিহার করিতে লাগিলেন (ধর্মসংহিতা, ১০, ৭৮-৭৯) কামমোহিত মুনিপত্নীগণ অতি অশ্লীলভাবে তাঁহার কাছে কামরতি প্রার্থনা করিলেন (১১২-১২৮)। জরাগ্রস্ত অস্থিস্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ পতিতে তাঁহাদের আস্থা ছিল না (১২৮)। ঐ সব ব্রাহ্মণ

পতিগণ শুধু পড়াইতেই জানেন ও ক্ষুধাপিপাসা সহিয়া তপস্যা করিতে পারেন (১৩১)। বৈদিক যজ্ঞ অপেক্ষা মুনিপত্নীগণ কামরতিকেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ মনে করিলেন (১৩৩) ইত্যাদি। কামচারী শিবও ঘরে ঘরে গিয়া মুনিপত্নীদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন (১৫৮)। মুনিরা তখন ব্যস্ত কামোন্মত্ত নিজ নিজ পত্নীদের সামলাইতে (১৫৯-১৬০)। পত্নীরা সেই নিষেধ মানিতে নারাজ (১৬১)। মুনিরা অগত্যা দণ্ডপাষাণাদির দ্বারা শিবকেই প্রহার করিতে লাগিলেন (১৬২-১৬৩)।

অন্য সব মুনিপত্নীই শিবকে গ্রহণ করিলেন কামার্তা হইয়া, শুধু অরুন্ধতী শিবকে অর্চনা করিলেন বাৎসল্যের ভাবে (১৭৮)।

ভৃগুর শাপে শিবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইল (১৮৭)। বৃথাই ধর্ম নীতি ও সদাচার প্রভৃতির দোহাই ভৃগু পাড়িলেন (১৮৮-১৯২)। ক্রমে কিন্তু মুনিগণ সেই লিঙ্গই পূজা করিতে বাধ্য হইলেন (২০৩-২০৭)।

স্কন্দপুরাণেও আছে (মাহেশ্বর খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়) শিব নগ্ন হইয়া গেলেন দেবদারু-বনে বিহার করিতে। ঋষিপত্নীরা তাঁহার নগ্নমূর্তি দেখিয়া কামার্তা হইয়া গৃহকার্য্য ছাড়িয়া গেলেন তাঁহার পিছে পিছে (১৮-১৯)। ঋষিরা আশ্রমে আসিয়া দেখেন আশ্রম শূন্য, পত্নীরা কেহই নাই (২০)। ঋষিগণ শিবকে পরদারহর্তা বলিয়া তিরস্কার করিলেন (২৪)। তাঁহাদের শাপে শিবের লিঙ্গ ভূপতিত হইল (২৫)। সেই লিঙ্গ বিশ্বব্যাপ্ত হইল (২৬-২৯)। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহার অন্ত পাইলেন না (৩৪-৩৫)। অবশেষে সেই সব মুনিঋষিরাই শিবের পূজাতে প্রবৃত্ত হইলেন (৬৮)।

লিঙ্গপুরাণেও এই একই কথা (পূর্বভাগ, ১৭ অধ্যায়, ৩৩-৫০)।

বায়ুপুরাণেও আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রথমে শিবকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁহার অন্ত পান নাই (৫৫ তম অধ্যায়, ২৪-২৬)। শিবের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া অবশেষে দেবতারা তাঁহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডে শিবের কথা বলা হইয়াছে। নাগরখণ্ডের প্রথমেও সেই শিবেরই কথা। আনর্তদেশে মুনিজনাশ্রয় এক বন ছিল (১ম অধ্যায়, ৫)। ভগবান রুদ্র সেখানে নগ্নবেশে প্রবেশ করিলে (১২) তপস্বিনীরা সকলেই কামার্তা হইলেন (১৩)। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিল (১৪-১৭)। মুনিরা এই সব দেখিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "রে পাপ, যেহেতু তুমি আমাদের আশ্রমকে এমন বিড়ম্বিত করিয়াছ অতএব তোমার লিঙ্গ এখনই ভূপতিত হউক।"

যস্মাৎ পাপ ত্বয়াস্মাকম্ আশ্রমোঽয়ং বিড়ম্বিতঃ।
তস্মাল্লিঙ্গং পতত্যাশু তবৈব বসুধাতলে॥
—স্কন্দপুরাণ, নাগর খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ২০

এই শাপে লিঙ্গ পতিত হইল (২১)। তাহাতে জগতে নানা উৎপাত উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল (২৩-২৪)। দেবতারা ভয় পাইলেন। ক্রমে সকলে শিবপূজা স্বীকার করিলেন।

পুরাণাদিতে এইরূপ আখ্যান আরও বহু বহু স্থানে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত হইল না। দক্ষযজ্ঞে যে শিবের সঙ্গে দক্ষের বিরোধ, তাহা আর্য-বেদাচারের সঙ্গে আর্যেতর শিবোপাসনা প্রভৃতির বিরোধ। দক্ষের যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত হইলেন না। শিবহীন যজ্ঞ ভূতপ্রেতপ্রমথদের দ্বারা বিড়ম্বিত হইল। ইহাতেই বুঝা যায়, শিব ঐ সব অনার্যদের দেবতা। শিব কিরাতবেশী, শিবানী শবরীমূর্তি, শিব শবর-পূজিত, এইসব কথা নানা পুরাণেই পাই।

মুনিপত্নীদের লিঙ্গপূজাতে উৎসাহের হেতু পুরাণে বলা হইয়াছে শুধু কামুকতা। হয়তো তখনকার দিনে মুনিপত্নীরা অনেকেই ছিলেন শূদ্রকন্যা। তাই তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃকুলের প্রচলিত দেবতার প্রতি অনুরাগ পতিকুলে আসিয়াও ছাড়িতে পারেন নাই। এই কথাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলিলে মুনিপত্নীগণকে বৃথা এতটা হীন করার প্রয়োজন হইত না।

বৈদিক কালে শিব নামে এক জনপদবাসী মানুষের খবর পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ, ৭, ১৮, ৭)। পুরাণের শিব দেবতার সঙ্গে কি ইহাদের কোনো যোগ ছিল? অনার্য অনেক দেবতাকে আর্যেরা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। চারিদিকের প্রভাবকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব। তাহার পরে গণচিত্তকে প্রসন্ন না করিলে মানুষকে যে অতিষ্ঠ হইতে হয় এই কথা প্রাচীন আর্যেরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই গণদেবতা গণপতির পূজা সকল যজ্ঞের অগ্রে অনুষ্ঠান করা হইত।

এখন আমরা গণদেবতা বলিতে শুধু গণেশকেই বুঝি। কিন্তু মহাদেবও গণেরই দেবতা। গণদেবতা অর্থাৎ সাধারণ লোকপূজ্য দেবতা। মহাদেবেরই এক নাম গণেশ (বনপর্ব, ৩৯, ৭৯), তিনিই গণানাং পতিঃ (দ্রোণপর্ব, ২০১, ৪৮), তিনিই গণাধ্যক্ষ গণাধিপ (সৌপ্তিকপর্ব, ৭, ৮; শান্তিপর্ব, ২৮৪, ৭৬)। বিষ্ণুও গণদেবতা তাই তাঁহার নাম গণেশ্বর লোকবন্ধু লোকনাথ ইত্যাদি (অনুশাসনপর্ব, ১৪৯, বিষ্ণুসহস্রনাম)। মহাদেবের প্রায় নামই এই বিষ্ণুসহস্রনামে দেখা যায়। যথা, ঈশান, স্থাণু, মহাদেব, রুদ্র, বৃষাকৃতি, লোকাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

অসুর যাতুধান ক্রব্যাদদের অপসারণ করাইবার বহু মন্ত্র আমাদের প্রাচীন হব্য ও কব্যে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এখনও শ্রাদ্ধকালে পড়িতে হয়,

ওঁ নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ
হতাশ্চ সর্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বে॥ —পুরোহিতদর্পণ, ১৩১৬, পৃ. ৫৪৫

এবং

ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ॥ —ঐ

কিন্তু এমন করিয়া মারিয়া ধরিয়া আর কতকাল যাগযজ্ঞ করা চলে। তাই যজ্ঞারম্ভেই গণপতির পূজার দ্বারা যজ্ঞাদি নির্বিঘ্ন করা হইত। গণপতির নাম তাই বিঘ্ননাশন। এই কারণেই হোমের অগ্নির পাশে শালগ্রামশিলা স্থাপন করিয়া গণচিত্তকে প্রসন্ন করিতে হইত। এইভাবেই পশ্চিম-ভারতে হনুমান প্রভৃতির পূজা গৃহীত হইল।

যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতায় (১৬, ৪০-৪৭), তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪, ৫, ১-১১), কাঠক সংহিতায় (১৭, ১১-১৬), মৈত্রায়ণি সংহিতায় (২, ৯, ১-১০) এই সব কারণেই রুদ্র ও শিবকে আপন করিয়া লইয়া গণচিত্তকে আরাধনা করার চেষ্টা দেখা যায়। অথর্ববেদেরও বহুস্থানে এইরূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য ৪, ২৯ ; ৭, ৪২ ; ৭-৯২ ইত্যাদি)।

এই সব দেবতার বাহন ও ভূষণ যে-সব জন্তু তাহাতে তখনকার দিনের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানবশ্রেণী সূচিত হয়। স্থানান্তরে নানা জন্তু পক্ষী ও বৃক্ষাদির নামযুক্ত সব জাতির কথা হইবে। নাগ জাতি ছিল শিবের উপাসক। সুপর্ণেরা বিষ্ণুর উপাসক। সুপর্ণই গরুড়, বেদের মধ্যেও এইরূপ Totemএর পরিচয় পাওয়া যায়।

শিবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও শিবকে না মানাতে দক্ষের ঘটিল দুর্গতি। ভৃগু যে লিঙ্গধারী শিবকে শাপ দিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বেই নানা পুরাণের উদ্ধৃত অংশে দেখা গেল। এই ভৃগুই বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন। বোধ হয় ভৃগুরা খুব নিষ্ঠাবান বৈদিক ছিলেন। প্রাচীনতর বৈদিক ধর্মের ঐ পদাঘাতে লাঞ্ছিত হইয়াই বৈষ্ণবধর্ম আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইন্দ্রের পরে বিষ্ণুর আরাধনা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া বিষ্ণুর নাম হইল "উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ"। উভয়ের অর্থ ই ইন্দ্রের পরবর্তী।

বহুদিন পূর্বে গুজরাত বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কারবণ নামে এক গ্রামে যাই।

সেখানে বহু দেবমন্দির। তীর্থ বলিয়া গ্রামটির খ্যাতি। সেখানে মুখলিঙ্গ দেখিবার জন্য বাহির হইয়া দেখি একটি মন্দিরের বাহিরে একটি মসজিদের মূর্তি পাষাণে খোদিত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এই ভাবেই নাকি তাঁহারা মন্দিরটিকে মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

লিঙ্গপুরাণে একটি চমৎকার কাহিনী দেখা যায়। বিষ্ণুর পূজাতে যাগযজ্ঞ অপেক্ষা গানের বেশি পসার ছিল। নারদ বলিতেছেন, "যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও প্রবেশ নাই সেখানে ভক্তিপূর্ণ গানের মাহাত্ম্যেই কৌশিকগণ বিষ্ণুর সমীপস্থ ছিলেন। তাঁহারা গানের বলেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ, ৩য় অধ্যায়, ১৪-১৭)।" নারদ তাই গান শিক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দৈববাণী হইল, "উলূক রাজার কাছে যাও।". উলূকরাজের নামই গানবন্ধু। গানবন্ধু বলিলেন, পূর্বকালে ভুবনেশ রাজা দ্বিজগণকে গান করিতে ও গানের দ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার বা মানুষের পূজা করিতে নিষেধ করেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে প্রাণদণ্ড হইত (১৮-২৭)। হরিমিত্র নামে ব্রাহ্মণ হরিপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া গান করিতেন। বেদপন্থী ভুবনেশ রাজা হরিপ্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মৃত্যুর পর রাজা ভুবনেশের বিষম যন্ত্রণা হইল। দিবারাত্রি রাজা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে থাকিলেন (২৮-৩৯)। যমরাজ তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ফলে কুলাইবে না। তুমি ব্রাহ্মণগণকে হরিগুণ গান করিতে দেও নাই, ইহাতে তোমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইবে (৪০-৪৯)।"

এই সব গল্প শুনিয়া নারদ পরে গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর কাছে। দেবী সত্যভামাও নারদকে গান শিক্ষা দেন। দেবী রুক্মিণী ও তাঁহার কিংকরীদের কাছেও নারদ গীতবিদ্যার আরাধনা করেন (৮৯-১০০)। ইহাতে বুঝা যায় বেদবাহ্য বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজাতে এবং বেদমন্ত্রবাহ্য তাললয়াদি-যুক্ত গানে পুরুষ অপেক্ষা নারীদেরই একসময় অধিক জ্ঞান ছিল। নারদের মত মহর্ষিকেও এই সব বিদ্যা শিক্ষা করিতে নারীদের কাছেই যাইতে হইয়াছে।

দেবীপূজা ও তন্ত্রমতও বৈদিক মতের পাশে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক বৈদিকমতবাদী আচার্য তাহা শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধই মনে করিয়াছেন। যতই কাল যাইতে লাগিল, আর্যরা যতই নানাদিকে ছড়াইতে লাগিলেন, ততই এই সমস্ত মতবাদ তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিতে লাগিল। তাঁহাদের পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান ও বেদবাদের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। ইচ্ছায় হউক

অনিচ্ছায় হউক এইসব আর্যেতর মতবাদগ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের উপায় ছিল না। তাই এখন সাধারণত সকলে বৈদিক সন্ধ্যার সঙ্গে তান্ত্রিক সন্ধ্যাও এই দেশে করেন। গুজরাটে দেখিয়াছি ব্রাহ্মণদেরও প্রতি পরিবারেই কুলদেবী আছেন। অনেকের কুলদেবী কূপের মধ্যে দেয়ালের গায়ে গাঁথা, সকলের দৃষ্টি হইতে দূরে সংরক্ষিত। তবে বিবাহাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে কুলদেবীর পূজা না করিয়া উপায় নাই। এই ভাবেই গ্রামদেবী ও গ্রামদেবতাগুলিও ক্রমে ক্রমে আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং এখন তাঁহাদের দারুণ ভিড়ে বৈদিক দেবতারাই স্থানচ্যুত হইয়াছেন। এখন কথায় কথায় শুনিতে পাই দেবীর মাহাত্ম্য গান করা হয় "বেদে বলে তুমি ত্রিনয়না"! তুলসীদাস তো মহা পণ্ডিত ছিলেন তিনিও রামচরিতকথা গান করিতে করিতে প্রতিপক্ষ মতকে আঘাত করিতে গিয়া স্বীয় মতকে বেদসম্মত মার্গ করিয়াছেন।

শ্রুতি সম্মত হরিভক্তি পথ।—রামচরিত মানস, উত্তর কাণ্ড, দোহা ১৫৯

ভারতবর্ষের মধ্যে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরাই এখন সর্বাপেক্ষা বেদাচারী। তাঁহারাও মন্দিরের মধ্যে তান্ত্রিক আচারেই পূজা-অর্চনা করিয়া থাকেন।

এই সব বেদবাহ্য দেবতার পুরোহিতও ছিলেন অনার্যেরাই। প্রথম দিকে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সেই সব দেবতার বিরোধী। পরে যখন সেই সব দেবতার আসন ক্রমে বেদপন্থীদের সমাজের মধ্যে জমিয়া উঠিল তখন ব্রাহ্মণেরা ক্রমে সেই সব দেবতার পৌরোহিত্যে ব্রতী হইলেন। একসময়ে দক্ষিণে নারীরাই দেবমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, কারণ সেখানে সমাজে নারীরই ছিল প্রাধান্য। সেই মাতৃতন্ত্র দেশে যখন বৈদিক সভ্যতা গিয়া পৌঁছিল তখনও অগ্নি সেখানে নারীরাই ফুঁ দিয়া জ্বালাইতেন। মহাভারতে দক্ষিণ-দেশে সহদেবদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখি মাহিষ্মতীপুরীতে সুন্দরী কুমারী কন্যার ওষ্ঠপুটবিনির্গত বায়ু বিনা অন্য কোনো ব্যজনেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেন না।

ব্যজনৈর্ধূয়মানোঽপি তাবৎ প্রজ্বলতে ন সঃ।
যাবচ্চারুপুটৌষ্ঠেন বায়ুনা ন বিধূয়তে॥—সভাপর্ব, ৩০, ২৯

অগ্নিও সুন্দরী কন্যার সঙ্গলাভ করিয়া সেখানকার কন্যাদের বর দিলেন যে তোমাদের জন্য এখানে অপ্রতিবারণ অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিহার বিহিত হইল। তাই সেখানকার নারীরা স্বৈরিণী ও যথাকামবিহারিণী।

এবমগ্নির্বরং প্রাদাৎ স্ত্রীনামপ্রতিবারণে।
স্বৈরিণ্যস্তত্র নার্য্যোহি যথেষ্টং বিচরন্ত্যত॥—সভাপর্ব, ৩০, ৩৮

নারীরাই সেখানে ছিলেন প্রধান। তাঁহারাই ছিলেন দেবতার সেবিকা। তাঁহাদের দেবতার সেবার অধিকার ক্রমে চলিয়া গিয়াছে ব্রাহ্মণের হাতে। এখন তাঁহারা দেবমন্দিরে নর্তকী বা দেবদাসী মাত্র। এই কাজটুকু পুরাতন কালের পরিপূর্ণ সেবাকর্মের একটুকু অংশ মাত্রে পর্যবসিত হওয়ায় তাহা এখন এত মলিন ও দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ-দেশের প্রভাব উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। তাই জগন্নাথ প্রভৃতির মন্দিরেও এখনও দেবদাসীপ্রথা আছে।

বেদের পরবর্তী সব দেবতার পুরোহিত নারী বা অনার্য। এখনও শূদ্রের পৌরোহিত্য সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। ব্রাহ্মণের দ্বারা সবই যদিও অধিকৃত হইয়াছে তবু নানা ফাঁকে আমরা সেই প্রাচীন যুগের আভাস এখনও পাই। দক্ষিণে দাসরীরা শূদ্র। তাহাদের পূর্বগৌরব আর নাই তবুও তাহারা এখনও বহু জাতির গুরুরূপে পূজ্য।[১]

ইরালিগা জাতি একসময় ছিল যাযাবর। এখন তাহাদের সামাজিক স্থান অতি হীন। তাহারা নাকি দেবীর স্বহস্তরচিত মানবের সন্তান। তাহারা সব বনদেবীর পূজক। তাই তাহাদিগকে পূজারি বলে। মাদিগারা অতি হীন জাতি। তাহাদের মধ্যে দেবীর পূজক অনেকে নারী। তাহাদিগকে মাতঙ্গী বলে। এক মাদিগা বালক ব্রাহ্মণের বেশে বিদেশে গিয়া শাস্ত্রাভ্যাস করিল এবং ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। যখন ইহা ধরা পড়িল তখন সেই কন্যা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিল। তাহাকে ব্যাধির দেবী বা "মারী" করা হইল।[২] মারীর পূজক মাদিগাও হীন অন্ত্যজ জাতি। এই মারী হইতেই কি বাংলা দেশের "মারীভয়" কথায় উৎপত্তি ?

দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরে কানিকর জাতিরা জঙ্গলবাসী অসভ্য জাতি। তাহাদের সব দেবতা প্রায়ই দেবী। তাহাদের পূজা হয় মীন-কন্যাতে অর্থাৎ বসন্তে ও শরতে।[৩] আমাদের শারদীয়া ও বাসন্তী পূজা ইহার সহিত তুলনীয়।

জগন্নাথের মন্দিরে প্রাচীনকাল হইতে এক শ্রেণীর হীনজাতীয় সেবক আছে। তাহারা "দৈত" বা শবর জাতীয়। এখন তাহাদের কৃত্য বেশি কিছু আর অবশিষ্ট নাই, তবু উৎসবাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহাদের সহায়তা না হইলে চলে না। এই শবর সেবক ছাড়া সাধারণ শবরদের সেখানে প্রবেশ নাই। এখন জগন্নাথ বর্ণ-

১ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. III, p. 117

২ *Mysore Tribe and Castes*, Vol. IV, p. 157

৩ Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, Vol. III, p. 170

হিন্দুদেরই দেবতা হইয়াছেন। যদিও লোকে বলে জগন্নাথের কাছে অন্নজলের বিচার নাই তবু সেখানে পাণ-কণ্ড্রা প্রভৃতি হীন অন্ত্যজ জাতির প্রবেশ নাই। এইসব অন্ত্যজদের কাছে এমন অনেক মন্দিরের দ্বার আমরা বন্ধ করিয়া দিয়াছি যেখানকার পূজা-অর্চনাদি আমরা তাহাদের কাছেই পাইয়াছি এবং তাহাও গ্রহণ করিয়াছি অনেক বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া। যাহারা এইসব পূজার প্রবর্তক তাহারাই এখন সেই সব মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী।

থর্স্টন সাহেব বলেন জগন্নাথমন্দিরে নাপিতকেও সময়ে সময়ে দেবার্চনার কাজে সহায়তা করিতে হয়। তামিলদেশে কয়েকটি অতি নিষ্ঠাবান শুদ্ধাচারী শিবমন্দিরে অস্পৃশ্য পারিয়ারাই বিশেষ বিশেষ বাৎসারিক উৎসবে সাময়িকভাবে প্রভুত্ব করে।[১]

দক্ষিণ-কর্ণাটে কেলসী বা নাপিত জাতি শূদ্রদের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে।[২]

দক্ষিণে বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে বহু প্রাচীন ভক্ত সব অন্ত্যজ ও শূদ্র জাতীয়। আচারী বৈষ্ণবাচার্যদের বহু আদিগুরু নানারকমের হীনজাতি হইতে উৎপন্ন। সাতানীরা এইরকম হীন শূদ্র বৈষ্ণবমন্দিরসেবক। সাতানীর মূল শব্দ হইল সাত্তা-দবন অর্থাৎ শিখাসূত্রবিহীন। সাতানীরা সংস্কৃত শাস্ত্র অপেক্ষা দ্বাদশ বৈষ্ণব ভক্ত বা অল্‌বারদের গ্রন্থ "নালায়িরা প্রবন্ধম্"কেই মান্য করেন।[৩]

রামানুজমন্দিরের কাজে সাত্তিনবন ও সাত্তাদবনদের নিযুক্ত করিলেন। সাত্তিন-বনেরা ব্রাহ্মণ, সাত্তাদবনেরা শূদ্র।[৪]

এইসব বিষ্ণুমন্দিরে প্রথম প্রথম যে-সব ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাও সমাজে প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছেন। মারকেরা বৈষ্ণব মন্দিরের সেবক, তাঁহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ থাকিলেও এখন তাহাদের দাবি সমাজে স্বীকৃত হয় না।[৫] শিব-বিষ্ণু আরাধনাতে অতি নীচ জাতিরও অধিকার আছে। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভারত রায়পুরে এক মুচি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করান।[৬]

শিব সম্বন্ধেও এই কথা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। বেদাচারের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করিয়া

১ *Caste and Race in India*, pp. 26-27
২ *Castes and Tribes of Southern India*, vol. iii, p. 269
৩ *Ibid*, vol. vi, p. 299
৪ *Mysore Tribes and Castes*, vol. iv, p. 591
৫ ঐ, vol. ii, p. 310
৬ *Epigraphia Indica*, vol. ii, p. 229 ; *Caste and Race in India*, p. 99

শৈবধর্ম আর্যদের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবমন্দিরের পূজক তপোধনরা গুজরাতে সামাজিকভাবে অত্যন্ত হীন।[১] দক্ষিণ-দেশে শিবনাম্বী বা শিবারাধ্যরা শিবমন্দিরের পূজারি হওয়াতে ব্রাহ্মণ হইয়াও সমাজে অচল। অন্য ব্রাহ্মণরা তাহাদের সঙ্গে কাজ করেন না।[২] শিবধ্বজরা স্মার্ত সম্প্রদায়ের শিবমন্দিরের পূজারি। তাঁহারাও সমাজে হীন হইয়া গিয়াছেন[৩]। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইঁহাদের বলে গুরুকৃকল। তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট। কিন্তু কোচিন ত্রিবাঙ্কুরে শিবমন্দিরের পূজারিদের অবস্থা এতটা শোচনীয় নহে[৪]। দেবাঙ্গরাও লিঙ্গপূজক শৈব। তাহারাও ব্রাহ্মণত্বের দাবি করে কিন্তু সমাজে তাহা স্বীকৃত হয় না। তাহারা নিজেদের যজন-যাজন নিজেরাই করে এবং বস্ত্রবয়নই এখন তাহাদের জীবিকা।[৫] মুস্সাদরা পূর্বে ছিলেন ব্রাহ্মণ। দ্বাপরে শিবের প্রসাদ খাওয়ায় তাঁহারা সমাজে পতিত হন।[৬] তাঁহাদের আচারব্যবহার বিশুদ্ধ নাম্বূদ্রী ব্রাহ্মণদের মত। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহারা গভীর পাণ্ডিত্য উপার্জন করেন।[৭] তবু শিবসংস্পর্শদোষে ইঁহারা এখন পতিত।

শিবনির্মাল্যের আর একটি চমৎকার ব্যবহার তুলুদের দেশে আছে। কোনো নারী যদি সাংসারিক নির্যাতনে বা অন্য কোনো কারণে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন তবে তিনি গিয়া শিবমন্দিরে প্রসাদ খান। তাহাতে সংসারের সব বাঁধন, এমন কি বিবাহবন্ধনও তাঁহার ঘোচে। যদি তাহার পরে তিনি আবার বিবাহ করেন তবে তাঁহাদের সন্তানরা মোয়িলি জাতি বলিয়া গণ্য হন। তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা হীন।[৮] মলনদ তালুকেও শিবের নৈবেদ্যের চাউল খাইয়া নারীরা সংসারের বাঁধন ঘুচাইয়া ফেলিতে পারেন। তাঁহাদের সন্তানদের জাতি হয় মালেরু।[৯]

চিদম্বরম্ মহাতীর্থে নটরাজমন্দিরের প্রবেশপথেই প্রথমে মূর্তি হইল ভক্ত নন্দনারের। তিনি অস্পৃশ্য পারিয়া জাতিতে উৎপন্ন। কিন্তু তাঁহার গান ছাড়া এখন ব্রাহ্মণদেরও কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না।

১ Wilson, *Indian Castes*, vol. ii, p. 122
২ *Mysore Tribes and Castes*, vol. ii, p. 318
৩ *Ibid*
৪ *Ibid*
৫ *Ibid*, vol. iii, p. 137
৬ *Castes and Tribes of Southern India*, pp. 120, 122
৭ *Ibid*, pp. 122, 123
৮ *Ibid*, vol. v, p. 81 ; *Mysore Tribes and Castes*, vol. i, 218
৯ *Mysore Tribes and Castes*, vol. iv, p. 185

শাস্ত্রানুসারে গ্রাম-দেবল অযাজ্য। অর্থাৎ গ্রামদেবদেবীর পূজক ব্রাহ্মণেরা পতিত। মনু নানা স্থানে তাহাদিগকে পতিত বলিয়াছেন (৩, ১৫২ , ৩, ১৮০ ইত্যাদি)।

এইসব অনার্য দেবতাকে শূদ্রদের দেবতা বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বহুকাল পূজ্য মনে করেন নাই। এখন অবশ্য ব্রাহ্মণেরাই ক্রমে সেই সব দেবমন্দিরে পুরোহিত হইয়া শূদ্রদের পৌরোহিত্য লোপ করিয়াছেন। রাঢ়দেশে অব্রাহ্মণ দেবতা ধর্মরাজের মন্দিরে প্রায়ই শূদ্র ও অন্ত্যজরা পুরোহিত। বহু ধর্মমন্দিরে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছেন। এমন কোনো কোনো মন্দির আছে যেখানে আদিপূজক শূদ্রদেরই আর পূজাতে কোনো অধিকার নাই। তাহাদের পৈতৃক দেবতার পূজায় তাহারাই অনধিকারী! শূদ্র দেবতার প্রতি ব্রাহ্মণের বিদ্বেষের কিছু অবশেষ এখনও দেখা যায়। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত শিব বা বিষ্ণু ব্রাহ্মণের নমস্য নহে। তাই বাংলাদেশে শূদ্রেরা প্রায়ই গুরু বা পুরোহিতের দ্বারা দেবপ্রতিষ্ঠা করান।[১] ইহা সেই পুরাকালীন অনার্যদেবতার প্রতি বেদপন্থী ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষের ভগ্নাবশেষ। ইহাতে পুরাণের মুনিগণের শিব-বিরোধিতা ও ভৃগুমুনির বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাতের কথাই মনে আসে। অথচ এখন সেইসব দেবতার প্রতি লোকের ভক্তি ও ভয়ের আর সীমা নাই। শালগ্রামশিলা এখন স্থান পাইয়াছে বৈদিক অগ্নির পাশে। নহিলে বেদের যাগযজ্ঞের সহিত শালগ্রামের আর সম্বন্ধ কিসের?

বৈদিক আর্যদের মিলনের স্থান ছিল যজ্ঞক্ষেত্র, অবৈদিকদের মিলনস্থল ছিল তীর্থ। তীর্থ জিনিসটাই বেদবাহ্য। তাই বিরুদ্ধ মতকে বলে তৈর্থিক মত (কারণ্ডব্যূহ, ১১, ৬২)। বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্র ও প্রচারক্ষেত্রও সেই কারণে ছিল যজ্ঞস্থল এবং অবৈদিক সভ্যতার প্রচারক্ষেত্র ছিল তীর্থ। তীর্থ অর্থ নদীর তরণযোগ্য স্থান। নদীর পবিত্রতা আর্যপূর্ব সংস্কৃতির দান। এখন ভাষাতত্ত্ববিদেরা দেখিতেছেন গঙ্গা প্রভৃতির নাম ও পবিত্রতা বেদপূর্ব বস্তু। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতিরা নদী ও বৃক্ষেরই পূজক। দামোদরে অস্থি না দিলে তাহাদের পিতৃলোকের গতি হয় না। এই যে নদীর পূজা, নদীতে অস্থিদান, ইহা তো বেদে পাই না। এগুলি তবে পাইলাম কোথায়? যে-সব দেবতার সঙ্গে জড়িত বলিয়া তুলসী বট অশ্বত্থ বিল্ব প্রভৃতির পবিত্রতা সেইসব দেবতার আদিম পরিচয় পাই বেদবিরুদ্ধ বলিয়া। ক্রমে ঐ সময় বৃক্ষের পূজা আর্যরা পাইলেন পূর্ববর্তী ভারতীয়দেরই কাছে।

১ Bhattacharya, *Hindu Castes and Tribes*, pp. 1920

নদীর পূজাও তাঁহারা খুব সম্ভব সেইখানেই পাইলেন। অনার্য বহু জাতিরই কুল-দেবতা এমন কি কুলনাম পর্যন্ত বৃক্ষের নাম। থার্স্টন লিখিত *Castes and Tribes of Southern India* পুস্তকখানি দেখিলে তাহার সাতটি খণ্ডে ইহার প্রচুর পরিচয় পাইবেন। প্রথম খণ্ডেই দেখি Adavi, Addaku, Agaru (পান), Akula (পান), Akshantala (চাউল), Allam (আদা), Ambojala (পদ্ম), Allikulam (কুমুদ), Anapa, Avashina (হলদী), Arati (কলা), Arli (অশ্বথ), Athithi এবং Basari (ডুমুর), Aviri (নীল), Avisa, Banni (শমী), Belata বা Belu (কদবেল), Bende, Bevina (নিম), Bilpatri (বেল) প্রভৃতি প্রায় বাইশটি জাতি বা কুলের নাম। তাহারা এই সব গাছের কখনও অপমান সহিতে পারে না। দ্বিতীয় খণ্ডেও এইরূপ নাম আছে কুড়িটির অধিক। বাহুল্যভয়ে নামগুলি আর পৃথক্ করিয়া দেখানো গেল না। তৃতীয় খণ্ডে দশটি, চতুর্থ খণ্ডে তিনটি, নবম খণ্ডে চৌদ্দটি, ষষ্ঠ খণ্ডে তেরটি, সপ্তমে সতেরটি এইরূপ ভাবে বৃক্ষের নামে জাতি বা গোত্রের নাম। মোট প্রায় একশতটি এইরূপ নাম পাই। উহার মধ্যে "আম" বা Mamidla [১] আছে, নারিকেল [২] আছে, বট বা Raghindala[৩] আছে, তুলসী [৪] আছে।

নানা জন্তুর নামেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা কুলের নাম। জন্তুর নামগুলির কথা অন্য প্রসঙ্গে করা যাইবে।

বহু উৎসবও আর্যদের কাছে পাওয়া। যেমন হোলি বা বসন্তোৎসব। ইহাতে জঘন্য রকম গালাগালি দেওয়া, জুয়া খেলা, আগুন জ্বালা, মদ্যপান প্রভৃতির মাতামাতি আছে। নিম্নশ্রেণী ও অন্ত্যজদের মধ্যেই ইহার পরাক্রম বেশি। তাই ইহাকে অনেকে শূদ্রোৎসব বলেন। ইহাতে যে আগুন জ্বালা হয় তাহা অনেক সময় অন্ত্যজদের কাছে হইতে আনিতে হয়। বেরারে কুনবীরা অস্পৃশ্য মহরদের অগ্নি হইতে হোলির আগুন আনিতে বাধ্য।[৫]

হোলাকা নামে রাক্ষসীর তৃপ্তির জন্য নাকি এই উৎসবে গালাগালি করিতে হয়। কৃষ্ণের হাতে এই রাক্ষসী নিহত হয়। মরিবার সময় সে বলিয়া যায়, এইভাবে যেন লোকে প্রতিবৎসর তাহার প্রেতাত্মার তৃপ্তিদান করে।

১ *Castes and Tribes of Southern India*, iv, p. 444
২ *Ibid*, v, p. 248
৩ *Ibid*, vi, p. 238
৪ *Ibid*, vii, p. 205
৫ *Caste and Race in India*, p. 26

কাজেই দেখা যাইতেছে এখনকার অনেক দেবতা, তীর্থ ও উৎসব অনার্যদের কাছে প্রাপ্ত। সন্ধান করিলে দেখা যাইবে আর্যগণের অনুষ্ঠানের অনেক উপকরণও আর্যপূর্ব জাতিদের কাছে গৃহীত। এখন বিবাহাদিতে আমাদের সিন্দূর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখিত পুরোহিতদর্পণের অষ্টম সংস্করণের কয়েকটি স্থান দেখিলেই বুঝা যায় যে সিন্দূর জিনিসটা আর্যরা অন্যদের কাছেই পাইয়াছেন। সিন্দূরের কোনো বৈদিক নাম বা মন্ত্র নাই। সামবেদীয় ঘটস্থাপনে সিন্দূর স্পর্শ করিয়া যখন মন্ত্র পাঠ করিতে হইতেছে তখন মন্ত্রটি এই :

"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্‌থিনং" ইত্যাদি —পৃ. ৮

যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপনে সিন্দূরের মন্ত্রটি এই :

"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো" ইত্যাদি —পৃ. ১০

বিবাহে সামবেদীয় অধিবাস মন্ত্রে সিন্দূরের মন্ত্র :

"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষিতম্" ইত্যাদি —পৃ. ৭০

ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ৭, ৪৬, ৪৩। সেখানে সিন্ধু নদীর উচ্ছ্বাসের কথা। কেবলমাত্র শব্দসাম্যে তাহা সিন্দূরের মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ৪, ৫৮, ৭ মন্ত্র। তাহার সঙ্গেও সিন্দূরের কোনোই যোগ নাই।

সামবেদীয় অধিবাসমন্ত্রের মধ্যে স্বস্তিক, শঙ্খ, রোচনা, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণের যে মন্ত্র [১] তাহা বৈদিক মন্ত্র হইলেও ঐ সব বস্তুর সঙ্গে তাহার কিছুই যোগ নাই। সিন্দূর তো নাগদের বস্তু তার নাম নাগগর্ভ, নাগসম্ভব। শঙ্খ ও কম্বু প্রভৃতি নামও বেদবাহ্য।

শ্রাদ্ধপ্রথাও যে পরবর্তী কালে আর্যদের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থান্তরে দেখানো গিয়াছে [২]।

নানাবিধ মানবমণ্ডলী দিয়া যে ভারতীয় সমাজ গঠিত তাহার একটা বড় প্রমাণ তাহার নানাপ্রকার বিবাহপদ্ধতি দেখিয়া। আমাদের সমাজে প্রধানত আট প্রকার বিবাহপদ্ধতি স্বীকৃত। মনুও বলেন ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস পৈশাচ এই আট প্রকারের বিবাহ আছে।

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩, ২১

ইহাদের মধ্যে শেষ চারিটি পর যে বিভিন্ন জাতীয় মানবমণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত

১ পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ৭০, ৭১

২ 'ভারতের সংস্কৃতি', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩, বিশ্বভারতী

তাহা তো নামেই বুঝা যায়। প্রথম প্রথম চারিটি ও ষষ্ঠটি হয়তো উন্নত সংস্কৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণী হইতে প্রাপ্ত পদ্ধতি হইতে পারে।

এই আট প্রকারের বিবাহের মধ্যে আসুর রাক্ষস পৈশাচ বিবাহ নিন্দনীয় হইলেও সমাজনেতারা তাহাকে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। আইন হিসাবে তাহাকে অচল বলিলে চলিবে না, নৈতিক হিসাবে তাহা পছন্দসই নাও হইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর আর্যগণ এই সব আর্যেতর বিবাহকে প্রশংসা না করিলেও সামাজিক ভাবে অবৈধ বলিতে পারেন নাই। ভালমন্দ নানা জাতি পাশাপাশি বাস করিলে সবরকম রীতিনীতিই আইনের মধ্যে স্বীকার করিতে হয়।

আমাদের দেশে উচ্চতর জাতিরা নিম্নজাতির লোকদের উচ্ছেদ করে নাই বলিয়াই ভারতে চিরদিন এত সমস্যা। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আদিম অধিবাসীদের লুপ্ত করিয়া দিয়া য়ুরোপীয়রা সমস্যা সহজ করিয়াছে। আমেরিকাতে নিগ্রো দাস ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে যে-সব আদিম জাতি আছে তাহাদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতিদের ব্যবহার কিছুমাত্র সভ্যজনোচিত নহে।

মোট কথা, ভারতে ভালমন্দ অসংখ্য জাতি পাশাপাশি বাস করিয়াছে। তাই সকলকেই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নিজেকে অন্যের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই সব কারণেই এই দেশে স্পর্শাস্পর্শ বিচার, অন্নজল ও বিবাহাদি বিষয়ে বিচার এত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকে মনে করেন আমাদের পূজা জিনিসটাই বেদবাহ্য। বেদে এই শব্দ নাই। এবং ইহার মূল মেলে অবৈদিক ভাষাতে। ডাক্তার কলিন্স প্রভৃতি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভক্তি জিনিসটাও নাকি অবৈদিক। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে একটি চমৎকার কথা আছে। ভক্তি নিজের দুঃখের কথা নারদকে বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন, "আমার জন্ম দ্রাবিড়দেশে, কর্ণাটে আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। মহারাষ্ট্রে কিছুদিন আমি বাস করি। তার পর গুর্জরে গিয়া হইয়াছি জীর্ণ।"

> উৎপন্না দ্রবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
> স্থিতা কিঞ্চিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৯৩, ৫১

মধ্যযুগের ভক্তরাও বলেন, "ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল দ্রবিড়ে, ইহাকে এদেশে আনিলেন রামানন্দ।"

> ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।

মহাপ্রভু ভক্তির অন্বেষণে দক্ষিণ-দেশেই তীর্থযাত্রা করেন।

নৃত্যগীত প্রভৃতি আরও অনেক কিছু আর্যেরা এদেশে আসিয়া সংগ্রহ করেন,

যদিও পূর্বেও সেই সব কিছু কিছু তাঁহাদের ছিল, তবে তাহা এখানেই সম্যক্ সমৃদ্ধ হয়। মোট কথা, আর্যেরা এই দেশে আসিয়া ভালমন্দ অনেক কিছুই পাইয়াছেন তার মধ্যে জাতিভেদও একটি।

শুধু অনার্য সব দেবতা বা উপকরণ নহে, অনার্য সংস্পর্শে বৈদিক আর্যদের মধ্যে আরও এমন বহু জিনিস আসিল যাহা পূর্বে সমাজে চলিত ছিল না। হয়তো তাহা সমাজে প্রবেশলাভ করিবার সময় তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু একবার প্রবেশ লাভ করিয়া কোনোমতে একটু পুরাতন হইতে পারিলেই আর তার ভয় নাই। তখন সমাজস্থ সমস্ত সনাতনী শক্তি তাহাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে জ্যোতিষের প্রচার ভারতে ছিল যাগযজ্ঞের সময়নির্ণয়ের জন্য। ফলিত জ্যোতিষ পরে আসিল গ্রীক প্রভৃতিদের নিকট হইতে। তখন খুব বিরুদ্ধতা হইয়াছিল। এখন ভারতময় ফলিত জ্যোতিষের জয়জয়কার। ইহা যে মূলত য়ুরোপীয় তাহার সন্ধান এখন আর কে করে?

মুসলমানদের সঙ্গে শিখেরা চিরদিন যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু মুসলমানদের কাছেই গ্রন্থ-পূজা করিতে শিখেরা শিখিলেন। কোরাণের পূজার স্থলে শিখেরা পূজা চালাইলেন গ্রন্থসাহেবের। সব দেবদেবী সরাইয়া ফেলা হইল পৌত্তলিকতা বলিয়া, কিন্তু গ্রন্থ-পূজা করিলেও যে পৌত্তলিকতা হয় তাহা তাঁহারা ঠাওরই করিতে পারিলেন না। মুসলমানেরা ভগবদুপাসনার সময় মাথা অনাবৃত রাখেন না। মুসলমানদের সঙ্গে শিখেরা লড়াই করিতে-করিতেও এইটি গ্রহণ করিলেন। এখন কোনো শিখমন্দিরে কেহ অনাবৃত মাথায় প্রবেশ করিতে পারেন না।

রাজপুতেরা মুসলমান বাদশাহদের সঙ্গে চিরদিন যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের কাছেই আভিজাত্যের লক্ষণস্বরূপে পর্দা প্রথা ও আফিঙের ব্যবহার তাঁহারা শিক্ষা করিলেন। হয়তো প্রথমে এইসব প্রথার বিরুদ্ধেই ইঁহারা যথেষ্ট লড়িয়াছেন, পরে একবার এই জিনিসগুলি পুরাতন হইলে তাঁহাদের সন্তানেরাই আবার সেইসব জিনিসের সপক্ষে লড়িয়াছেন। যে-সব লোক একসময়ে জোরজবরদস্তিতে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় কোনো ধর্ম গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের পুত্রেরা হয়তো পরে সেইসব ধর্মেরই সপক্ষে পুরাতন পৈতৃক আদিধর্মেরই বিরুদ্ধে রক্তের নদী বহাইলেন। ভাগ্যের এইরূপ নিষ্ঠুর পরিহাস ইতিহাসের জগতে প্রায়ই দেখা যায়।

অসবর্ণ বিবাহ

আর্যরা ভারতে যখন আসেন তখন এদেশের লোকের সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তখন তাঁহারা নানা জাতি ও বর্ণে বহুধা বিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তাঁহারা সংহত একটি দল। তাই তাঁহাদের শক্তি ছিল অপরাজেয়। চিরদিনই দেখা যায় যখন একদল সংহত ব্যূহবদ্ধ লোক সংখ্যায় বহুগুণিত অথচ অসংহত গৃহস্থদিগকে আক্রমণ করে তখন সংহত দল সংখ্যায় কম হইলেও জয়ী হয়। গৃহস্থরা নিজেদের ঘরসংসার লইয়া ব্যস্ত থাকে, সংহত হইতে পারে না। আক্রমণকারীদের ঐসব বালাই নাই, তাহারা সংহত হইয়া কাজ করে। ঠিক এই কারণেই আর্যরা আর্যেতর লোকদের পরাজিত করিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, অনার্যদের সংস্রব হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য আর্যগণ জাতিভেদ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেন। প্রথমে এই ভাগ হইয়াছিল বর্ণের দ্বারা, তাই জাতিভেদের নাম বর্ণভেদ। বর্ণভেদের দ্বারা মনে হয় এই ভেদের মূলে ethnic বিচার। গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও রাজন্য এই দুই বিশেষ শ্রেণী হইল। যদিও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাচীর তখন তত দৃঢ় ছিল না। পরস্পরে বিবাহ চলিত। এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হওয়ার পথ ছিল। তাই তখন "ব্রহ্মরাজন্যৌ" কথাটির মধ্যে ভেদসত্ত্বেও একটি সম্বন্ধ বুঝা যায়। বাকি সব আর্য হইলেন বৈশ্য এবং আর্যেতর সব জাতি শূদ্র। যে সব আর্যেরা আর্যসংস্কৃতির মধ্যে আসেন নাই তাঁহারা নিষাদ। আর্যদের সকলেই যে বেদের আচার মানিয়া চলিতেন তাহা নহে। বেদবিরোধী ব্রাত্য আর্যও ছিলেন। বেদবিরোধী বহু আর্যকে দলছাড়া করিয়া শূদ্রও বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র। তাঁহাদের অর্ধেক মধুচ্ছন্দার বড়, অর্ধেক ছোট। বিশ্বামিত্রের বড় পঞ্চাশ জন পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন না করাতে অন্ধ্র-পুণ্ড্র-শবর-পুলিংদ-মুতিব প্রভৃতি অতিশয় হেয় অন্ত্যজ জন হইলেন। মধুচ্ছন্দাপ্রমুখ ছোট পঞ্চাশ জন মান্য ও শ্রেষ্ঠ হইলেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্চিকা, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, ১৮)। এখানে তো দেখা যায় অন্ধ্র শবরাদি জাতি ব্রাহ্মণদেরই বড় ভাই। কথাটা ভাবিবার মত। মনে হয় ইহার মধ্যে একটি বড় ethnic সত্যের একটু আভাস রহিয়া গিয়াছে। অন্ধ্র-পুণ্ড্র-শবরাদিরা সত্যই তো বড় ভাই, কারণ তাঁহারা

পূর্বে এই দেশে আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি আর্যেরা ছোট ভাই, কারণ তাঁহারা পরে আসিয়াছেন। কোনো কোনো বিষয়ে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতি অপেক্ষা হীন তো ছিলই না বরং উন্নত ছিল।

জাতিভেদ যখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তাহা সামাজিক নানা আচারে-বিচারেও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি চারি-জাতির চৈত্যের আকৃতি ভিন্নরূপ (১৩, ৮, ৩, ১১)। চারি জাতির অধিকারের ভেদ ও সীমাও সুনির্দিষ্ট হইল। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ২৯)। তাহাতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অধিকারের তুলনায় বৈশ্য শূদ্রের অধিকার অনেক পরিমাণে সংকুচিত। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় চারি বর্ণকে সম্ভাষণ করিবার রীতি ও ভাষাও ভিন্নরূপ হইয়া উঠিল (১, ১, ৪, ১২)।

ক্রমে কর্মের দ্বারায় ছুতার ও রথকার প্রভৃতি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। অনার্যদের অনেকেরই বাস ছিল নদী প্রভৃতি জলের ধারে। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে মাছ খাওয়া ও মাছ ধরা বিলক্ষণ চলিত ছিল; তাই তাঁহাদের মধ্যে কৈবর্ত দাস মৈনাল প্রভৃতি শ্রেণীর নাম মেলে। নৌকাচালকেরা নাবজ। বনরক্ষকরা বনপ। কুম্ভকারদের নাম কুলাল। নাপিতেরা বপ্তা। কর্মকারেরা কর্মার। এইরূপ বৃত্তি ও কাজের দ্বারা কতক ভাগ হইল, কতক ভাগ হইল দেশ কুল (race, tribe) প্রভৃতির দ্বারা।

সমাজে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বহুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ চলিত, অর্থাৎ এই ভেদটা তখনও খুব কঠিন হইয়া উঠে নাই। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ৬১ সূক্ত ও সেখানে সায়নাচার্যকৃত ব্যাখ্যা দেখিলেও এই প্রসঙ্গ বুঝা যাইবে। এই আখ্যায়িকাই বৃহদ্দেবতাতে দেখা যায়। দার্ভ্য রথবীতি, যজ্ঞ করিবার জন্য অত্রি-পুত্র অর্চনাকে পুরোহিত পদে বরণ করিলেন। পুরোহিতের পুত্র শ্যাবাশ্বও পিতার সঙ্গে যজ্ঞে সহায়তা করিতে গমন করিলেন। রাজার সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া শ্যাবাশ্ব বিবাহ করিতে চাহিলেন। রাজা আপন মহিষীকে বলিলেন অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব কিছু উপেক্ষণীয় জামাতা নহেন (অদুর্বলঃ)। কিন্তু রানী বলিলেন, "শ্যাবাশ্ব পুরোহিত হইলেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহেন। যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে কন্যাদান কর, তবে কন্যা বেদমাতা হইতে পারে।" কাজেই শ্যাবাশ্ব নিরাশ হইয়া মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গেলেন। অরণ্যে তাঁহার কাছে মরুদ্গণ আবির্ভূত হইলে, শ্যাবাশ্ব "য ঈম্ বহন্তে" মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। এইরূপে তিনি ঋষি হইয়া রাজকন্যার যোগ্য বর বিবেচিত হইলেন (বৃহদ্দেবতা, ৫, ৫০ ৭৯)।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে মহর্ষি চ্যবন রাজা শর্যাতের কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ

করেন (৪, ১, ৫, ৬)। এইসব বিবাহ তখনকার দিনে একটুও অসাধারণ ছিল না।

উশিজপুত্র ঋষি কক্ষীবানের পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদে বার বার তাঁহার উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ ১, ১৮, ১ ; ১, ৫১, ১৩ ; ১, ১১২, ১১ ; ১, ১১৬, ৭ ; ১, ১১৭, ৩ ; ৪, ২৬, ১ ; ৮, ৯, ১০ ; ৯, ৭৪, ৮ ; ১০, ২৫, ১০ ; ১০, ৬১, ১৬)। কক্ষীবান বিবাহ করেন রাজা স্বনয়-ভাব্যের কন্যাকে। ঋষির শ্বশুর রাজা স্বনয় অতিশয় বদান্য ছিলেন। কক্ষীবান আপন শ্বশুরের দান-দাক্ষিণ্যের বহু প্রশংসা করিয়াছেন (ঋগ্বেদ ১, ১২৬)।

বৈদিক যুগে এইরূপ বিবাহের খবর আরও অনেক মেলে, বাহুল্যভয়ে আর উল্লেখ করা গেল না।

পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী তাঁহার ঋগ্বেদ-সংহিতায় অনুক্রমণিকায় (পৃ. ৮৮) লেখেন যে ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণেরা রাজন্য এবং বৈশ্য বিধবা-দিগকে বিবাহ করিতেন। বৈদিক সময়ে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা আর অথর্ববেদে ৯।৫।২৭ হইতে প্রমাণিত হয়।

ময়োভূ ঋষি বলেন "কোনো নারীর যদি অব্রাহ্মণ দশজন পতিও থাকেন তবু যদি ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত গ্রহণ করেন তবে ব্রাহ্মণই তাঁহার একমাত্র পতি হইবেন।"

উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্বে অব্রাহ্মণাঃ।

ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা॥—অথর্ব, ৫, ১৭, ৮

ব্রাহ্মণই তাহার পতি হইবেন, রাজন্যও নহে বৈশ্যও নহে।

ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ॥—অথর্ব, ৫, ১৭, ৯

পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রমাণরূপে অথর্ব বেদের ৯।৫।২৭ মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মন্ত্রটি দেখিলে মনে হয় পতি জীবিত থাকিলেও পত্যন্তর গ্রহণ তখন চলিত। মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হইল।

যা পূর্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেপরম্।

পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিযোষতঃ॥

"যদি কোনো নারী পূর্বে অন্য পতিকে বিবাহ করিয়া পরে অপর আর একজনকে বিবাহ করেন তবে তাঁহারা পঞ্চ ওদন এবং একটি অজ দান করিলে তাঁহাদের এই বিবাহ আর রদ হইবে না।" এই মন্ত্রের দ্রষ্টা হইলেন ঋষি ভৃগু।

মহাভারতেও দেখা যায় রাজা গাধির কন্যা ছিলেন পরমাসুন্দরী। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র ঋচিক তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে গাধি বলিলেন, আমাদের কুলধর্মানুসারে

অভ্যন্তররক্তবহিঃশ্যামকর্ণযুক্ত সহস্র অশ্ব না পাইলে কন্যা দেই না। ঋচিক বরুণের কৃপায় গাধিকে সেইরূপ সহস্র অশ্ব দিলে গাধি সুতা সত্যবতীকে দান করিলেন। মহর্ষি ভৃগু সপত্নীক নিজ পুত্রকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন (বনপর্ব, ১১৫, ৩১)।

রাজা প্রসেনজিতের কন্যার নাম রেণুকা। ঋচিক পুত্র জমদগ্নি রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে রাজা তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন (বনপর্ব, ১১৬, ২)। জমদগ্নি রেণুকাসহ আশ্রমে তপস্যা করিতে লাগিলেন (বনপর্ব, ১১৬, ৩)। দশরথ রাজার কন্যা শান্তাকে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণ বেশধারী অর্জুন যখন কন্যার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাহাতে কেহই কোনো অন্যায় দেখিতে পান নাই। পুরাণ হইতে আর বেশি দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

পারস্করগৃহ্যসূত্রের সময়েও অনুলোম বিবাহ চলিত ছিল যদিও সবর্ণাকে বিবাহ করাই বেশি প্রশস্ত বিবেচিত হইত। অনুলোম বিবাহে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কন্যাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, তবে তাহাতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা চলিত না। (প্রথম কাণ্ড, চতুর্থ কণ্ডিকা, ৮-১১)।

গৌতম ধর্মসূত্রে (৪, ১৬) ও বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্রে (১, ৮) এইরূপ অনুলোম বিবাহ সিদ্ধ হইলেও দেখা যাইতেছে ক্রমেই তাহা হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। গৌতমমতে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান সবর্ণাজাততুল্য।[১]

ক্রমে এই উদারতাটুকু স্মৃতির যুগে লুপ্ত হইয়া আসিল। মনুও অসবর্ণ বিবাহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই তবে তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। (৩, ১২ ইত্যাদি ; ৩, ৪৩-৪৪)। তাঁহার নবম অধ্যায়ে সম্পত্তিবিভাগে অসবর্ণ বিবাহ-জাত সন্তানদের কথাও তাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছে, যদিও খুব প্রসন্নমনে নহে (৯, ১৪৮ ইত্যাদি)। গুরুর অব্রাহ্মণ পত্নীদিগকে কিভাবে শিষ্যেরা সম্মান করিতেন তাহাও তিনি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন (২, ২১০)।

যদিও স্মৃতিতে নানা স্থানেই অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান বৈধ বলিয়াই স্বীকৃত (স্বজাতিজা অন্তরজা ষট্সুতা দ্বিজধর্মিণঃ) তবু মনু সম্পত্তিভাগকালে ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে জাত ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে জাত, সন্তানের মধ্যে তারতম্য করিয়াছেন (৯, ১৫১-১৫৪)। যদিও এইরূপ বিবাহের বৈধতা অস্বীকার করিতে মনুও পারেন নাই।

১ *Caste and Race in India*, p. 78

পূর্বে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের সন্তানেরা পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইতেন। কারণ আর্যদের সমাজে পুরুষ অর্থাৎ বীজই ছিল প্রধান। অনার্যসমাজে কন্যাই প্রধান। ক্রমে আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থাতেও বীজের অপেক্ষা কন্যার অর্থাৎ ক্ষেত্রের প্রাধান্যই প্রচলিত হইয়া উঠিল। এখন যে মালাবারে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা নায়ারের কন্যার সহিত সংসার করেন তাহাকে বিবাহ না বলিয়া "সম্বন্ধম্" বলা হয়। তাহাতে যে সন্তান হয় তাহারা নায়ারই হয়। ইহা কন্যাতন্ত্র দেশেরই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

পূর্বে এইরূপ সন্তান যে পিতারই জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহার প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণকার মহীদাস স্বয়ম্। এই বিষয় স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকা "ঐতরেয়ালোচনম্" নামক মনোজ্ঞ পুস্তিকায় সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এক ঋষির পত্নী ছিলেম ইতরা বা শূদ্রা। তাঁহার পুত্র ঐতরেয়। যজ্ঞের সময় ঋষি আপন ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্রকে কোলে লইয়া নানা তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, ঐতরেয়কে উপেক্ষা করিলেন। ঐতরেয় মনের দুঃখে আপন মাতাকে দুঃখ জানাইলেন। মাতা ইতরার কুলদেবতা হইলেন মহী। শূদ্রেরা তো মহীরই সন্তান (children of the soil), তাই তিনি মহীদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেবী ভূগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া ঐতরেয়কে দিব্য সিংহাসনে বসাইয়া সর্বোত্তম জ্ঞান দিয়া তিরোহিত হইলেন। (পৃ. ১১-১২)। তপস্যার দ্বারাও দেবীর কাছে লব্ধ জ্ঞান দিয়া তিনি যে ব্রাহ্মণ রচনা করিলেন তাহাই ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। মহীর কাছে শিক্ষালাভ করায় মহীদাস নামেও ঐতরেয় পরিচিত। (পৃ. ১১)

এমন কি হরিবংশও বীজেরই প্রাধান্যের কথা বলিয়াছেন—"মাতা তো ভস্ত্রা (চর্মময় যন্ত্র) মাত্র, পুত্র হয় পিতারই। যাহার দ্বারা সে উৎপাদিত, পুত্র তাহারই স্বরূপ হইয়া থাকে।"

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ॥

—হরিবংশ, ৩২ অধ্যায়, ১৭২৪ শ্লোক

বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এই মত (৪, ১৯, ২)।

মনুর সময়ে দেখা যায় সবর্ণাতে বিবাহই সকলে পছন্দ করেন তবে অসবর্ণ বিবাহ তখনও অপ্রচলিত হয় নাই। তাই বলেন, (মনু, ৩, ৪৩)। "দ্বিজাতিগণের বিবাহে সবর্ণা কন্যাই ভাল তবে স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে এই সব কন্যা পর পর শ্রেষ্ঠ (মনু, ৩, ১২)। শূদ্র কেবল শূদ্র কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্যের পক্ষে বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতীয়া কন্যা বিহিত, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের কন্যা এবং ব্রাহ্মণ চারি জাতির কন্যাই বিবাহ করিতে পারেন।"

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্ব চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চ রাজ্ঞঃ স্যু স্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ মনু, ৩, ১৩

অসবর্ণ বিবাহে ভিন্ন জাতীয় কন্যাগণের পক্ষে বিধির ভিন্নতাও মনু দেখাইয়াছেন (মনু, ৩, ৪৪)।

শঙ্খসংহিতাতেও এই কথারই সমর্থন দেখা যায় (৪, ৬-৮ ; ৪, ১৪, আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী নং ৪৮) বিষ্ণুসংহিতা (২৪, ১-৮) ব্যাসসংহিতায়ও (২, ১০-১১) এই মত। ব্যাস বলেন সবর্ণা স্ত্রী থাকিতেও যদি অসবর্ণা কন্যা কেহ বিবাহ করে তবে সেই কন্যার সন্তানও সবর্ণা সন্তান হইতে হীন হইবে না (ব্যাস, ২, ১১)।

মনুর মত এই যে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যাতে যে কন্যা উৎপন্ন তাহাকে যদি পুনরায় কোনো ব্রাহ্মণ বিবাহ করে তবে সাতপুরুষে তাহাদের সন্তান পুরাপুরি ব্রাহ্মণই বনিয়া যাইবে (মনু, ১০, ৬৪-৬৫)।

মনুও স্বীকার করিয়াছেন যে অবর অর্থাৎ হীনজন হইতেও শ্রদ্ধাপূর্বক কল্যাণকরী বিদ্যা লওয়া উচিত, অন্ত্যজ চাণ্ডালাদি হইতে পরমধর্ম এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতে গ্রহণীয় (মনু ২, ২৩৮)। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শুচিতা, সুভাষিত, বিবিধ শিল্পকলা সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা উচিত (মনু, ২, ২৪০)।

অনুলোম বিবাহের সন্তানদের কথা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও আছে (১, ৯১-৯২)। দক্ষসংহিতা (৬, ১৭) গৌতমসংহিতা (৪৯ অধ্যায়)।

অসবর্ণা স্ত্রীরা সহধর্মিণী যে হইতে পারিতেন না তাহা নহে। যজ্ঞের জন্য অগ্নিমন্থন কার্য ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী করিবেন। সবর্ণা স্ত্রীর অভাবে অসবর্ণা স্ত্রীরাও করিতে পারেন (কাত্যায়নসংহিতা, ৮, ৬)। বিষ্ণুসংহিতা ধর্মকার্যে সবর্ণা স্ত্রীরই প্রশস্ততা জানাইয়াছেন। অভাব পক্ষে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ধর্মকার্য করিবার মত দিয়াছেন (২৬, ১-৩) কিন্তু শূদ্র পত্নীর সঙ্গে ধর্মকার্য করা সংগত মনে করেন নাই (২৬, ৪)। পরে দেখানো যাইবে সমাজে এই সব নিষেধ সব সময়ে খাটে নাই। কারণ মনুই নিজে স্বীকার করিতেছেন, "অধমযোনিজা কন্যা অক্ষমালা মহর্ষি বসিষ্ঠের সহিত যুক্ত হইয়া এবং তির্যক্‌কন্যা শারঙ্গী মন্দপাল মহর্ষির সহিত পরিণীতা হইয়া মান্যা পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা ছাড়াও আরও অনেক নারী অপকৃষ্ট-কুলজাতা হইয়াও স্বামীর মহদ্ গুণে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥
এতশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ॥ —মনু, ৯, ২৩-২৪

সবর্ণা ও অসবর্ণা পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্মাদি কি ভাবে করিতে হইবে তাহাও সংহিতাকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন (ব্যাস, ১, ৭-৮)। তবে দেখা যায় অসবর্ণা পত্নী ও তাঁহাদের সন্তানদের উপর সংহিতাকারদের মমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

এই মমতার অভাব সম্পত্তির উত্তরাধিকারব্যবস্থাতেও দেখা যায়। ব্রাহ্মণের যদি চারি বর্ণেরই পত্নী ও পুত্র থাকেন তবে সম্পত্তি দশ ভাগ করিয়া চারি ভাগ ব্রাহ্মণকন্যার পুত্রকে, তিন ভাগ ক্ষত্রিয়কন্যার পুত্রকে, দুই ভাগ বৈশ্যকন্যার পুত্রকে এক ভাগ শূদ্রকন্যার পুত্রকে দিবে (বিষ্ণুসংহিতা ১৮, ১-৫) এই ব্যবস্থা মনুও সমর্থন করিয়াছেন (৯, ১৫৩) তার পর কোনো কোনো স্ত্রীর সন্তান থাকিলে বা না থাকিলে কি রকম ভাগ হইবে তাহা নানাভাবে দেখাইয়া বিষ্ণুসংহিতা বলিতেছেন, "দ্বিজাতির যদি একমাত্র শূদ্রকন্যাজাত পুত্র থাকে তবে সে একাই অর্ধেক পাইবে।"

দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্ধহরঃ —বিষ্ণু, ১৮

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মতও এইরূপই (২, রিকৃথভাগ প্রকরণ, ১২৮)।

মনু নিজে বলেন, ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র তিন ভাগ, ক্ষত্রিয়কন্যার পুত্র দুই ভাগ, বৈশ্যকন্যার পুত্র দেড় ভাগ, শূদ্রকন্যার পুত্র এক ভাগ পাইবে (মনু, ৯, ১৫১)।

গৌতমসংহিতাতেও সবর্ণা অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে এইরূপ ভাগাভাগির ব্যবস্থা দেখা যায় (গৌতমসংহিতা, ২৯ অধ্যায়)।

শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তানের জন্য মনু দশ ভাগের এক ভাগের বেশি কিছুতেই দিতে নারাজ, তাহার পিতার সবর্ণা বা দ্বিজকন্যাজাত অন্য সন্তান না থাকিলেও।

নাধিকং দশমাদদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ধর্মতঃ — মনু, ৯, ১৫৪

এই ভাগের বিষয়ে ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিতেছেন, "ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান তো ব্রাহ্মণই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানও তো ব্রাহ্মণ, তবে ভাগবিষয়ে কেন তারতম্য হয়?"

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতা ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥—অনুশাসনপর্ব, ৪৭, ২৮

ভীষ্ম উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণীর জাতিগত শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ পত্নী জ্যেষ্ঠার মত মাননীয়া এবং সংসারে কর্তব্য ও দায়িত্বেও তিনি অগ্রণী, তাই এই ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণ গুরুগণের যদি সবর্ণা ও অসবর্ণা পত্নী থাকেন তবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শিষ্যগণ কি ভাবে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবেন? এই বিষয়ে মনু বলেন, "সবর্ণা গুরু-

পত্নীগণকে শিষ্যেরা গুরুর মতই সম্মান জানাইবেন, অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মান জানাইবেন।"

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থনাভিবাদনৈঃ ॥ —মনু, ২, ২১০

বিষ্ণুসংহিতায় এই কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। "হীনবর্ণজাতা গুরুপত্নীদিগকে দুর হইতে অভিবাদন করিবে, পাদস্পর্শাদি করিবে না।" (৩২, ৫)

উশনঃ সংহিতায়ও ঠিক এইরূপই মত (৩, ২৭)।

স্থানান্তরে দেখানো হইয়াছে একসময়ে ব্রাহ্মণাদির মৃতদেহ বহন করাতে কোনো বর্ণের বাছাবাছি ছিল না। শূদ্র দাসরাই তাহা বহন করিত। ক্রমে বাছাবাছি এতদূর হইল যে দ্বিজ পিতার শব শূদ্রকন্যার গর্ভজাত পুত্র বহন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত পুত্ররাই ব্রাহ্মণ পিতার শব বহন ও দহন করিতে পারিবে কিন্তু শূদ্রকন্যার সন্তান তাহাতে অনধিকারী (বিষ্ণু, ১৯, ৪) যদিও পিতার ও মাতার বহন ও দহন কার্য পুত্রেরই কর্তব্য (ঐ, ১৯, ৩)।

সবর্ণা ও অসবর্ণা পত্নীর সন্তানদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে অন্যান্য নানা জাতীয়া মাতার গর্ভজ সন্তানদের কিরূপ অশৌচ ঘটিবে তাহারও নানাবিধ ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভাবের হইয়া দাঁড়াইল (বিষ্ণুসংহিতা, ২২ অধ্যায়) উশনঃ সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত (৩৬-৩৯) হইয়াছে। শঙ্খ সংহিতারও এই মত (১৫, ১৬-১৮)।

এইখানে উশনার একটি কথা উল্লেখ করা উচিত। ব্রাহ্মণের যাহারা সেবক তাহারা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক, বা শূদ্র হউক সকলেরই ব্রাহ্মণের মত দশ দিনে অশৌচান্ত হইবে (৬, ৩৫)। ইহা না হইলে সংসারের কাজকর্মে অসুবিধা ঘটিতে পারিত। একই সংসারে নানা জনের নানা সময়ে অশৌচান্ত হইলে চলে কেমন করিয়া?

এতক্ষণ শাস্ত্রবিহিত অনুলোমবিধিতে অসবর্ণ বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে। প্রতিলোম তো শাস্ত্রমতে অচল। কিন্তু প্রাচীন কালের বহু দৃষ্টান্তে ও ঘটনায় তো তাহা মনে হয় না। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণ। তাঁহার কন্যা দেবযানী রাজা যযাতিকে প্রার্থনা করিলে যযাতি সংকুচিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিপ্রকন্যা। তোমার উপযুক্ত আমি নহি (আদিপর্ব, ৮১, ১৮)। দেবযানী বলিলেন, "হে নহুষপুত্র, ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত এবং ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট। যেখানে এমন ঘনিষ্ঠতা সেখানে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে

অনুচিত নহে—তুমি নিজেও ঋষি এবং ঋষির পুত্র অতএব আমাকে বিবাহ কর।"

> সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্।
> ঋষিশ্চাপ্যৃষিপুত্রশ্চ নাহুষাঙ্গ বহস্ব মাম্॥ আদি, ৮১, ১৯

যযাতি ও দেবযানীতে বহু তর্ক হইল। রাজা সুবিধা করিতে পারিলেন না, পরে শুক্রাচার্যও এই বিবাহে প্রসন্ন সম্মতি দিলেন।

> বৃতোঽনয়া পতির্বীর সুতয়া ত্বং মমেষ্টয়া।
> গৃহাণেমাং ময়া দত্তাং মহিষীং নহুষাত্মজ॥ আদি, ৮১, ৩১

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা বলিয়া এখানে দেবযানী প্রতিলোম বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রতিলোম বিবাহও হইল, কিন্তু শাস্ত্রে তো ইঁহাদিগকে এইজন্য নিন্দা বা একঘরে করা হয় নাই।

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মহর্ষিগণ রোমহর্ষণ সূতপুত্র উগ্রশ্রবার কাছে ভক্তিনত-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে ভাগবত শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে তৃপ্ত হইয়া তিনি ভাগবত শাস্ত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১ম, ২য় অধ্যায়)। তাহার পরে বলরাম নৈমিষারণ্যে গিয়া ঋষিগণ মধ্যে অত্যুচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য সূত রোমহর্ষণকে দেখিলেন।

> রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত। ২২
> অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্।
> অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রাংশ্চ কোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥ ২৩
> —ভাগবত, ১০, ৭৮, ২৩

এখানে শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন, "সূতম্ প্রতিলোমজম্।"

> ন কৃতং প্রহ্বণমঞ্জলিশ্চ যেন তম্। অধ্যাসীনঞ্চ তান্
> তেভ্যোঽপ্যুচ্চৈরাসীনমিত্যর্থঃ।—টীকা, ১০, ৭৮, ২৩

কাজেই দেখা গেল মহর্ষিগণের মধ্যে সূত রোমহর্ষণ যেমন পূজিত তেমনি প্রতিষ্ঠিত। কাজেই "প্রতিলোমজ" হওয়ায় তাঁহার কিছু ক্ষতি হইয়াছে এমন তো বুঝা গেল না।

স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র দেখিয়া মনে হয় শূদ্রকন্যা ও অন্ত্যজকন্যাকে বিবাহ করিলে বুঝি একেবারে অচল হইত। কিন্তু শান্তনুর ঔরসে ধীবরকন্যার গর্ভে জাত সন্তানেরাই তো সব কুরুপাণ্ডব। দ্রৌপদী যখন স্বয়ংবর-সভায় বরণীয়দের ভালমন্দ বিচার করিতেছেন তখন তো পাণ্ডবদের ক্ষত্রিয়ত্বে আপত্তি করেন নাই। অথচ

এই দ্রৌপদীই মহাবীর কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া বরণ করিতে অসম্মত। তখনকার দিনেও কি সামাজিক দোষ সত্ত্ব হইলেই ভয়ংকর আর পুরাতন হইলেই চলিত হইয়া যাইত?

যদিও তিনি কোনো প্রমাণ দেন নাই তবু আচার্য ঘুরে বলেন দশরথের স্ত্রী সুমিত্রাও শূদ্রকন্যা।[১] তাঁহার সন্তান তো ভরপুর ক্ষত্রিয়।

স্থানান্তরে বলা হইয়াছে ধর্মাত্মা ঋষি দীর্ঘতমা দাসীর গর্ভে কক্ষীব এবং চক্ষুষ নামে দুই মহাসত্ত্ব সন্তানের জন্ম দিলেন। (বায়ুপুরাণ, ৯৯, ৭০) এই দুইজনই ঋষি। এবং ইঁহারা বিবাহিত মাতার গর্ভে জন্মেন নাই।

যে অন্ধমুনির পুত্রবধে দশরথ এত মুহ্যমান হইয়াছিলেন তিনিও যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি শূদ্রকন্যার গর্ভে বৈশ্যপিতার সন্তান:

শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৩, ৫১

অর্থাৎ "হে নরবরাধিপ, আমি শূদ্রকন্যার গর্ভে জাত বৈশ্যের পুত্র।" অথচ তিনি একজন তপস্বী, তাঁহার মস্তকে জটাভার, বল্কলাজিন তাঁহার বসন (ঐ ৬৩, ২৮; ৬৩, ৩৬) দশরথ সেই "তপোধনের" প্রাণত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া একান্ত সন্তপ্ত:

স মামুদ্বীক্ষ্য সংত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ॥ ঐ, ৬৩, ৫২

তার পর বৃদ্ধ তাপস অন্ধমুনির কাছে এই দারুণ বার্তা লইয়া কেমন করিয়া যাইবেন, এই ভাবনায় দশরথ ব্যাকুল হইলেন। কৌশল্যার কাছে সেই পুরাতন কথা বলিতে গিয়া সেই অন্ধমুনিপুত্রকে দশরথ "মহর্ষি" বলিয়াই উল্লেখ করিলেন (অযোধ্যা-কাণ্ড, ৬৪, ১)। দশরথ কৌশল্যাকে বলিতেছেন, "আমার পদশব্দ শুনিয়া সেই অন্ধ "মুনি" বলিলেন, (৬৪, ৭) ইত্যাদি।..."সেই 'মুনি'কে তখন ভীতচিত্তে বলিলাম" (৬৪, ১১)। "আমার বাণে সেই 'তাপস'কে গতপ্রাণ দেখিলাম (৬৪, ১৬)। দশরথ সেই শূদ্রকন্যার পতি ও শূদ্রকন্যাকে "ভগবন্তৌ" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন (৬৪, ১৮)। দশরথ বলিলেন, যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিয়াছে, এখন "হে মুনি", আমার প্রতি প্রসন্ন হউন (৬৪, ১৯)। সেই "ঋষি" শাপে তখনই দশরথকে ভস্ম করিতে পারিতেন (৬৪, ২০) কিন্তু "মহাতেজা" তিনি বলিলেন, (৬৪, ২১), "তুমি যদি স্বয়ং আসিয়া এই বার্তা আমাকে না জানাইতে তবে হে রাজন্, তোমার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, সজ্ঞানে এই রকমে 'বানপ্রস্থকে' বধ করিলে সেই অপরাধ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও স্থান হইতে পাতিত

১ *Caste and Race in India*, Pp. 59, 80

করে (৬৪, ২২-২৩) 'তপস্তাপরায়ণ' 'ব্রহ্মবাদী' এমন 'মুনিকে' সজ্ঞানে অস্ত্রবিদ্ধ করিলে তোমার মাথা সপ্তখণ্ড হইয়া যাইত" :

সপ্তধা তু ভবেন্মূর্দ্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি।
জ্ঞানাদ্বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি ॥ ঐ, ৬৪, ২৪

দশরথ তাহার পর ভার্যাসহ সেই 'মুনি'কে পুত্রের কাছে লইয়া গেলেন (৬৪, ২৮)। "তপস্বী" পিতা তখন বলিতে লাগিলেন (৬৪, ২৯) "তোমার 'ধর্ম-পরায়ণা' মাতার দিকে চাহিয়া দেখ (৬৪, ৩১)। এখন হইতে আর কাহার 'মধুর শাস্ত্র-অধ্যয়ন' শুনিয়া প্রভাতে উঠিব (৬৪, ৩২)? কে আর 'স্নাত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া 'হুতহুতাশন' হইয়া আমাকে স্নান করাইবে (৬৪, ৩৩)? 'স্বাধ্যায় ও তপস্যায়' যে গতি লাভ হয় তাহা তুমি প্রাপ্ত হও (৬৪, ৪৩)। আমাদের এই (তপস্বীদের) কুলে জাত কেহ অধোগতি প্রাপ্ত হয় না (৬৪, ৪৫)।"

তাহার পর অন্ধমুনি দশরথকে বলিলেন, "যেহেতু ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞানে এই 'মুনি'কে তুমি বধ করিয়াছ তাই, হে রাজন্, এখনই 'ব্রহ্মহত্যা' তোমাকে লাগিতেছে না।

অজ্ঞানাৎ তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ।
তস্মাৎ ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥ – ৬৪, ৫৫

অর্থাৎ জ্ঞানকৃত হইলে, শূদ্রকন্যার গর্ভজাত বৈশ্যতাপসপুত্রের হত্যায় ক্ষত্রিয় দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইত। এই তপস্বী কুমারের শাস্ত্রাধ্যয়নধ্বনি শুনিয়া পিতামাতা ব্রাহ্মমুহূর্তে আনন্দিত হইতেন, কৃতস্নান এই তাপস সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া পিতার সেবাতে নিযুক্ত হইতেন। ইহাকে না জানিয়া বধ করাতেই দশরথের ব্রহ্মহত্যাপাপ ঘটিল না, নহিলে ঘটিত। অথচ ইনি তো শূদ্রমাতার পুত্র, পিতাও বৈশ্য।

এখন এই প্রশ্ন মনে আসে এই দশরথের পুত্র মহাত্মা রাম কি সত্যই উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত শুধু শূদ্র এই অপরাধে একজন তপস্বীকে সজ্ঞানে শিরশ্ছেদ করিয়াছেন? এক ব্রাহ্মণের পুত্র অকালে মারা গেল। (রামায়ণ, বোম্বাই, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, উত্তর-কাণ্ড, ৭৩, ৮) ব্রাহ্মণ ধরিয়া পড়িলেন কোন্ পাপে এই অকালমৃত্যু ঘটিল, তাহা দেখিয়া প্রতিকার করিতে হইবে। রাম গিয়া দেখিলেন, এক তপস্বী তপস্যায় রত (৭৫, ১৪)। তাপস বলিলেন, আমি শূদ্র, শম্বূক আমার নাম (৭৬, ৩)। এই কথা শুনিতেই রাম তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন (৭৬, ৪)। স্বর্গ হইতে এই পুণ্যকর্মে দেবতারা মুহুর্মুহুঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন (৭৬, ৫), পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল (৭৬, ৬) ইত্যাদি।

উত্তরকাণ্ডের অনেক কথাই পণ্ডিতজনেরা তেমন বিশ্বাস করেন না, কারণ তাহা রামায়ণের গায়ে পরে জুড়িয়া দেওয়া। কিন্তু আমরা সেই কথা বলি না, আমরা বলি অন্ধমুনিপুত্রও সেই হিসাবে 'তপোধন' 'ব্রহ্মবাদী' হইবার উপযুক্ত নহেন। অন্ধমুনিপুত্রবধকথার সঙ্গে রামের এই শম্বূকবধকথা মিলাইয়া দেখিলে কি মনে হয়?

এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণে এই শম্বূক উপাখ্যানের উল্লেখই করেন নাই। তবে এইরূপ কাহিনী যে প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায়, রামচন্দ্র স্থাপিত রামটেক শিলালেখ হইতে। শিলালেখটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর। তাহার ৪৫শ পংক্তি দ্রষ্টব্য।[১]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এক শূদ্র তাপসের কথা পাওয়া যায়। তপস্বী নরিষ্যন্তকে রাজা বপুষ্মান হত্যা করিলে নরিষ্যন্তপত্নী ইন্দ্রসেনা সেই "শূদ্রতাপস"কে নিজপুত্র দমের নিকট এই সংবাদ দিতে প্রেরণ করিলেন (১৩৪, ২০-২১)। সেই "শূদ্রতাপস" গিয়া রাজা দমকে পিতৃহত্যার সংবাদ দিলেন (১৩৫, ১)। দম আপন পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই শূদ্র তপস্বী যাহা বলিলেন, তাহা সকলে শুনিলেন তো?"

শ্রুতং ভবদ্ভির্যৎ প্রোক্তং তেন শূদ্রতপস্বিনা। —১৩৬, ৩

এই শূদ্র তপস্বীর পাপে তো পৃথিবী রসাতলে যাইতে বসে নাই, তপস্বীকে সেই জন্য প্রাণদণ্ড দিবারও প্রয়োজন হয় নাই।

স্কন্দপুরাণে আবন্ত্য খণ্ডে (রেবা খণ্ডে) এক ভক্ত শবরের কথা পাওয়া যায় (৫৬, ৫৯)। সস্ত্রীক শবর খাদ্য-অন্বেষণে চৈত্র শুক্লা একাদশীতে শূলভেদ তীর্থে আসিয়া বহু আশ্রমবাসী ঋষিগণকে ও মুনিসঙ্ঘকে দেখিলেন (৫৬, ৬৭-৬৮)। পুণ্যাহের কথা জানিয়া শবর দেবশিলার কাছে গিয়া কুমুদের দ্বারা জনার্দনকে পূজা করিলেন (৫৬, ৮২)। উপবাস ব্রত সাঙ্গ করিয়া সেই শবরভক্ত শ্রীফল লইয়া যথাবিধি হোম করিয়া, দেবতা নমস্কার করিয়া স্ত্রীর সহিত ভোজন করিলেন—

গৃহীত্বা শ্রীফলং শীঘ্রং হোমং কৃত্বা যথাবিধি। —১৩৩
সব দেবান্ নমস্কৃত্য ভুক্তোঽপি চ তয়া সহ। —ঐ, ১৩৪, ৫৬ অধ্যায়

ভক্ত শবরের পক্ষেও তো সেই ঋষিমুনিসঙ্ঘসেবিত মহাতীর্থে যথাবিধি বিষ্ণু-পূজা ও হোম করা চলিল।

পুরাণে নানাস্থানে শূদ্র ও অন্ত্যজদের তপস্যার কথা জানা যায়। বিশেষতঃ শিব-রাত্রি প্রভৃতি ব্রত ব্যাধাদির পূজা হইতেই উদ্ভূত, ইহাতে তখনকার দিনে কেহ তো

১ *Epigraphia Indica*, Jan, 1939, p. 17

আপত্তি করেন নাই। হীনবর্ণের লোকের তপস্যাও অনেক দেখা গিয়াছে কিন্তু উত্তররামচরিতে বর্ণিত ব্রাহ্মণটির মত তাহাতে অভিযোগ করিবার মত কাহাকেও দেখি না এবং রামের মতও তাহার শিরশ্ছেদকারী ধর্মরক্ষকও দেখা যায় না।

এই সব তো সাধারণ তপস্যা, যাগ যজ্ঞে পর্যন্ত দেখা যায় এমন সব পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন যাঁহাদের মাতৃগণের মধ্যে অনেক অব্রাহ্মণ থাকিতেন। এই কথা এখনই লাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্র ও দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র হইতে দেখান যাইতেছে।

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে দেখা যায় মাতা পাতিব্রত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে সেই দোষ ক্ষালন করিবার জন্য যজ্ঞকালে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। অথচ মন্ত্রপাঠকেরা সমাজের ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের হোতার দল। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (১, ৯, ৯), আপস্তম্ব মন্ত্রপাঠে (২, ১৯, ১) ও হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রে (২, ১০, ৭) সেই একই কথা। এমন কি মনু পর্যন্ত সেই মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৯, ২০) কাজেই বুঝা যায় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হইতে হইলে যে জন্ম বিশুদ্ধই হইবে তাহার কোনো হেতু নাই। তাই কাঠক সংহিতাতে ব্রাহ্মণের পিতামাতার খবর জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রে ও দৈবকর্মে ব্রাহ্মণ-পরীক্ষা নিষিদ্ধ ছিল (শঙ্খসংহিতা ১৩, ১)

এখানে বাহুল্যভয়ে নানা স্থান হইতে মূল উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইয়া সুধু দশপেয়-যাগপ্রকরণে দ্রাহ্যায়ণ ও লাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের সম্পর্কিত একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাউক যে অব্রাহ্মণীর সন্তানেরাও পৌরোহিত্য লাভের অনধিকারী হইতেন না।

লাট্যায়ণীয় শ্রৌতসূত্রে দশপেয় যাগ প্রকরণে (৯ম প্রপাঠক, ২য় কণ্ডিকা, ৫-৭) বিধি দেখা যায় যে দশজন পুরোহিত সোমচমস পান করিবার পূর্বে প্রত্যেকে নিজ নিজ "পিতৃপিতামহক্রমে দশজন পূর্বপিতৃগণের ও মাতাপিতামহীক্রমে দশজন পূর্বমাতৃগণের নাম উচ্চারণ করিয়া যাইবেন। মাতৃগণের মধ্যে যদি এমন কারও নাম আসিয়া পড়ে যিনি ব্রাহ্মণকন্যা নহেন তবে ব্রাহ্মণকন্যাদের নামের দ্বারাই দশটি সংখ্যার উচ্চারণ পূর্ণ করিবেন। যদি নাম স্মরণে না থাকে তবে যেখান হইতে স্মরণ থাকে সেখান হইতেই স্মরণ করিবেন। এইরূপ বিধিই বলা হইয়াছে।"

তে দশমাত দর্শ পিতৃন্ ইত্যাখ্যায় প্রসর্পেয়ুরাদশমাৎ পুরুষাদ্ ইতি আহ ॥—৯, ২, ৫
যত্র অব্রাহ্মণীম্ অধিগচ্ছেয়ুর্ ব্রাহ্মণ্যৈবাভ্যাসং দশমম্পূরয়েয়ুঃ ॥—৯, ২, ৬
অস্মরন্তশ্চ যতঃ স্মরেয়ুঃ ॥ —৯, ২, ৭

১ অগ্নিস্বামিবিরচিত লাটায়ণাচার্য প্রণীত শ্রৌত্যসূত্র, পৃ. ৬২৪, ৬২৫, আনন্দবেদান্তবাগীশ-কৃত, প্রথম সংস্করণ।

দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রেও দশপেয়যাগপ্রকরণে এই বিধিই দেখা যায়।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় অব্রাহ্মণীর সন্ততি ব্রাহ্মণই হন এবং তাঁহাদের পৌরোহিত্যও বৈধই থাকে। কাজেই লাট্যায়ন-দ্রাহ্যায়ণের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ যে রীতিমত প্রচলিত ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। অন্ততঃ পণ্ডিত শামশাস্ত্রী তাঁহার Evolution of Castes গ্রন্থে এইরূপ মনে করিয়াছেন।[১]

১ p. 4

বর্ণের বিশুদ্ধি : বৈজ্ঞানিক বিচার

একসময় জাতি হয়তো বর্ণের দ্বারাই স্থাপিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু নানা জাতি একসঙ্গে এতকাল বাস করার ফলে আর কি বর্ণের বিশুদ্ধি কথাটার উপর বেশি জোর দেওয়া চলে? যে মনোবৃত্তির উপর জাতির বিশুদ্ধি নির্ভর করে সেই মনোবৃত্তিটি মানুষের কত উদ্দাম এবং তাহার কাছে মানুষ কত নিরুপায় তাহা এখনকার ও প্রাচীন কালের পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত লোকচরিত্র দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। শাস্ত্রপুরাণে দেবচরিত্র মুনিঋষিগণের চরিত্রও সেই দোষ হইতে কিছুমাত্র মুক্ত নহে। এখনকার দিনে যে "জাতি" বস্তুটা "বর্ণের" উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা বুঝি "কালো বামুন কটা শূদ্র" প্রভৃতি চলতি কথায়।

ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট দেখিলে দেখা যায় ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকল জাতিরই চেহারা প্রদেশ ভেদে ভিন্ন রকমের। দ্রবিড়বহুল দেশে তাহা দ্রবিড়রূপের সহিত মিশ্রিত, শকবহুল দেশে তাহা শকরূপের সহিত মিশ্রিত, মোঙ্গলবহুল দেশে মোঙ্গল রূপ মিশ্রিত ইত্যাদি। [১]

উত্তর-পশ্চিম ও বেহারের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের চেহারায় বেশি মিল নাই। বরং মহারাষ্ট্র চিৎপাবন ও শেন্‌বী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মিল বেশি। ইহা দ্রবিড়তার সাক্ষী। বাঙালীদের বিবাহে শাঁখার প্রয়োজনটাও এই কথায় সমর্থক।[২] বাংলা দেশে চণ্ডালে ও ব্রাহ্মণে চেহারায় যতটা মিল ততটা মিল বাংলা দেশের ব্রাহ্মণে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণে নাই। Mr. Risley এবং Dr. Wise এর কথা উদ্ধৃত করিয়া ক্যাম্পবেল সাহেব বলেন যে বাংলাদেশের চামারদের চেহারা অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণের চেহারা হইতে অধিক আর্যজনোচিত।[৩] চামারদের চেহারা বহু ব্রাহ্মণ হইতে যে আর্যজনোচিত তাহা তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন।[৪]

গণিতের সংখ্যাতে বাঙালী ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে তফাত মাত্র ১.১১, অথচ উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণের তফাত ৩.৮৯।[৫]

১ *Census of India*, 1921, vol. i

২ *Caste and Race in India*, pp. 120-121

৩ *Indian Ethnology*, vol. ii, p. 293

৪ *Ibid*, p. 271

৫ *Caste and Race in India*, p. 121

মাথা ও নাকের প্রমাণ যদি ধরা যায় তবে এদেশে বিশুদ্ধ আর্য পাওয়া কঠিন।[১] অবশ্য এই সব মাপ চূড়ান্ত প্রমাণ না-ও হইতে পারে।

পূর্বকালে সমাজে এক জাতি হইতে অন্য জাতি হওয়াটা সদাসর্বদাই ঘটিত তাহা স্থানান্তরে দেখানো গিয়াছে। এখন সমাজে তেমন প্রাণশক্তি না থাকিলেও দেখা যায় পূর্ববঙ্গে অনেক ভদ্রজাতির সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া যান।[২]

ভারতের সর্বত্রই দেখা যায় কোনো হীন বংশ হইতে কেহ রাজা হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করেন। ব্রাহ্মণেরাও নানা কারণে অনেক সময় তাহা সমর্থন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহা হয়তো দানদক্ষিণার লোভবশত। কিন্তু শিবজী প্রভৃতি বীরদের ক্ষেত্রে তাহা উচ্চতর রাজনীতিগত উদ্দেশ্য হইতে সমর্থিত হইয়াছে।

কোচ তিপরা গারো ডালু হাজং প্রভৃতি বহু জাতি বহুকাল ধরিয়া এই দেশে জল-অনাচরণীয় ছিল। এখন সেই সব জাতির লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। সংখ্যা ও প্রতিপত্তির গুণে ও এখনকার দিনের শিক্ষাদীক্ষাগত পরিবর্তনের প্রভাবে তাঁহাদের দাবী এখনকার সমাজ অনেকটা মানিয়া লইয়াছে।[৩]

প্রায়ই দেখা যায় ভারতের প্রাচীন আর্যভূমি হইতে যেই সব প্রদেশ যত দূরে ততই সেখানে আর্যরক্ত ক্ষীণ এবং নানা জাতির সঙ্গে রক্ত-সংমিশ্রণ বেশি।[৪] অথচ ধর্মের গোঁড়ামি ও সামাজিক মতের সংকীর্ণতা সেই সব প্রদেশে ততই অধিক।

বঙ্গদর্শনে (১২৮৪, মাঘ) পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় মণিপুরের বিবরণ নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে দেখা যায় বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা সেই দেশে গিয়া তদ্দেশীয় কন্যার গর্ভে যে-সব সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন তাঁহারাই এখন বাঙালী পিতার নামানুসারে বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী ঘোষ বসু দত্ত প্রভৃতি নামে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন (পৃ. ৪৭১)। ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর ও মাইজখাড়ের ঘোষবংশীয় পদ্মলোচনের পুত্র কবিচন্দ্র মণিপুরে কোনো ক্ষত্রিয়কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া যে বংশ সৃষ্টি করেন তাহাই এখন সেখানকার দক্ষিণরাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশ। ত্রিপুরায় তাঁহাদের জ্ঞাতিবংশ এখনও বর্তমান (পৃ. ৪৭১)।

১ *Census of India*, vol. i.
২ *Ibid*, vol. vi, p. 351
৩ *Ibid*, p. 360
৪ *Ibid*, p. 363

এইরূপ মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা হইলে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর হাতে তাঁহারা খান না। সন্তানেরা কিন্তু ব্রাহ্মণই হন। তাঁহাদের অন্ন পিতাও খাইতে পারেন (পৃ. ৪৭১)। এই প্রথা পঞ্জাব হিমালয় প্রদেশেও দেখা যায়।

মণিপুরে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আরিবম (পূর্বাগত) ও আনৌবম (নবাগত) এই দুই ভাগ আছে। নবাগতদের মাত্র পিতা-পিতামহ মণিপুরে যান, এখনও তাঁহাদের মধ্যে বাংলা কথার কিছু অবশেষ আছে। মণিপুরের যাহারা ক্ষত্রিয় তাহারাই সেখানকার আদিম ও প্রকৃত মণিপুরী। হিন্দু হইয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি বাঙ্গালীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন (পৃ. ৪৭২)। অথচ এই নবদীক্ষিত হিন্দু মণিপুরীদের আচারবিচারের কড়াকড়ির তুলনা নাই।

মণিপুরী কোচ গারো ডালু হাজং প্রভৃতি জাতির লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নিজেদের পরিবর্তন সাধনও করিতে পারিয়াছেন।[১] নিম্ন-আসামে কাছাড়ীরা বিপ্রগুরুর শরণ লইয়া "শরণীয়া" নাম গ্রহণ করে। তাহার পরে তাহারা হয় "সরু কোচ", তাহার পর "বড় কোচ", তাহার পর তাহারা কোচদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।[২] একবার কোচ হইতে পারিলেই রাজবংশী নাম লইয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করা তাহাদের পক্ষে সহজ হয়।

মণিপুরী প্রভৃতি জাতির কথা ও অনেক জাতির উচ্চতর হইবার চেষ্টার কথা স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। এই সব অনেক অনার্য শ্রেণীর মধ্যে পূর্বে বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, মৃগয়া করিয়া বন্যবরাহ প্রভৃতি শিকার করা চলিত ছিল। বেশি বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেরা নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিত। এখন তাহারা আর্য হইতে গিয়া বিধবাবিবাহ ছাড়িয়াছে অথচ যৌবনবিবাহস্থলে ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হওয়ায় বালবিধবাদের বাহুল্যে ইহাদের নৈতিক অধোগতি ঘটিয়াছে। মৃগয়া ও মাংসাহার প্রভৃতি ত্যাগ করাতে শারীরিক বল-বীর্য কমিয়া যাইতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার স্থলে পর্দা-প্রথা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও স্ত্রীশিক্ষার পথ বাধাগ্রস্ত হইতেছে।[৩] উচ্চ হইবার আর একটি মহা উপায় হইল অন্য জাতির লোককে ঘৃণা করা ও তাহাদের স্পর্শ ও ছোঁয়া-ছুঁই পরিহার করা। তাহা করিয়াই উচ্চতর বর্ণের দাবি সকলে করিতেছে।[৪] উচ্চ হইবার দুরাশা তো কম কথা নহে।

১ *Census of India,* 1901, vol vi, p. 353
২ *Census of India,* 1931, vol. iii, , Part i, p. 221
৩ *Census of India,* 1921, vol. i, Pp. 162, 233
৪ *Ibid,* p. 529

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার

জাতি ও কুল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে অন্যের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হয়। কিন্তু এইরূপ চেষ্টা মনে হয় ভারতে আর্যজাতীয়েরাই প্রবর্তিত করেন নাই। দ্রাবিড় এবং দ্রাবিড়-পূর্ব জাতিরাও এই ভাবেই নিজ নিজ সংস্কৃতি বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। সেই পদ্ধতিটি আর্যেরা তাঁহাদের কাছেই হয়তো পাইয়াছিলেন। এই কথা মনে হয় এইজন্য যে এখনও এই সব প্রাচীন আর্যভূমিগুলি হইতে অনার্যভূমিতে ও আর্যেতর জাতিগুলির মধ্যেই ছোঁয়াছুঁইর বিচার অনেক বেশি তীব্র।

নায়ার জাতি হইতে তিয়াঁরা বারো পদ দূরে থাকিতে বাধ্য। পুল্যরোরা কাছেও আসিতে পারে না। শূদ্রের বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে স্থিত জলাশয় ব্রাহ্মণের স্নান-পানের অযোগ্য।[১] ইলাবন বা শানাররা চব্বিশ পদ দূরে থাকিবে। পুল্যরের স্পর্শে ব্রাহ্মণকে সচেল স্নান করিতে হয়।[২] দক্ষিণ ভারতের লোকগণনা কর্মে নিযুক্ত পণ্ডিতের দল নানাস্থান হইতে এই বিষয়ে অনেক খবর দিয়াছেন।

নিম্নজাতির মধ্যে এই ভেদ এত সাংঘাতিক যে তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। পুল্যর জাতির কোনো লোককে যদি কোনো পারিয়া জাতির লোক স্পর্শ করে তবে পঞ্চবার স্নানে ও অঙ্গুলি হইতে রক্তমোক্ষণে পুল্যর শুদ্ধ হইতে পারে। কুরিচ্চন জাতি যদি অন্য কোনো নীচ জাতির দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তবে শুদ্ধির ব্যবস্থা আরও ভীষণ। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চজাতির লোকদের অপেক্ষা নিম্নজাতির লোকদের মধ্যেই ইহার তীব্রতা অধিক।

দক্ষিণ-ভারতে উল্লাদন জাতি যদি চল্লিশ হাতের মধ্যে আসে তবে শূদ্রও অশুচি হয়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির তো কথাই নাই।[৩] নায়াদি জাতি দুই শত হস্তের মধ্যে আসিলে সকলে অশুচি হয়।[৪] তাহাদিগকে কিছু ভিক্ষা দিলে দূরে মাটিতে রাখিয়া সরিয়া গেলে তাহারা ভয়ে ভয়ে আসিয়া তাহা লইয়া যায়।[৫]

১ *Indian Castes*, vol. ii, p. 74
২ *Indian Castes*, vol. ii, p. 75
৩ *Castes and Tribes of Southern India*, vol. vii, p. 220
৪ *Ibid*, vol. v, p. 275
৫ *Ibid*, p. 274

পারায়া জাতি যেমন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণেরাও তেমনি পারায়া জাতির অস্পৃশ্য। পারায়া বা হোলেয়া জাতির পাড়ার মধ্য দিয়া গেলে ব্রাহ্মণকে মার খাইতে হয়, পূর্বে কখনও কখনও প্রাণও দিতে হইত। তাহারা পরে গোময় দিয়া পল্লী শুদ্ধ করিত।[১]

পরস্পরে এই যে বিদ্বেষ তাহার হেতু এক-একসময় অতি চমৎকার। মাদ্রাজ-প্রদেশে কাপু জাতীয় লোকের সংখ্যা সব জাতি অপেক্ষা অধিক। তাহাদের মধ্যে নারীরাই প্রধান। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি পাণ্ডবদের জারজ কন্যাদের বিবাহ করে। ইহাদের কোনো কোনো শাখা নর্তকীর সন্তান।[২] ইহাদের মধ্যে নারীরাই প্রধান ও স্বতন্ত্র। বিধবাবিবাহও কোনো কোনো শাখায় চলে।[৩]

ইহাদের এক শাখা "য়েরলম্ম" কাপুরা অত্যন্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। তাহার হেতুটি জানিবার যোগ্য। এক ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া কুমারী কন্যাকে রাখিয়া ব্রাহ্মণ পরলোক গমন করিলেন। এই অপরাধে কন্যার আত্মীয়রা বিনাদোষে কন্যাটিকে জাতিচ্যুত করিল। এক কাপু দয়া করিয়া কন্যাটিকে গৃহে স্থান দিল ও বিবাহ করিল। সেই সন্ততিই "য়েরলম্ম" কাপু। ইহারা অত্যন্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। ইহারা বলে যে, ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আছে কিন্তু হৃদয় নাই। নহিলে কি বিনাদোষে এমন করিয়া একটি অসহায় মেয়েকে কেহ জাতিচ্যুত করিতে পারে? ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট কোনো বস্তু ইহারা খায় না, কোনো অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে ডাকে না, বিবাহে হোম হয় না, কারণ তাহাতে ব্রাহ্মণ ডাকিতে হয়। বৃদ্ধা পুরন্ধ্রীরাই কল্যাণ কর্ম করিয়া বরকন্যাকে বিবাহযুক্ত করেন।[৪]

বাংলাদেশে কালাপাহাড়ের বিদ্বেষের মূলেও এইরূপই হেতু ছিল। পাঞ্জাবের কালামিহিরের গল্পও অনেকটা সেইরকম। ব্রাহ্মণেরা তাহার প্রতি অন্যায় করাতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শোধ সে লয়। তাহার পূর্বনাম ছিল জয়মল। তাহার কবরের কাছে ব্রাহ্মণেরা যাইতেও পারে না।[৫]

হোলেয়রা অতি নীচ জাতি, ব্রাহ্মণের স্পর্শে তাহাদের গৃহ একেবারে অশুচি

১ *Castes and Tribes of Southern India*, vol. vi, p. 88

২ *Ibid*, iii, pp. 245, 247

৩ *Ibid.*, p. 241

৪ *Ibid*, iii, p. 229-230

৫ *Glosary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W. F. Province*, vol. iii, p. 425.

হয়, ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে পারিয়াও অশুচি হয়।[১] তাহাদের পল্লীতে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণকে তাহারা কিছুদিন পূর্বেও মারিয়া ফেলিত। উড়িষ্যার কুন্তীপটীয়ারা সবার হাতে খায় ও সকলকেই ছোঁয়; কিন্তু ব্রাহ্মণ, রাজা, ধোপা ও নাপিত তাহাদের অস্পৃশ্য। অনেক নীচজাতি আছে যাহাদের কাছে ব্রাহ্মণদের স্পর্শ ও অন্ন অশুচি।

এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত এই ভেদবুদ্ধি কি আর্যরা ভারতে আমদানি করিলেন? অন্যান্য দেশেও তো আর্যজাতির নানা শাখা আছে তাহাদের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি কি আছে? যদি থাকে তবে তাহার উগ্রতা কতদূর? যে-দেশ দিয়া আর্যরা ভারতে আসিলেন সেই পঞ্জাবে কি এই ভেদবুদ্ধি বেশি তীব্র, না দূরতম দক্ষিণাদি প্রদেশে ইহা বেশি তীব্র? আর্যদের এই দেশে আসার সময় অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগে এই ভেদটা কি বেশি তীব্র ছিল না ক্রমে ইহা উত্তরোত্তর তীব্র হইয়াছে?

আর্যদের ভারতে আসিবার সময় জাতিভেদ যদি না থাকে বা মৃদুভাবে থাকে ও পরে তীব্র হয়, অথবা প্রাচীন আর্যভূমিতে যদি জাতিভেদ কম উগ্র থাকে তবে সন্দেহ হইতে পারে হয়তো এই প্রথা আর্যরা ভারতে আমদানি করেন নাই। এই বস্তুটি তাঁহারা পাইয়াছেন এই দেশে আসিয়া।

প্রাচীন গ্রীসে রোমে ও জার্মানদের মধ্যে আভিজাত্য ছিল কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের মধ্যে কিন্তু ঠিক এইরূপ জাতিভেদ নাই, পার্সীরাও তাহা মানেন না। দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যে নীচ জাতি গেলে বা নীচপাড়ায় ব্রাহ্মণ জাতি গেলে খুনাখুনি হয়। নায়ারের কন্যা লইয়াই দক্ষিণে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা সংসার করেন কিন্তু নায়ারকে ছুঁইলে ব্রাহ্মণদের অশুচিত্ব ঘটে। কাম্মালনেরা (ছুতার, মিস্ত্রী, কামার) ষোলো হাত দূরে থাকিলেই ব্রাহ্মণ অশুচি হন। তাড়িপ্রস্তুতকারী জাতি চব্বিশ হাত দূরে থাকিলে, পালয় বা চেরুমা কৃষক বত্রিশ হাত দূরে থাকিলে, পারিয়া চল্লিশ হাত দূরে থাকিলেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দূষিত হন। ব্রাহ্মণাদি জাতির জলাশয়ের নিকট দিয়াও যদি নিম্নবর্ণের কেহ যায় তবে সেই সব জলাশয় অব্যবহার্য্য হইবে। দক্ষিণের বৈষ্ণব রামানুজী সম্প্রদায়ের পাকক্রিয়া বা অন্ন কেহ দেখিলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চনদ প্রভৃতি আর্যপ্রধান প্রদেশে তো এরূপ তীব্রতা নাই। অনার্যপ্রধান দক্ষিণভারত প্রভৃতি প্রদেশেই ইহার তীব্রতা অধিক। উচ্চবর্ণের অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যেই এই তীব্রতা ভয়ঙ্কর। এখন শিক্ষাদীক্ষার গুণে মনের উদারতার

১ *Mysore Tribes aud Castes*, vol. iii, p. 344.

হেতুতে এবং বর্তমান যুগের নানা তাগিদে ভারতের উচ্চবর্ণের লোকের যদি বা এই ভেদবুদ্ধি একটু শিথিল করিতে উৎসুক হয় তবু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে পরস্পর ভেদ তাহা একটুও শিথিল করা অসম্ভব। এমন অনেক স্থান দেখা গিয়াছে যেখানে ব্রাহ্মণাদি জাতির যুবকেরা সামাজিক সংস্কারকার্যে লাগিতে গিয়া যখন নিম্নজাতির কাহারও ভাত খাইয়াছে তখন যাহার হাতে সেই ব্রাহ্মণ ভাত খাইয়াছে সেও আর তাহার হাতে খাইবে না। বলে, "তুমি যখন আমার হাতে খাইয়াছ, তখন আমার অপেক্ষা অনেক নীচ জাতির অন্নও নিশ্চয় খাইয়াছ। কাজেই তোমার হাতে খাই কেমন করিয়া ?"

বর্তমান অস্পৃশ্যতা আন্দোলন আরম্ভ হইয়া বহুপূর্বেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে অস্পৃশ্যতা মানা হইত না। ১৯০৮ সালে আসিয়া দেখি এখানে ভৃত্যরা সবাই প্রায় হাড়ি ডোম। শান্তিনিকেতনের কেহ কেহ অন্নজল-বিচার বাঁচাইয়া চলিলেও অধিকাংশ লোকই তাহাদের হাতে খান। আমার বাড়িতে দশ-বারো বৎসর পূর্বে একটি ক্রিয়া উপলক্ষে কয়েকটি গরিব মুচি আসিয়া ভাত চাহে। তখন দেশে বড় অন্নকষ্ট। আমার হাড়ি-ডোম জাতীয় ভৃত্যেরা মুচিকে বাড়ির মধ্যেই প্রবেশ করিতে দিবে না। আমরা নিজে তাহাদিগকে রান্নাঘর হইতে উদ্বৃত্ত অন্ন নিয়া খাইতে দিলে, সেই সব হাড়ি-ডোম ভৃত্যগণ আমার রান্নাঘরের সব অন্নজলই তাহাতে অশুচি হইয়াছে বলিয়া সেইদিন আমার রান্নাঘরের খাওয়া বন্ধ করিল।

এই সব দিক বিচার করিয়া মনে হয় এই প্রথাটি খুব সম্ভব আর্যেরা ভারতে লইয়া আসেন নাই। এখানে আসিলে আর্যদের মধ্যে এদেশীয় নানাজাতির লোকের মধ্যে পূর্ব হইতে ভেদবিভেদ চলিতেছিল তাহার প্রভাব আসিল। তাঁহারা তাহা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব বহুকাল পর্যন্ত তাঁহারা ইহা স্বীকার না করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন কিন্তু পরিশেষে সংখ্যার বাহুল্যের কাছে তাঁহাদের হার মানিতে হইয়াছে। এখন তাঁহাদের মনেও এই জিনিসটা এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাঁহারা ইহাকেই তাঁহাদের বর্ণগত শ্রেষ্ঠতার প্রধান প্রতিষ্ঠা মনে করেন। এই কথা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের যে সব পূর্বপুরুষ মহর্ষিদের নামে তাঁহাদের এই আভিজাত্য সেই সব মহর্ষিরাও এমন করিয়া অন্নজলের বিচার করেন নাই।

যাঁহারা মনে করেন উচ্চবর্ণের লোকেরাই জাতিভেদের দ্বারা নিম্নবর্ণদের দাবাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা উচ্চবর্ণের লোকদের বরং সহজে এই ভেদ ত্যাগ করাইতে পারিবেন কিন্তু তাহাতে নিম্নবর্ণের লোকেরা বিন্দুমাত্রও টলিবে না, বরং সেই সব

উচ্চবর্ণীয় লোকেরা জাতিভেদ ত্যাগ করাতে নিম্নবর্ণের লোকের পক্ষেও অনাচরণীয় হইবেন। এই সব আমাদের বহু দুঃখের অভিজ্ঞতা। তখনই মনে হয় এই জাতিভেদ প্রথাটা আর্যদের আমদানি নহে ইহা অনার্যদের কাছেই আর্যরা পাইয়াছেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতে আর্যদের আসিবার পর যতই সময় অতীত হইয়াছে জাতিভেদ ততই উগ্র হইয়া চলিয়াছে। আর্যদের মূলস্থান হইতে উপনিবেশগুলি সরিয়া গিয়া অনার্যদের মধ্যে যতই আর্যেরা গিয়া পড়িয়াছেন ততই তাঁহাদের মনে এই ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া চলিয়াছে।

জাতিভেদের সর্বপ্রধান অবলম্বন স্মৃতি। স্মৃতিকারদের মধ্যে মুখ্য স্থান মনুর। তিনি বেদ হইতে বহু পরের লোক, এবং আচার্য কেতকরের মতে তিনি মগধদেশ-বাসী। তাঁহার History of Caste in India গ্রন্থের ৬৬সংখ্যক পৃষ্ঠায় তিনি তাঁহার যুক্তি দেখাইয়াছেন। মনুর স্থান যেখানেই হউক, কাল বেদের অনেক পরের। তাঁহার বিধিনিষেধের মধ্যে আর্যদের যে রীতিনীতি দেখা যায় তাহা অনেক পরবর্তী যুগের।

প্রাচীন কালে জাতিভেদ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল তখন বিবাহে ও অন্নজল-গ্রহণে এখনকার দিনের মত কড়াকড়ি অজ্ঞাত ছিল। ক্রমে তাহা যে কেমন করিয়া দিনে দিনে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া চলিল তাহা বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই দেখা যায়।

সোমদেব-রচিত কথাসরিৎসাগরে (২২শ তরঙ্গ) জীমূতবাহনের কথাতে বণিক বসুদত্ত উপকারী শবররাজের সঙ্গে বহুদিন নিজগৃহে বাস করেন ও তাঁহাকে নিজের কাছে দীর্ঘকাল সম্মানের সহিত রাখেন ও সেবা করেন।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ আয়ার মহাশয়ও দেখাইয়াছেন[১] আমাদের দেশে কি করিয়া জাতিভেদ প্রথাটি প্রথমে আবির্ভূত হইল এবং ক্রমে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইল। তিনি বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধ যুগে জাতিভেদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া ক্রমে বৈশ্যদের সামাজিক দুর্গতির বিচার করিলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে পরবর্তী সব সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া লিখিলেন:

"বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল ভ্রূণাবস্থায়। ব্রাহ্মণ ও পুরাণ যুগে তাহার উৎপত্তি। ক্রমে এই জাতিভেদের পসার ও প্রভাব বাড়িয়া চলিল। চারিদিকের অবস্থার যোগে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা সহজে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং এখনও ইহা দিনে দিনে আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া চলিয়াছে।"[২]

১ *Mysore Tribes and Castes,* vol. i, pp. 128-159

২ *Ibid,* pp. 154-155

১৩

জীবজন্তু বা বৃক্ষলতার নামে আত্মপরিচয়

আর্যপূর্ব বহু জাতি আপন আপন পরিচয় দিত কোনো জীবজন্তু বা বৃক্ষলতার নাম দিয়া। নাগ ও সুপর্ণদের কথাতে পরে তাহা আরও পরিষ্কার হইবে। পৃথিবীর নানাদেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে এক-একটি জাতির একটি-একটি বিশেষ চিহ্ন বা লাঞ্ছন দেখা যায়। সেই চিহ্নগুলি প্রায়ই কোনো জীবজন্তু বা বৃক্ষলতাপুষ্পাদি। যে জাতির যাহা আপন আপন লাঞ্ছন বা আত্মপরিচয়ের বস্তু তাহাকে সেই জাতির মানুষেরা গভীরভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। ইংরেজিতে ইহাকে Totem বলে। বাল্যকালে রামায়ণে বানর ভল্লুক প্রভৃতিদের মানুষোচিত ব্যবহারে মনে বিস্ময় জন্মিত। পরে দেখা গেল ভারতের বহু জাতি এখনও নিজ পরিচয় দেয় নাগ বানর বা ভল্লুকের বংশধর বলিয়া। তাহার পর ক্রমে বুঝা গেল এগুলি সেই Totem-এরই ব্যাপার।

ঋগ্বেদে যে তৃৎসুগণ সুদাসের অধীনে যুদ্ধ করিয়া ভেদ নামক যোদ্ধাকে হারাইলেন তাঁহার দলে যোদ্ধাগণের মধ্যে কয়েকটি জাতির উল্লেখ দেখা যায়, যথা "অজ"।

অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ।—ঋগ্বেদ, ৭, ১৮, ১৯,

অজ অর্থ সবাই জানেন। অথচ একটি জাতি এই নামেই পরিচিত। এখানে যে শিগ্রুদের নাম পাই তাহাও একটি Totem বলিয়া মনে হয়। কারণ শিগ্রু অর্থ সজিনা।[১]

ঋগ্বেদের ঐ সূক্তেই মৎস্য জাতিরও নাম পাওয়া যাইতেছে (৭, ১৮, ৬)। শতপথব্রাহ্মণেও মৎস্যদের রাজার কথা পাই (১৩, ৫, ৪, ৯)।

কৌশীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদে মৎস্যদের দেশে গার্গ্য বলাকি যে বাস করিয়াছিলেন "সংবসন্ মৎস্যেষু" (৪, ১) তাহা দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণেও মৎস্যদের কথা পাওয়া যায়। মহাভারতে ও পুরাণাদিতে মৎস্যদের কথা আছে।

ম্যাকডোনেল সাহেব কৌশিক, গোতম, মাণ্ডুকেয়, বৎস, শুনক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এই Totem প্রথাটি প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যদিও হপকিন্স তাহা সংগত মনে করেন নাই।[২]

১ আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন, ১৩২৭, পৃ. ১৭২

২ *Vedic Mythology*, p. 153

পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে পারাবত জাতির কথা আছে কিন্তু অনেকে মনে করেন তাহা পর্বতবাসী বা দূরবাসী অর্থে প্রযুক্ত।

আর্য অনার্য বহু শ্রেণীর মধ্যেই কথিত আছে যে কশ্যপ হইলেন আদিপুরুষ। চলতি কথাও আছে "জাত হারালেই কাশ্যপ"। শতপথব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মাপ্রজাপতি কূর্মরূপ হইলেন। কূর্ম ও কশ্যপ বা কচ্ছপ একই কথা। তাই এখন যে-কেহ কশ্যপের সন্ততি বলিয়া দাবি করিতে পারে। কুর্মি জাতের উৎপত্তির সঙ্গে কি কূর্মের কোনো যোগ আছে?

রিজলী সাহেব তাঁহার People of India নামক বিখ্যাত গ্রন্থে[১] Totemism সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন অনুসন্ধিৎসুগণকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি। তিনি দেখাইয়াছেন এখনকার দিনে ভারতের নানা শ্রেণীর মধ্যে কত কত বংশ আপনাদিগকে কোনো পশু পক্ষী বৃক্ষ বা লতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া পরিচয় দেয় ও নিজেরাও তাহা মানে। যে জাতির যাহা পরিচয় বা Totem সেই জাতি সেই জন্তু বা বৃক্ষলতাকে কখনও আঘাত করে না, অসম্মান করে না, সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োগ করে না। মোট• কথা এই সব Totem-এর প্রতি একটা পূজ্য বা উপাস্যের ভাব মনে মনে সকলে বহন করে।

হনুমান ও জাম্বুবানের বংশীয়গণও ভারতে এখন নিজেদের পরিচয় দিবার সময় পূর্বপুরুষদের নাম করেন। কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দর বা সুদামাপুরীর রাজারা হনুমানের বংশ। তাঁহাদের পতাকায় হনুমান মূর্তি। ধ্রাংগধ্রা প্রভৃতি রাজ্যেও তাঁহাদের জ্ঞাতিগণেরই রাজত্ব।

জীবজন্তুর নামে মানুষের আত্মপরিচয় দিবার ব্যবস্থা পুরাণে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। সকল পুরাণ হইতে দেখাইতে গেলে এখানে স্থানে কুলাইবে না। তাই শুধু মহাভারত (বঙ্গবাসী সংস্করণ) হইতেই এক-আধটুকু নিদর্শন দেখানো যাউক।

উলূক নামে একদল লোককে অর্জুন উত্তরদেশজয়প্রসঙ্গে পরাজিত করেন (সভাপর্ব, ২৭, ৫)। উলূক অর্থ পেচক। নাগদের শত্রু যেমন সুপর্ণ, উলূকরাও তেমনি ছিল কাকদের বৈরী তাই তাহাদিগকে ধ্বাংক্ষশত্রু বলা হইয়াছে (লিঙ্গ-পুরাণ, উত্তর, ৩, ৭২)। কাকযোদ্ধাগণের কথাও ভীষ্মপর্বে বলা হইয়াছে (৯, ৬৪)। নাগবিশেষের নাম কর্কোটক। বেল ইক্ষু প্রভৃতি কয়েকটি গাছের নামও কর্কোটক। বাহীকদের কথাপ্রসঙ্গে কর্কোটক জাতীয় মানুষের উল্লেখ দেখা যায় (কর্ণপর্ব, ৪৪, ৪২)। যাদবগণের একটি শাখার নাম কুকুর (সভাপর্ব, ১৯, ২৮)। অন্ধক-

১ pp. 93-102

গণের সঙ্গেই প্রায় তাহাদের উল্লেখ দেখা যায় (বনপর্ব, ১৮৩, ৩২)। হরিবংশের অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের নামই হইল কুকুরবংশবর্ণন। এক শৃগাল রাজা বাসুদেবের সহিত যাদব শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবিবরণ পাওয়া যায়, (হরিবংশ, ১০০ অধ্যায় ৫৬৩৯) তাহাও কি এইরূপ ? রাসভ যোদ্ধাদেরও উল্লেখ মহাভারতে দেখা যায় (সভাপর্ব, ৫১, ২৫)।

ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভারতীয় নানা নদনদী ও জানপদগণের পরিচয় দিতেছেন (৯ম অধ্যায়)। সেখানে দেখা যায় মানুষেরা মৎস্য (ঐ, ৪০), গোধা অর্থাৎ গোসাপ (ঐ, ৪২), কুক্কুর (ঐ), মহীষক (ঐ, ৫৯), মূষক (ঐ, ৫৯ এবং ৬৩), কৌক্কুটক (ঐ, ৬০), প্রোষ্ঠ অর্থাৎ বৃষ (ঐ, ৬১), পশু (ঐ, ৬৭), কাক (ঐ, ৬৪) ইত্যাদি নামে পরিচিত। নাকুল যোদ্ধাগণের নামও ভীষ্মপর্বে আছে (৫০, ৫৩)। মাতঙ্গ অর্থ হস্তী। মহাভারত ও পুরাণের বহু স্থলেই মাতঙ্গ চণ্ডালদের কথা পাই। ভেড়া ও শূকরকে বলে রোমশ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রোমশ-জাতীয় বীরেরা উপহার আনিয়াছিল (সভাপর্ব, ৫১, ৩০)। দুর্যোধনের দলে বৃক যোদ্ধাগণের নাম পাওয়া যায় (ভীষ্মপর্ব, ৫১, ১৬ প্রতাপ রায় সংস্করণ)। বৃক অর্থ নেকড়ে বাঘ। উট বা পঙ্গপাল অর্থে শরভ শব্দ। বসিষ্ঠের কামধেনু হইতে যবন পৌণ্ড্র কিরাতাদির মত শরভ সব যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটিল (আদিপর্ব, ১৭৫, ৩৬)। সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে যাঁহারা উপহার বহন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কৌকুর (সভাপর্ব, ৫২, ১৫), কুকুর (ঐ, ১৬), তার্ক্ষ্য অর্থাৎ গরুড় সুপর্ণ পক্ষীদের (ঐ, ১৫) নাম পাওয়া যায়। শূকরগণের রাজা শত হস্তী উপহার দেন (ঐ, ২৫)। মোটের উপর সংক্ষেপে ঐসব পশুপক্ষী বা বৃক্ষলতাদির নামে মানুষদিগকেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

তার্ক্ষ্যের কথায় পক্ষীদের নাম মনে হইল। বহু মানবশ্রেণী তখন পক্ষী নামেও অভিহিত হইত। দ্রোণাচার্যের সৈন্যব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার জন্য শকুন যোদ্ধাগণের উল্লেখ দেখা যায় (দ্রোণপর্ব, ১৯, ১১)। কাকের কথা পূর্বেই বলা গিয়াছে (ভীষ্ম-পর্ব, ৯, ৬৪)। কঙ্করাও যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়াছিলেন (সভাপর্ব, ৫১, ৩০ ; শান্তি-পর্ব ৬৫, ১৩)। অনুশাসনপর্বে (৪৮, ২১) মদ্‌গুর জাতির নাম পাওয়া যায় তাহারা নৌজীবী অর্থাৎ জলেই বেশি থাকে। মদ্‌গুর নামে পক্ষীও আছে, মাগুর মাছকেও মদ্‌গুর বলে। মৎস্যদের নামে পরিচিত মানুষের কথা পুরাণাদিতে বহুস্থানেই আছে।

মহাভারতে দেখা যায় কোক ও বক (ভীষ্মপর্ব, ৯, ৬১) ও সুমল্লিকা (ঐ, ৯, ৫৫) প্রভৃতি পক্ষী জাতির নামে পরিচিত মানুষ। মল্লিকা একরকম রাজহংসের নাম।

হংসকায়ন (সভাপর্ব, ৫২, ১৪) হংসমার্গ (ভীষ্মপর্ব, ৯ম অধ্যায়, প্রতাপ রায় সংস্করণ) হংসপথ (দ্রোণপর্ব, ১৯, ৭) জাতীয় লোকের নামও পাওয়া যায়। হয়তো হংস নামের সঙ্গে ইহাদের যোগ থাকিতে পারে অথবা হিমালয়ের মধ্য দিয়া মানসে যাইবার সময় হংসরা সেই পথে যায় ইহারা সেখানকার মানুষ। তিত্তির জাতীয় মানুষের নামও ভীষ্মপর্বে আছে (৫০, ৫১)।

ভেড়াকে বলে হুণ্ড। হুণ্ড জাতীয় লোকেরও উল্লেখ দেখা যায় (ভীষ্মপর্ব, ৫০, ৫২) সণ্ড বা ষণ্ডও বাদ যান নাই (ঐ, ৯, ৪৩)। আবার ক্ষুদ্র শশকও আছেন (বনপর্ব, ২৫৩, ২১)। অশ্বকও দেখা যায় (ভীষ্মপর্ব, ৯, ৪৪, প্রতাপ রায় সংস্করণ)। ভীষ্মপর্বের (৫০, ৫৩) বৎস জাতীয় মানুষদের সঙ্গে কি বৎসের কোনো যোগ আছে ? তার্ক্ষ্য গরুড়ের নাম, তার্ক্ষ্য নামে মানুষের কথা বলা হইয়াছে। উরগদেরও নাম পাওয়া যায় (ভীষ্মপর্ব, ৯, ৫৪)। কোলিসর্প নামেও ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ আছে (অনুশাসনপর্ব, ৩৩, ২২)। ঝিল্লী পোকার নামে ঝিল্লিক জাতির কথা জম্বুখণ্ডবর্ণনায় আছে (ভীষ্মপর্ব, ৯, ৫৯) এমন কি মশকের নামেও মনুষ্য জাতির কথা জানা যায় (ঐ, ১১, ৩৭)।

বৃক্ষের মধ্যে প্রথমেই তাল দিয়া আরম্ভ করা যাউক। তাহাতে দেখা যায় তালচর (উদ্যোগপর্ব, ১৪০, ২৬), তালজঙ্ঘ (বনপর্ব ১০৬, ৮) তালবন (সভাপর্ব, ৩১, ৭১) প্রভৃতি জাতীয় লোকের নাম। তালের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ছিল। শাল্বদের (সভাপর্ব ১৪, ২৬) নামের সঙ্গে শালবৃক্ষের যোগ আছে। কীচকদের সঙ্গে কীচক বাঁশের (আদিপর্ব, ৫২, ২, ৫৮) সম্বন্ধ কি নাই ? দার্ব (ভীষ্মপর্ব, ৯, ৫৪) গণের সঙ্গেও দারু ও দার্ব দার্বী প্রভৃতি গাছের যোগ আছে। জাগুড় অর্থ জাফ্রান (আপ্তের অভিধান দ্রষ্টব্য), জাগুড় জাতির উল্লেখও মহাভারতে পাওয়া যায় (বনপর্ব, ৫১, ২৫)। রামঠ অর্থ হিং ; রামঠ জাতিরও উল্লেখ সেখানে আছে, মহাভারতে বহু বার তাহা মেলে (সভাপর্ব, ৩২, ১২)। এখনকার কাবুলীদের সঙ্গে কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ আছে ?

শিব ও বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে ন্যগ্রোধ একটি নাম। ন্যগ্রোধ বৃক্ষার্থই প্রসিদ্ধ। হয়তো শৈব ও বৈষ্ণব ভাগবতগণের মধ্যে এই বৃক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল। শিবিগণের সঙ্গে হয়তো শিব দেবতার যোগ আছে। শিব ও গণপতির নাম অজ। অজ নামে বিশেষ মানুষ শ্রেণীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দক্ষের অজমুখ হওয়ার মধ্যে কি প্রাচীন কালে এই কথাই বুঝাইয়াছেন ? যাঁহার মুখে ইন্দ্রাদি দেবতার নাম ছিল তাঁহার মুখে এখন শিবনাম আসিল। এখন তাঁহার উপাস্য বা দেবতা শিব হওয়ায়

তিনি শিবমুখ বা অজমুখ হইলেন। রুদ্রগণের একটি নাম যে অজপাদ বা অজ-একপাদ তাহাও মনে রাখা উচিত। কিরাত জাতির সঙ্গে কিরাতরূপী মহাদেবের ভিতরে ভিতরে কিছু যোগ থাকার কথা। গুহ অর্থ কার্তিক। শিব ও বিষ্ণুর সহস্র নাম মধ্যেও গুহ নাম আছে। গুহ নামে বিশেষ মানুষ শ্রেণীর কথাও পাই। গুহরা দক্ষিণভারতীয় ও পুলিন্দ শবরাদির সঙ্গে কীর্তিত (শান্তিপর্ব, ২০৭, ৪২)। মতঙ্গ জাতির সঙ্গে দেবী মাতঙ্গীর যোগ থাকাই সম্ভব। গণপতির নাম হেরম্ব। হেরম্বক জাতির কথা সভাপর্বে আছে (৩১, ১৩)। এই ভাবে নানা উপাস্যের দ্বারাও নানাবিধ মানবমণ্ডলী পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে অথবা সেই সব মানবমণ্ডলীর নামে তাহাদের দেবতা প্রখ্যাত হইয়াছেন। যে মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে দেবতা পূজিত হয়তো সেই দেবতার বাহন সেই মণ্ডলীরই লাঞ্ছন। তাই শিবের উপাসক ষণ্ড প্রভৃতি, নাগরাও শিবের উপাসক। বিষ্ণুর উপাসক গরুড়। এই সব স্থলে বিশেষ বিশেষ দেবতাই বিশেষ বিশেষ মানবমণ্ডলীর Totem বা পূজ্য পরিচয়।

রিজলী সাহেব তাঁহার People of India নামক গ্রন্থে ভারতের আদিম নিবাসীর যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে বহু জাতির এইরূপ Totem বা বিশেষ লাঞ্ছনযুক্ত নাম পাওয়া যায়। ঐ সব জীবজন্তুর নামেই তাহাদের গোত্র। ওরাওঁদের এইরূপ ৭৩টি গোত্র বা ভাগ আছে তার মধ্যে তিরকী (ছোট ইঁদুর), এক্কা (কচ্ছপ), লাকড়া (হায়না), বাঘ, গেডে (হাঁস), খোয়েপা (বন্যকুকুর), মিনজী (বাইন বা কুচিলা মাছ), চিরুরি (কাঠবিড়াল) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৭৯৩)।

সাঁওতালদের মধ্যের এর্গো (ইন্দুর), মুর্মু (নীলগাই), হংস, মারুড়ী (জংলী ঘাস), বেসরা (বাজপাখি), হেমরণ (সুপারি গাছ), শঙ্খ, গুয়া, কারা (মহিষ), গোত্রগুলি দেখিবার মত (ঐ)।

ভূমিজদের মধ্যে শালরিসি (শোল মাছ), হংস, শাণ্ডিল্য (পাখি), হেমরন (সুপারি), তুমরঙ্গ (লাউ), নাগ (সর্প) গুলিও গোত্রনাম (ঐ, পৃ. ৯৫)।

মাহিলীদের মধ্যে ডুংরী (ডুমুর) হংস, মুর্মু (নীলগাই) এবং কোরাদের মধ্যে কশ্যপ (কচ্ছপ), শোল (মাছ), কাসিবক (বক), হংস, বটকু (শূকর), সাঁপু (ষাঁড়) এবং কুর্মীদের মধ্যে তরার (মহিষ), ডুমুরিয়া, চোঁচমুক্রুয়ার (মাকড়সা), হন্তোয়ার (কচ্ছপ), বাঘ প্রভৃতি নাম আছে (ঐ, পৃ. ৯৫)। জগন্নাথী কুম্ভকারদের মধ্যে কৌণ্ডিন্য (বাঘ), সর্প, নেউল, গরু, মুদির (ব্যাং), ভরভদ্রিয়া (চড়াই পাখী) কূর্ম প্রভৃতি ভাগ দেখা যায় (ঐ, পৃ. ৯৭)।

উত্তর-পশ্চিমে মির্জাপুর জেলায় আগরিয়া জাতির মধ্যে এইরূপ সাতটি ভাগ পাওয়া যায়। "মর্কাম" গোত্রের লোকেরা মর্কাম অর্থাৎ কচ্ছপ খাইবে না, কচ্ছপ তাহাদের পূজ্য পরিচয়। গোইরারগোত্রীয়রা গোইরার বৃক্ষের পূজক, এই গাছ তাহারা কাটিবে না। "পরসওয়ান" বা পলসওয়ানেরা তেমনি পলাশ গাছের উপাসক। "শণওয়াল"রা শনকে পবিত্র মনে করে, তাহারা কোনো কাজে শণ ব্যবহার করে না। "বড়গওয়াড়"রা বড় অর্থাৎ বটবৃক্ষকে অতি পবিত্র মনে করে। "বংঝকওয়ার" বা "বেংগছওয়ার"রা ব্যাংকে মনে করে পূজ্য। "গিধলে"দের কাছে গৃধ্র তেমনি শ্রদ্ধার যোগ্য।[১]

ডালটন সাহেবের Ethnologyতে[২] এইরূপ বহু খবর পাওয়া যায়।

গোরখপুর জেলায় নাগবংশী ক্ষত্রিয়েরা বলে যে নাগ তাহাদের পূর্বপুরুষ, এবং তাহারা নাগকে অতি পবিত্র ও অবধ্য মনে করে।[৩]

উত্তর-পশ্চিমের নটজাতির মধ্যে কয়েকটি এইরূপ গোত্র আছে। 'জঘট' অর্থ একপ্রকার সর্প; 'উরে' অর্থ শূকর, 'মরই' একরকম গাছ, 'ঝিংঝরিয়া" একপ্রকার বাঁশ। এই সব হইল তাহাদের নানা গোত্রের নাম।[৪]

এই সব Totemএর ঘটা দক্ষিণ-ভারতেই বেশী। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার লিখিত Mysore Tribes and Castes পুস্তকের প্রথম খণ্ডে Totemism অধ্যায়টি পড়িলে অনেক সংবাদ মেলে।[৫] আডু (ছাগল) গোত্রের লোকেরা ছাগল মারে না, মহীশূর রাজ্যে এইরূপ আনে (হস্তী), অরসিনা (জাফ্রান), অরস্থ (বট), অত্তি (ডুমুর), বেভু (নিম), হুরলী (ছোলা), মেনস্থ (পিপুল), নগরে (একপ্রকার গাছ) প্রভৃতি গোত্র আছে।[৬]

ইহা ছাড়া কুকুর, খরগোশ, পাঁঠা, মহিষ, বৃশ্চিক, পিঁপড়ে, চন্দন, অশ্বত্থ, তেঁতুল, জীরা, লাউ, মল্লিকা, কার্পাস, মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি গোত্র আছে।[৭] সেই দেশে সংখ্যাবহুল হোলেয় জাতির মধ্যে হাতী, মহিষ, খরগোশ, সর্প, কোকিল, ডুমুর,

১ W. Crooke, *Tribes and Castes of the N. W. P. Oudh*, vol. i, p. 2
২ p. 254
৩ Crooke, vol. iv, p. 39
৪ *Ibid*, p. 72
৫ pp. 242-46
৬ *Ibid*, pp. 247-48
৭ *Ibid*, p. 248

তেঁতুল, সীম, কলা, কস্তুরী, মল্লিকা, ফেনীমনসা, পারাবত, মটর, পান, মধু, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, স্বর্ণ, রৌপ্য, ছত্র প্রভৃতি গোত্রও আছে।[১]

কোমতী বা বৈশ্যদের মধ্যেও আমলকী, নেবু, লাউ, ছোলা, রক্তকমল, নীলকমল, শ্বেতকমল, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, তিতলাউ, কৃষ্ণমাষ, কলা, এরণ্ড, পিপুল, শণ, আম, দাড়িম্ব, বংশবীজ, গম, দ্রাক্ষা, খেজুর, ডুমুর, ইক্ষু, মূলা, পানিফল, সর্ষপ, চন্দন, তেঁতুল, খাটাশী, সিন্দুর, কর্পূর প্রভৃতি গোত্রও আছে।[২]

শৈব বলিয়া দেবাঙ্গদের মধ্যে বৃষ অতি পবিত্র। বৃষ মরিলে ঘটা করিয়া তাহার সংকার করিতে হয়।[৩]

তৈলঙ্গদেশে গোল্লাদের মধ্যে অবূল (গোরু), উচ্ছে, চিন্‌তল (তেঁতুল), গুর্রম (ঘোড়া), গোরের্লা (ভেড়া), গোরেণ্টলা (হেনা), কাটারি (ছুরি), নক্‌কল (শৃগাল), উল্লিপোয়ল (পলাণ্ডু), বঙ্কয়ল (বেগুন) প্রভৃতি গোত্র আছে।[৪]

গোল্লাদের মধ্যে রাঘিন্দালা (অশ্বত্থ)-গোত্রীয়েরা অশ্বত্থপাতা ব্যবহার করে না। কুঁচেলা গোত্রীয়রা কুঁচেলা গাছ ব্যবহার করে না।[৫] মহীশূরের তাঁতিদের মধ্যে শিব ও পার্বতী নামে দুই ভাগ। দুই দলে ৬৬টি গোত্র। স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। ৬৬টি গোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাউক, যথা মহিষ, বৃষভ, অশ্ব, নাগ, কাঠ-বিড়াল, চটক, শঙ্খচিল, জীরক, মল্লিকা, কেতকী, দূর্বা, পিপ্পলী, জাফরান, হরিদ্রা ইত্যাদি।[৬]

তেলেগু নাপিতদের মধ্যে চিতলু (বৃক্ষ বিশেষ), ঘোড়া, জম্বু (একপ্রকার শর), হোঙ্গে (বৃক্ষ বিশেষ), করু (বৃক্ষ), মল্লিকা, সেঁউতী, ময়ূর, হরিদ্রা প্রভৃতি গোত্র আছে।[৭]

উক্ত পুস্তকের ২৫৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায় ঐ প্রদেশের নানাজাতির মধ্যে যে-সব পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদি দিয়া গোত্র আছে তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা। সিংহ, বাঘ, ভালুক, শ্বেতবরাহ, হস্তী, বানর, সজারু, খাটাশী, ভূঁষ-ইন্দুর, ঘোড়া, মহিষ, গরু, বৃষ, ভেড়া, বিড়াল, কুকুর, আখু-হরিণ, ময়ূর, কোকিল, চটক, বৃশ্চিক, পিপীলিকা, মৎস্য,

১ *Ibid*, p. 249
২ *Ibid*, p. 250-51
৩ *Ibid*, p. 252
৪ *Ibid*
৫ *Ibid*
৬ *Ibid*, p. 253
৭ *Ibid*, p. 254

হরিণ, নেউল প্রভৃতি জন্তুর নামে গোত্র আছে। বট, ডুমুর, আম, অশ্বথ, চম্পক, চন্দন, সেগুন, বেল, নারিকেল, সুপারি, সাগু, খেজুর, সরল, তাল, বাঁশ, জোয়ারি, মল্লিকা, পিঁপুল, ধান, কলা, মনসা, হরিদ্রা, রিঠা প্রভৃতি গোত্রও দেখা যায়।[১] নাগবংশীয়রা মৃত নাগ দেখিলে অশৌচগ্রস্ত হয়। ক্ষৌর ও স্নান করিয়া তাহাদের শুদ্ধ হইতে হয়।[২] মাদিগা জাতি মাতঙ্গ নামে পরিচয় দেয়। তাহারা মাতঙ্গী দেবীর পূজা করে।[৩]

ঈ. থর্স্টন সাহেব Castes and Tribes of Southern India নামে প্রকাণ্ড সাত খণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে বর্ণানুক্রমে সব জাতির নাম আছে। তাহাতে বহু বহু জাতি ও গোত্রের নাম দেখা যায় পশু-পাখি বা গাছ-পালার নামে। তাঁহার পুস্তকে প্রত্যেকটি নাম বর্ণ-অনুসারে দেওয়া আছে, কাজেই বাহির করিয়া লইতে একটুও অসুবিধা নাই। ইংরেজি অক্ষরেই নামগুলি লিখিয়া গেলে বাহির করিয়া দেখিতে সুবিধা হইবে বলিয়া ইংরেজি বানান অনুসারেই লেখা হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদও যথাসাধ্য দেওয়া গেল। বর্ণমালা অনুসারেই জাতিগুলির নাম গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বলিয়া এখানে প্রত্যেক নামের সঙ্গে পৃষ্ঠার অঙ্ক দিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই কয়টি পশুর নামে জাতি বা গোত্র আছে। Ane (হাতী), Arane (গিরগিটি), Avu (সর্প), Avula (গরু), Balli (টিকটিকী), Balu (ভালুক), Barrelu (মহিষ), Bengri (ভেক), Bhag (বাঘ), Bholia (বন্য কুকুর), Bilva (শৃগাল), Bombadai (মৎস্য বিশেষ)।

প্রথম খণ্ডে গাছপালার স্থানে এই কয়টি গোত্র দেখা যায়। যথা, Adavi (অটবী, অরণ্য), Addaku, Agaru বা Avaru বা Akula (পান), Akshantala (অক্ষত, চাউল), Allam (আদা), Allikulam (শাপলা ফুল), Ambojala (পদ্ম), Anapa, Arashina (হরিদ্রা), Arati (কলা), Arli (অশ্বথ), Aththi (ডুমুর), Aviri (নীল), Avisa (পুষ্প বিং), Banni (শমী), Belata Belu, (কদবেল), বা Bende, Bevina (নিম), Bilpathri (বেল)।

ইহা ছাড়া Bant জাতির মধ্যে বৃশ্চিক, কুচিলা, কাঁটাল, মুর্গী, মটরসুঁটি, ইন্দুর, বাঘ, রাগি ধান্য প্রভৃতি গোত্র আছে।[৪] Bedar বা Baya জাতির মধ্যেও

১ *Ibid*, p. 255
২ *Ibid*, p. 256
৩ *Ibid*, vol. iv, pp. 131-32
৪ p. 164

এইরূপ ৬২টি উপগোত্র বা বিভাগ আছে। পশুপাখি বা বৃক্ষবাচক সেই সব বহুবহু নামও দেওয়া হইয়াছে।[১]

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে Cheli (ছাগ), Chelu (চেলা বিছা), Chimala (পিপীলিকা), Dhoma (মশক), Dyavana (কচ্ছপ), Eddulu (বৃষ), Elugu (ভালুক), Emme, Erumai বা Gedala (মহিষ), Gavala (কড়ি), Gaya (গাই), Gidda (গৃধ্র), Gollari (বানর), Gorrela (ভেড়া), Goyi (গোধা), Gurram (ঘোড়া), Hanuman (হনুমান), Hathi (হাতী), Huli (বাঘ), Iga (মাছি), Inichi (কাঠবিড়াল), Iruvu (কৃষ্ণ পিপীলিকা), Jaikonda (গোসাপ), Jambuvar (জাম্বুবান), Javvadi (খাটাশী), Jelakuppa (মাছ), Jerribotula (তেঁতুলে বিছা), Jinka (হরিণ), Jivala (কীট) প্রভৃতি জন্তুর নাম। ইহা ছাড়া গোটা উনিশ-কুড়ি গাছপালার নামের গোত্রও আছে। কোনো কোনো জাতির মধ্যে উপবিভাগেও এইরূপ নানা নাম পাওয়া যায়।

তৃতীয় খণ্ডে Kaka (কাক), Kamadi (কমঠ কচ্ছপ), Kappala (ব্যাঙ), Karadi এবং Khinbudi (ভালুক), Karkadabannaya (কাঁকড়া বিছা), Kaththe (গাধা), Ken (রক্ত পিপীলিকা), Kesari (সিংহ), Kinkila (কোকিল), Kira (টিয়াপাখী), Kochimo (কাছিম), Kodi বা Kodla (মুরগী), Kongara (সারস) প্রভৃতি শ্রেণী আছে। ইহা ছাড়া নয়-দশটি গাছপালার গোত্র আছে। আবার Kamma[২] প্রভৃতি জাতির মধ্যে জীবজন্তুর নামে নানা উপবিভাগ আছে, বাহুল্যভয়ে সেগুলির আর নাম করা হইল না।

চতুর্থ খণ্ডেও বহু জীবজন্তুর নামের গোত্র। যথা, Koriannayya (কুক্কুট), Koti (বানর), Kovila (কোকিল), Kudire (ঘোড়া), Kurivi (চড়াই), Kurma (কচ্ছপ), Kurni (ভেড়া), Kutraki (বন্য ছাগ), Makado (মর্কট), Mandi (গরু) প্রভৃতি। Korra (জোয়ার), Kumada (কুমড়া) এবং Mamidla (আম) গোত্রও আছে। মাতঙ্গীদের পরিচয় আছে পৃ. ২৯৬ এবং ৩১৬ প্রভৃতিতে। ১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠায় Kurmi জাতির অনেকগুলি এইরূপই উপবিভাগ দেওয়া আছে। মাদিগা জাতির মধ্যেও মেলা উপগোত্র ভাগ[৩] দেখা যায়। Mala (মাল) জাতির মধ্যেও সেই কথা।[৪]

১ pp. 198-99

২ p. 98

৩ p. 319

৪ pp. 347-48

পঞ্চম খণ্ডে Mekala (ছাগল), Midathala (পঙ্গপাল), Mohiro Navali pitta বা Nemilli, (ময়ূর), Mola (খরগোশ), Mushika (মূষিক), Naga (নাগ), Nariangal (শিয়াল), Naththalu (শামুক), Nayi (কুকুর) প্রভৃতি শ্রেণী আছে। গাছপালার নামেও সতরো আঠারোটি শ্রেণী আছে। ইহা ছাড়া এক-একটি বড় জাতির মধ্যে জীবজন্তু ও পশুপাখির নামে নানা উপবিভাগ আছে।[১]

ষষ্ঠ খণ্ডে Pandi (শূকর), Pasu (গরু), Perugadannaya (মূষিক), Pilli (বিড়াল), Pouzu (কোয়েল), Punjala (মোরগ), Sakuna Pakshi (শকুন পক্ষী), Sanku (শঙ্খ), Sem Puli (লাল বাঘ), Pichiga (চড়াই পাখি) প্রভৃতি শ্রেণী আছে। তেরো-চৌদ্দটি গাছপালার নামে চিহ্নিত শ্রেণীও আছে। জাতিগুলির মধ্যে উপবিভাগও অনেক ক্ষেত্রে বহু আছে, তাহারও তালিকা দেওয়া আছে।

সপ্তম খণ্ডে Tabelu (কচ্ছপ), Thelu (বৃশ্চিক), Tiruman (কৃষ্ণ হরিণ), Tolar (নেকড়ে বাঘ), Vali Sugriva (বালি সুগ্রীব), Vatte (উষ্ট্র), Vekkali Puli (বাঘ), Vinka (বল্মীক), Yelka Meti (মূষিক), Yeddula (বৃষ) প্রভৃতি শ্রেণী আছে। তাহা ছাড়া গুটি আঠারো গাছপালার নামে পরিচিত শ্রেণীও আছে। এক-একটি জাতির মধ্যে বহু উপবিভাগও আছে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে এই দেশে পরিচিত প্রায় সব রকম জীবজন্তু ও গাছপালার মধ্যে কোনোটা বা কোনোটার নামে এক-এক শ্রেণীর মানুষ প্রাচীন কাল হইতে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে। এই পদ্ধতিকেই বলে Totemism। কথাটি ইংরেজিতে বাহির হইতে আমদানি। এই প্রথার বলেই মহাভারতে আমরা সর্প পক্ষী কুকুর ষণ্ড ভেড়া শশক প্রভৃতি মানবশ্রেণীর পরিচয় পাই। আর্যপূর্ব জাতিদের মধ্যেই এই ভাবে আত্মপরিচয় দিবার প্রথা ছিল বেশি প্রচলিত। স্থানান্তরে এই বিষয়ে আরও কিছু বলা হইয়াছে।

১ p. 130 ; p. 449

আর্য ও অনার্যের মধ্যে বিবাহ

আর্যরা আসিবার পূর্বে নাগ এবং সুপর্ণ প্রভৃতি আর্যেতর জাতিই ছিল এই দেশে প্রবল। এই নাগ ও সুপর্ণদের সঙ্গে আর্যদের বিবাহাদি সম্বন্ধ খুবই প্রচলিত ছিল। আমরা জানি অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন নাগকন্যা উলুপীকে। রাজ-তরঙ্গিণী মতে নাগকন্যা চন্দ্রলেখার বিবাহ হইয়াছিল ব্রাহ্মণের সঙ্গে। প্রথমত এইরূপ বিবাহ সর্বভাবেই বৈধ বলিয়া গৃহীত হইত এবং তখনকার দিনে সেই সব সন্তানেরা অনায়াসে পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইতেন। নাগজাতীয়দের মধ্যেও অনেকে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণের এবং ঋষির স্থানও লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৪তম সূক্তের রচয়িতা ঋষি হইলেন কদ্রুর পুত্র নাগবংশীয় অর্বুদ। তাই সায়ন আচার্য বলেন, "কদ্র্বাঃ পুত্রস্য সর্পস্য অর্বুদস্যার্ষম্।" তৈত্তিরীয় সংহিতা বলেন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৯তম সূক্তের রচয়িত্রী ঋষি হইলেন সর্পরাজ্ঞী। সার্প-রাজ্ঞী নামর্ষিকা (ঋগ্বেদ, ১০, ১৮৯, সায়ন)। নাগজাতীয় ইরাবতের পুত্র জরৎকর্ণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৬তম সূক্তের রচয়িতা ঋষি। সায়ন বলেন, "ইরাবতঃ পুত্রস্য সর্পজাতের্জরৎকর্ণনাম্ন আর্ষম্।"

মহাভারতে দেখা যায় যখন রাজা জনমেজয় সরমাদত্ত শাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য যজ্ঞার্থ যোগ্য পুরোহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তখন শ্রুতশ্রবা ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকেই উপযুক্ত দেখিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। তাহাতে ঋষি শ্রুতশ্রবা বলিলেন, "আমার এই পুত্র নাগকন্যার গর্ভজাত মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মৎতপোবীর্যসম্ভূত" (আদিপর্ব, ৩ পৌষ্যপর্ব, ১৩ শ্লোক)।

জরৎকারু ছিলেন মহাতপা ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী (মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৫ অধ্যায়)। জরৎকারুর সন্ততি নাই, তাই শংসিতব্রত ঋষি তাঁহার পিতামহগণ অধোলোকে যাইতে বসিলেন। ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের একমাত্র বংশধর জরৎকারু বিবাহ না করিয়া তপস্যাতেই রত। আমরা বংশহীন। তাই অধোগতি হইতে আমাদের রক্ষার আর উপায় কই?" তখন জরৎকারু তাঁহাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমার মত দরিদ্রকে কে কন্যা দিবে?" পিতৃগণ বলিলেন, "তোমার সন্ততিলাভ ছাড়া আমাদের আর গতি নাই।" সকল দেশ ঘুরিয়াও যখন কন্যা মিলিল না তখন একদিন মনের দুঃখে অরণ্যে জরৎকারু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি দরিদ্র, এতকাল উগ্র তপস্যায় রত ছিলাম, এখন পিতৃগণের নির্দেশে বিবাহ করিতে চাই, কেহ কি আমাকে কন্যা

দিবেন?” তখন নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগ্নীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৬ অধ্যায়)। এই বিবাহ বৈধ। ইহাতে উৎপন্ন সন্ততিগণই বিপ্রশ্রেষ্ঠ জরৎকারুর পিতৃগণকে অধোগতি হইতে রক্ষা করেন।

এই বিবাহেই মহাতপস্বী আস্তিকের জন্ম। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়া তিনিই সেই যজ্ঞের বিরতি প্রার্থনা করেন। আত্মপরিচয় দিয়া আস্তিক বলিলেন, “নাগকুল আমার মাতুলবংশ, তাই তাঁহাদের রক্ষার জন্য এই যজ্ঞবিরতি বরপ্রার্থনা করি।” তখন জনমেজয় বলিলেন, “হে দ্বিজবরোত্তম, অন্য কোনো বর প্রার্থনা করুন (আদিপর্ব, ৫৬ অধ্যায় ২৬)। তখন যজ্ঞের বেদবিৎ সদস্যগণ সকলে একবাক্যে বলিলেন, “এই ব্রাহ্মণকে নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। যজ্ঞের বিরতিই যখন ব্রাহ্মণের প্রার্থিত, যজ্ঞ বিরত হউক (আদিপর্ব, ৫৬ অধ্যায় ২৭)।

যজ্ঞ বিরত হইল। প্রসন্নমনে তপস্বী আস্তিক বিদায় লইলেন। বিদায় দিবার সময় জনমেজয় তাঁহাকে বলিলেন, “হে দ্বিজবরোত্তম, আপনার প্রার্থনানুসারে যজ্ঞ তো নিবৃত্তই হইল, কিন্তু এইটুকুই আপনার যোগ্য যথেষ্ট সৎকার নহে। আমার পুরীতে পুনরায় আপনাকে আসিতে হইবে। মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা আমার আছে। তাহাতে আপনাকেই সদস্য হইতে হইবে (আদিপর্ব, ৫৮, ১৬)। কাজেই দেখা যায় নাগমাতার গর্ভে জন্ম হইলেও ইঁহার বিপ্রত্ব ও ঋষিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এই সব প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় সেই যুগে ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে নাগকন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন এবং তাহাতে সন্তানেরা ব্রাহ্মণই হইতেন। পরে ক্রমে এইরূপ বিবাহ অসম্ভব হইয়া আসিল। কাজেই মনে হয় এইরূপ ভেদবুদ্ধি আর্যদের অন্তরে সেই যুগে এতটা প্রবল ছিল না। ক্রমে এই দেশে আসিয়া তাঁহাদের এই সব ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল।

নাগ যে সাধারণ জন্তু সাপ নহে ইহা বুঝাই যাইতেছে। আর্যদের পূর্বে যে-সব আর্যতর জাতি ভারতে আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নাগ ও সুপর্ণেরাই প্রধান। সুপর্ণ অর্থ পক্ষী। হয়তো সাপ ও পাখি এই দুই জাতির লাঞ্ছন ছিল। তাই তখনকার দিনে আর্যদের পক্ষে অভিশাপ ছিল, “চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হও”, “নিষাদযোনি প্রাপ্ত হও”, “তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হও।” তির্যক্ হওয়া অর্থ অনার্যত্বপ্রাপ্তি।

ঐতরেয় আরণ্যক তো এই কথা খুব সরলভাবেই প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “এই যে সব বঙ্গ মগধ চের দেশের লোক ইহারাই তো পক্ষী।” “তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।” (২, ১, ১, ৫)

সুপর্ণবংশীয়দের মধ্যে মহাপুরুষ ছিলেন গরুড়। নাগ ও সুবর্ণদের মধ্যে ছিল চিরশত্রুতা। আর্যপূর্ব এই দুই জাতির মধ্যে বিরোধ থাকাতে হয়তো আর্যদের কিছু সুবিধাও হইয়া থাকিবে। ভারতের ভাগবত ধর্মে নাগেরা প্রধানত হইলেন শিবভক্ত, আর সুপর্ণেরা বিষ্ণুভক্ত। গরুড় তো বিষ্ণুর বাহন, আর নাগ মহাদেবের ভূষণ। আর্যদের আগমনের সঙ্গে বোধ হয় নাগকুল ক্রমে মধ্যভারতে ও সুপর্ণকুল পূর্বভারতে সরিয়া গেলেন। তাই বঙ্গ মগধাদি দেশবাসীকে পক্ষী বলা হইয়াছে। কিরাত জাতি আশ্রয় লইল হিমালয় প্রদেশে।

কিরাতও সুপর্ণদের শত্রু। তাই গরুড়ের এক নাম "কিরাতাশী"। নাগদের সঙ্গে গরুড়ের শত্রুতা তো এদেশে সবারই জানা। মহাভারতে দেখা যায় বিনতা আপন পুত্র গরুড়কে বলিতেছেন, "নিষাদদের সহস্র সহস্র সংখ্যা ভোজন করিয়া তুমি অমৃত আন।"

নিষাদানাং সহস্রাণি তান্ ভুক্ত্বামৃতমানয় ॥—আদি, ২৮, ২

কাজেই বুঝা যায় নাগ, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি জাতি সুপর্ণদের শত্রু। সুপর্ণকন্যা বিনতাকে দীর্ঘকাল আপন সপত্নী নাগজাতীয়া কদ্রুর দাস্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পরে গরুড় সেই দাস্যমোচন করেন। ইহাতে এক সময় নাগজাতির কাছে সুপর্ণদের পরাভব দাস্য ও পরে তাহাদের মুক্তিলাভ কি সূচিত হয় না?

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে নাগগণ নাগকন্যা নর্মদাকে পুরুকুৎস রাজার সঙ্গে বিবাহ দেন (৯, ৭, ২,)। সেই বংশে সত্যব্রত অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু রাজার জন্ম (৯, ৭, ৫)। এই সত্যব্রতের পুরোহিত ছিলেন বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, সে-কথা পূর্বেই হইয়াছে।

মহাভারতে দেখি মন্দপাল নামে এক মহর্ষি খাণ্ডববনে বাস করিতেন। জরৎকারুর মত তিনিও বিবাহ না করিয়া তপস্যারত রহিলেন। তাই পিতৃগণের গতি হইল না। দেবতারা বলিলেন, "বিবাহ কর, সন্ততিলাভ কর" (আদিপর্ব, ২২৯, ৫-১৪ শ্লোক)।

অগত্যা মন্দপাল খাণ্ডবে তির্যক্ কন্যা জরিতাকে বিবাহ করেন এবং তাহাতে চারিজন ব্রহ্মবাদী পুত্রের জন্ম হয়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জরিতারি হইলেন কুলপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় সারিসৃক্ক হইলেন পিতৃগণের কুলবর্ধক, তৃতীয় স্তম্বমিত্র হইলেন তপস্বী, চতুর্থ দ্রোণ হইলেন ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ (আদিপর্ব, ২৩০, ৯-১০ শ্লোক)। ব্রহ্মর্ষি বলিয়া খাণ্ডবদাহনে ইঁহাদের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না (আদিপর্ব, ২৩৩, ৮)। অগ্নি তাঁহাদিগকে বেদবিৎ ঋষি জানিয়াই দগ্ধ করেন নাই (আদিপর্ব,

২৩৪, ১-৩ ;) কাজেই দেখা যায় তির্যক্-কন্যার গর্ভজাত হইলেও বেদবিৎ ব্রহ্মর্ষি হইবার পক্ষে ইহাঁদের কোনোই বাধা হয় নাই।

এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ প্রাচীন যুগে বৈধ হইলেও ক্রমে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া আসিল। এই সব বিবেচনা করিয়া মনে হয় প্রাচীন আর্যেরা এই সব বিষয়ে নিরতিশয় উদার ছিলেন।

এই জন্যই অপ্সরার কন্যা শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের ঔরসে যে পুত্র জন্মে সেই ভরত পিতারই উপযুক্ত সন্তান। সেখানে বায়ুপুরাণ বলেন, "মাতা তো আধার মাত্র, সন্তান হইবে পিতারই অনুরূপ।"

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥ বায়ুপুরাণ ৯৯, ১৩৫

কিন্তু চারিদিকের প্রভাবে প্রাচীন আর্যরা এই মতটি চিরকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই।

নাগ ও পক্ষী উভয় জাতির কথাই মহাভারত হইতে বলা হইল। এখনো বহু জাতি আছে যাহারা নাগবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে নাগরা খুব সম্ভব দক্ষিণের দিকে সরিয়া গেলেন। সেই ভূভাগকে Central Provinces বলে। ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানের নামে কিছু সূচনা আছে। ছোটনাগপুরের কূর জাতির পূর্বপুরুষ নাকি নাগ, উৎকলের পাণ জাতির মধ্যে নাগগোত্র আছে। বিষ্ণুপুরের রাজারাও নিজেদের নাগবংশী বলিয়াই পরিচয় দেন।

ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার Indian Ethnology গ্রন্থে বলেন, নায়াররা রীতিমত নাগপূজক, হয়তো ইহাঁরাই প্রাচীন নাগবংশীয়।[১] নাগবংশীয় বহু লোক পরে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।[২]

অধ্যাপক জায়স্‌বাল ভারতের বাকাটক বংশীয় রাজাদের বিস্মৃত একটি অপূর্ব যুগের পরিচয় দিয়াছেন। বাকাটকেরা নাগবংশীয় রাজা ছিলেন। নাগবংশীয়গণ ভারতবর্ষ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

আবার মহারাষ্ট্রে পঞ্চালদের মধ্যে সুপর্ণ দৈবজ্ঞ আছে। বোম্বাই মান্দ্রাজ ও মহীশূরেই বেশি পঞ্চালদের বাস। তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, লৌহকার, কাংস্যকার, পাষাণকার ও ছুতার এই পাঁচ জাতি আছে। পঞ্চালরা বলেন তাঁহারা বিশ্বকর্মার সন্তান ও ব্রাহ্মণ। ইঁহারা নিজেরাই নিজেদের যজন-যাজন করেন ও ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন খান না।

১ vol i, p. 313

২ *Ibid*, p 309

রঘুকুলের বন্ধু জটায়ু হয়তো এই সব সুপর্ণদেরই কোনো জ্ঞাতি ভাই হইবেন।

মহাভারতে উক্ত নাড়ীজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত, পিতামহের প্রিয় সুহৃৎ, কশ্যপাত্মজ মহাপ্রাজ্ঞ পক্ষিপ্রবর বকরাজও খুব সম্ভব এইরূপ পক্ষী (শান্তিপর্ব, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২ অধ্যায়)। মধ্যদেশবাসী বেদজ্ঞানহীন গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ধনার্থে এক দস্যুর কাছে যান। সেই দস্যু ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ ও দানরত ছিলেন। দস্যু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া নূতন বস্ত্র ও এক বিধবা যুবতী নারী উপহার দেন। গৌতম সেইখানে ঐ যুবতী সহ বাস করিতে লাগিলেন (শান্তিপর্ব, ১৬৮ অধ্যায়)। গৌতম পরে সেই স্থান হইতে বকরাজ নাড়ীজঙ্ঘের কাছে যান এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া সৎকৃত হন। বকরাজের নির্দেশে গৌতম মেরুব্রজপুরে ধার্মিক রাক্ষস রাজার কাছে যান ও অন্যান্য দ্বিজগণের সঙ্গে বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হন (শান্তিপর্ব, ১৭১ অধ্যায়)।

পুরাণের যুগে ক্রমশ অসবর্ণ বিবাহ নিন্দিত হইতে লাগিল। অনুলোমক্রমে অসবর্ণ কন্যা বিবাহের কথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডোক্ত ধর্মারণ্যখণ্ডে ষষ্ঠাধ্যায়ে (৩২) আছে। গরুড়পুরাণেও দেখা যায় এইরূপ বিবাহ বৈধ (পূর্বখণ্ড, ৯৫ অধ্যায়)। কিন্তু সেখানে পুরাণকার বলেন, "অন্যান্য সকলে দ্বিজগণকে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে বলিলেও আমার তাহা ভালো লাগে না। কারণ পত্নীতে নিজেরই জন্ম হয়।"

> যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ।
> ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্॥ - ৯৫, ৫

তবে শূদ্রকন্যা না হইয়া কন্যা যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হয় তবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ অনুলোম বিবাহ প্রশস্তই বটে (৯৫, ৬)। কিন্তু কালক্রমে দ্বিজ জাতিদের মধ্যেও অনুলোম বিবাহ আর চলিত রহিল না।

বেদে ও যজ্ঞে শূদ্রজাতির অধিকার নাই, নারীদেরও নাই। দ্বিজপত্নী হইলেও নারীদের বেদে অধিকার নাই। অথচ পূর্বকালে বহু নারী বেদের মন্ত্রসকলের ঋষি ছিলেন। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদিতে যজমানপত্নীর কৃত্য বহু অনুষ্ঠান থাকিত। তবে পরে দ্বিজপত্নীদের এই অধিকারহীনতার হেতু কি? খুব সম্ভব আর্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে নারীর সংখ্যা বেশী ছিল না, তাই তাঁহাদের এদেশীয় আর্যপূর্ব জাতির কন্যা গ্রহণেও কোনো আপত্তি ছিল না। ক্রমে তাঁহারা এত শূদ্র কন্যাকে ঘরে লইলেন যে হয়তো নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হইলেন বেদে অনধিকারিণী শূদ্রা। হয়তো সেই সব শূদ্রকন্যারা পতিগণের বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পিতৃকুলের প্রাচীন ধর্মই বেশি পছন্দ করিতেন। তাই তাঁহারা নিজেরাও যজ্ঞাদিতে যোগ দিতে

উৎসুক ছিলেন না। ক্রমে স্ত্রী ও শূদ্র একই পর্যায়ভুক্ত হইলেন। এই সব শূদ্র-পত্নীরাই আর্যদের সমাজে বৈদিক দেবতাদের স্থানে ক্রমে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি গণদেবতার পূজা প্রবেশ করাইয়াছেন। স্থানান্তরে পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহার আলোচনা করা গিয়াছে।

কথাসরিৎসাগরে (ষষ্ঠ তরঙ্গ) দেখা যায় নাগবাসুকির ভ্রাতার পুত্র কীর্তিসেন ব্রাহ্মণকন্যা শ্রুতার্থাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্রই বিখ্যাত কথাসরিৎসাগরের প্রণেতা ব্রাহ্মণ গুণাঢ্য পণ্ডিত। গুণাঢ্যই কালে অধিগত-সর্ববিদ্য হইয়া সুপ্রসিদ্ধিগত হইলেন।[১] পাটলীপুত্রবাসী মালব ব্রাহ্মণ শ্রীদত্ত শবররাজকন্যা সুন্দরীকে বিবাহ করেন (ঐ, দশম তরঙ্গ)। দক্ষিণদেশবাসী ব্রাহ্মণ পুত্রক রাজকন্যা পাটলীকে বিবাহ করেন (ঐ, তৃতীয় তরঙ্গ), তাঁহা হইতেই পাটলীপুত্র নগরের নাম।

কিন্তু এখন যে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকন্যা ছাড়া বিবাহ করেন না তবু স্ত্রীদের অধিকার সেই শূদ্রদেরই সমান। কাজেই এখনকার দিনেও শ্রৌতমন্ত্রে ও শ্রৌতকর্মে ব্রাহ্মণপত্নীরা অনধিকারিণী। ক্রমে কোথাও-কোথাও নিষ্ঠা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে শুদ্ধ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আপন পত্নীর হাতেও খান না কারণ স্ত্রী যে শূদ্র। শূদ্রান্ন খান কিরূপে? নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা নায়ার কন্যার সঙ্গে সংসার করেন বটে কিন্তু নায়ার কন্যার স্পর্শে অশুচি হন। দিনে তাঁহারা তাঁহাদের স্পর্শ করেন না এবং প্রভাতে প্রতিদিন স্নান করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ হন। আপন সন্তানকেও তাঁহারা স্পর্শ করেন না, করিলে স্নান করিতে হয়। এই সব কারণেই এখন ভারতের মধ্যে নম্বুদ্রীরা আপনাদিগকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ব্রাহ্মণ মনে করেন। তাঁহারা আর সব দেশের সর্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই পতিত হীন ও অশুচি মনে করিয়া স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া মানেন। কাশীতে আমি একবার এক নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "কেন আপনারা শূদ্রকন্যার সঙ্গে ঘর করেন?" তিনি বলিলেন, "নারী মাত্রই তো শূদ্র। আমরা বরং তাঁহাদের লইয়া ঘর মাত্র করি, তাঁহাদের হাতেও খাই না এবং প্রভাতে স্নান করিয়া প্রতি দিন স্পর্শদোষ দূর করি। অন্য সব ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদের বিবাহ করেন, তাঁহাদের হাতে খান। তাহা ভালো, না আমাদের এই শৌচাচার ভালো?" এই কথার পর আমাকে নিরুত্তর হইতে হইল।

নম্বুদ্রীদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ব্রাহ্মণ-নম্বুদ্রী কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। আর সব ভাই শূদ্র-নায়ার কন্যাদের সঙ্গেই থাকিতে বাধ্য। যদিও ইহাতে

১ *Ocean of Story*, vol i, p. 61

নম্বুদ্রী বহু কন্যা অনূঢ়া থাকেন, এবং নায়ার বহু পুরুষ পত্নীহীন ভাবে বাস করেন। তবু সেই দেশের প্রাচীনপন্থীরা জষ্টিস শংকর নায়ারের আনীত তদ্দেশীয় বিবাহ বিষয়ক সংস্কারপ্রস্তাব শুধু অভিনব বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শংকর নায়ার চাহিয়াছিলেন, নম্বুদ্রী পুরুষরা নম্বুদ্রী নারীদের বিবাহ করুন এবং বিবাহিত জীবন যাপন করুন। নায়ার পুরুষরাও নায়ার কন্যাদের সেই ভাবে বিবাহ করুন। দেশের মধ্যে অবিবাহিত নম্বুদ্রী কন্যা ও নায়ার পুরুষের ভারে যে নানা দুরাচারে দেশ ডুবিয়া রহিয়াছে তাহা হইতে দেশ মুক্ত হউক। কিন্তু এই সব অভিনব সংস্কার গ্রহণ করিলে নাকি সনাতন ধর্ম অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন আর্যরা কি অনার্যদের মধ্যে কেবল নাগ ও সুপর্ণবংশীয় কন্যাদেরই গ্রহণ করিতেন। রাক্ষসাদি জাতির কন্যাদের কি বিবাহ করিতেন না। নাগ ও সুপর্ণগণ অনার্য হইলেও সভ্য ও সুন্দর ছিলেন। নাগকন্যারা তো সৌন্দর্য ও মনোহারিতার জন্য বিখ্যাতই ছিলেন। রাক্ষসদের মধ্যেও যে-সব শ্রেণী সভ্য তাঁহাদের সঙ্গে আর্যদের বিবাহাদি সম্বন্ধ চলিত। রাবণের নাম সকলেই জানেন। তাঁহার জন্মকথা আছে রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে। পুলস্ত্য নামে ছিলেন ব্রহ্মর্ষি (২, ৪)। তাঁহার পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা পিতার ন্যায় তপস্বী হইলেন (৩, ১)। তিনি সত্যবান, শীলবান, দান্ত, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ভোগে অনাসক্ত, নিত্য ধর্মপরায়ণ (৩, ২))। তাঁহারই বংশে রাক্ষসী মাতার গর্ভে রাবণের জন্ম। তাই রাবণকে বধ করাতে রামের ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। রাবণ পাপাসক্ত হইলেও বিদ্যায় বুদ্ধিতে তপশ্চর্যায় অগ্রগণ্য ছিলেন। রাবণের স্নেহে বাধ্য হইয়া মহর্ষি পুলস্ত্যকে মাহিষ্মতীপুরে গমন করিতে হয়। যেখানে কার্তবীর্যার্জুনের হস্তে রাবণ বন্দী হইয়াছিলেন। (রামায়ণ, উত্তর, ৩৮শ অধ্যায়)। মেঘনাদ যাগযজ্ঞে প্রবীণ ছিলেন (রামায়ণ, উত্তর, ৩০ অধ্যায়, ৪-৫)।

মহাভারতে গৌতমের উপাখ্যানে দেখা যায় মেরুব্রজনগরে রাক্ষসরাজ নিয়মিত ভাবে সহস্র ব্রাহ্মণকে অর্চনাপূর্বক ভূরি দান করিতেন (শান্তিপর্ব, ১৭০, ১৭১ অধ্যায়)।

স্কন্দপুরাণে আছে রাক্ষসী সুশীলা স্বামীর আদেশে পুত্র লাভার্থে শুচি নামক মুনির কাছে যান। রাক্ষসী সুশীলার গর্ভে ঐ মুনির ঔরসে কপালাভরণ নামে পুত্র জন্মেন। সুশীলা সেই মুনির বিবাহিতা পত্নী নহেন এবং সুশীলার রাক্ষস পতি জীবিত ছিলেন। তথাপি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম বলিয়া কপালাভরণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। কপালাভরণকে হত্যা করায় ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাতক হয় (স্কন্দ, ব্রহ্মখণ্ড, সেতুমাহাত্ম্য, ১১, ৬০)।

সকল রাক্ষসই অসভ্য নৃমাংসাদ ছিল না। উত্তম রাজার কাছে রাক্ষস বলাক বলিতেছেন, "আমরা মানুষ খাই না, হে রাজন্, সেই সব রাক্ষস ভিন্ন শ্রেণীর।"

ন বয়ং মানুষাহারা অন্যে তে নৃপ রাক্ষসাঃ ॥ —মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৭০, ১৬

এই সব রাক্ষসেরা দেখিতেও অতিশয় সুন্দর ছিলেন। তাই বলাক বলিতেছেন, "আমাদের নারীগণ রূপে অপ্‌সরাদের মত।"

সন্তি নঃ প্রমদা ভূপ রূপেণাপ্‌সরসাং সমাঃ ॥—ঐ, ৭০, ১৯

"তাহারা থাকিতে মানুষীতে আমাদের লালসা কেন হইবে।"

রাক্ষস্যস্তাসু তিষ্ঠৎসু মানুষীষু রতিঃ কথম্ ॥—ঐ

সাধারণত রাক্ষসদের চার শ্রেণী ছিল (বায়ুপুরাণ, ৭০ অধ্যায়, ৫৫)। ইহাদের মধ্যে বেদাধ্যয়নশীল ও তপোব্রতনিষেবী রাক্ষসও ছিলেন (ঐ, ৫৩)। দানবদের কঠোর তপস্যার বিবরণ মৎস্যপুরাণে দেখা যায় (১২৯ অধ্যায়, ৭-১১) ব্রহ্মাও তাহাতে প্রসন্ন হন।

সূর্যবংশীয় রাজারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধদিনে রাক্ষসীদের গর্ভজাত ব্রাহ্মণদেরও ভোজন করাইতেন। রাজা দম ছিলেন সূর্যবংশের একজন বিখ্যাত ধার্মিক রাজা। তিনি আপন পিতৃশ্রাদ্ধে রাক্ষসকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস রক্ষঃকুলসমুদ্ভবান্।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১৩৭, ৩৫

দম রাজার এই কীর্তির কথা বলিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, "সূর্যবংশীয় রাজারা এইরূপই ছিলেন।

এবংবিধা হি রাজানো বভূবুঃ সূর্যবংশজাঃ।—ঐ, ১৩৭, ৩৬

বায়ুপুরাণও বলেন, কুবের সমুদায় রাক্ষসগণের রাজা। তাহাদের মধ্যে বেদাধ্যয়নশীল রাক্ষস এবং তপোব্রতনিষেবী রাক্ষসও আছে :

বেদাধ্যয়নশীলানাং তপোব্রতনিষেবিণাম্ ॥—বায়ুপুরাণ, ৭০, ৫৩

১৫

জাতিভেদ সত্ত্বেও প্রাচীন উদারতা

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে প্রধানত দুইটি বিষয়ে সাবধানতা। স্বজাতির কন্যা বিবাহ করিতে হইবে এবং নীচ জাতির হাতে অন্নগ্রহণ বা নীচ জাতির সঙ্গে ভোজন করা চলিবে না। হিন্দীতে সহজভাবে ইহা বুঝায় "রোটি-বেটি" বিচার বলিয়া, "বেটি" অর্থাৎ বিবাহের পরই "রোটি" অর্থাৎ অন্নের বিচার। আর একটি কথা মৃতদেহের স্পর্শ ও সংকার করা লইয়া। সে-কথা এখন অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগে এমন কি সূত্রের যুগেও সকল জাতিই সবার হাতে খাইতেন।[১]

বেদের প্রথম দিকে কোথাও এইভাবে অন্নের বিচার নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, উষস্তী চাক্রায়ণ অবস্থার বিপর্যয়ে কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ইভ্যগ্রামে অর্থাৎ হস্তীপালকদের গ্রামে আসিলেন। তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া দেখিলেন হস্তীপালকেরা কুল্মাষ সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। ক্ষুধিত চাক্রায়ণ তাহাই চাহিয়া খাইলেন। হস্তীপালকেরা তাঁহাকে জল দিতে গেলে তিনি বলিলেন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমি তোমাদের মাষ সিদ্ধ খাইয়াছি। কিন্তু জল না খাইলেও আমার চলিবে (ছান্দোগ্য, ১, ১০, ১-১১)।

কাজেই বুঝা যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের সময় এইসব বিচার আসিয়াছে। পূর্বে বৈদিক যুগে যজ্ঞে ব্রতদীক্ষার কালে যে আহারের সংযমবিধি আছে তাহার হেতু অন্য। যজ্ঞকালে বিশেষ শুচিতা রক্ষার হেতু সেই বিধি। জাতির বিচার তথায় হেতু নহে।

জল সম্বন্ধে মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন,

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্॥ ৪, ২৪৭

কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন যাহা স্বয়মাগত, মধু ও অভয়াদক্ষিণা সর্বস্থান হইতেই গ্রহণ করিবে। ২৫০ সংখ্যক শ্লোকে সর্বত্র জল গ্রহণ যে করা যায় তাহা মনু আবার ভাল করিয়া বলিলেন। পুনরুক্তির দ্বারা কথাটি আরও দৃঢ় হইল।

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধান্ অপঃ পুষ্পং মণীন্ দধি।
ধানামৎস্যান্ পয়োমাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ণুদেৎ॥ মনু ৪, ২৫০

১ Sham Sastri, *Evolution of Castes*. p. 6

রামায়ণে ও মহাভারতের আখ্যানেও দেখি মুনি ঋষিরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির হাতে অন্নগ্রহণ করিতেছেন। বনবাস কালে দ্রৌপদী প্রতিদিন বহু মুনি ঋষিকে আপন স্থালী হইতে অন্ন দিতেছেন (বনপর্ব, ৫০ অধ্যায়)। ভীষণ তপস্বী দুর্বাসাও দ্রৌপদীর হাতে অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। অসময়ে অন্নপ্রার্থনা করাতে বিপন্ন দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়া আপন লজ্জা রক্ষা করেন (বনপর্ব, ২৬৩ অধ্যায়)। আদিপর্বে দেখা যায় রাজা পৌষ্য অন্ন দিতেছেন ব্রাহ্মণ উতঙ্ককে (আদিপর্ব, ৩, ১৫৫)।

সূত্রযুগেও দেখা যায় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ৩ খণ্ড, ২৮-৩০ সূত্র) গৌতম ধর্মসূত্রে পাই, পতিত ও অভিশস্ত ছাড়া সকল জাতির ঘরেই ব্রহ্মচারী অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। "সার্ববর্ণিকং ভৈক্ষচরণম ভিশস্তপতিতবর্জম্" (২, ৪২)।

উশনঃ সংহিতায় সার্ববর্ণিক ভৈক্ষচরণের ব্যবস্থা আছে (১, ৫৪)। গৌতম সংহিতায় বলেন অভিশস্ত ও পতিত ছাড়া সর্ববর্ণের কাছেই ভৈক্ষচরণ ব্যবহারপ্রাপ্ত (দ্বিতীয়াধ্যায়)। মনুও বলেন প্রয়োজন হইলে সর্ববর্ণের গৃহেই ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতেন (২, ১৮৫)। পদ্মপুরাণও তাহাই বলেন (স্বর্গখণ্ড, ২৫, ৬১)। আপস্তম্ব বলেন, অনেকের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র ছাড়া স্বধর্মে বর্তমান সবারই অন্ন গ্রহণ করা চলে (১৮, ১৩)।

মহাভারতও এই কথাই বলেন (অনুশাসনপর্ব, ১৩৫, ২-৩)। সভাপর্বে দেখা যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে অধীন রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন (সভাপর্ব, ১২, ১৪)। বৈশ্যদের মতো রাজারাও ব্রাহ্মণের পরিবেষণে লাগিয়া গিয়াছেন (সভা, ৪৯, ৩৫)। দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখা যায় দাসদাসী পাচকেরা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন বেশে সকলকে অন্ন পরিবেশন করিতেছে (আদিপর্ব, ১৯৪, ১৩)।

গৌতম সংহিতায় দেখা যায় আপন পশুপালক, ক্ষেত্রকর্ষক, কুলক্রমাগত বন্ধু-ভাবাপন্ন, নাপিত, পরিচারক, ইহারা শূদ্র হইলেও তাহার অন্ন ভোজন করা চলে।

"পশুপালক্ষেত্রকর্ষককুলসঙ্গতকারয়িতৃপরিচারকা ভোজ্যান্নাঃ।"—সপ্তদশ অধ্যায়

কাজেই দেখা যায় কোনো স্থলে শূদ্রান্ন ভোজ্য আবার কোথাও কোথাও অ-ভোজ্য। ইহার হেতু কি?

যে-সব শূদ্রেরা আর্যদের রীতিনীতি ও ধর্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহেন, তাঁহাদের অন্ন গ্রহণীয় নহে। যাঁহারা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন সদাচারশীল তাঁহাদের অন্ন গ্রহণীয়। তাই লঘুবিষ্ণুস্মৃতিতে আছে শূদ্র দুই রকমের। যে শূদ্র

ধনজন প্রাণসহ ব্রাহ্মণাদির শরণ লইয়াছে তাহার অন্ন ভোজ্য, অন্য শূদ্রদের অন্ন অভোজ্য (লঘুবিষ্ণুস্মৃতি, ৫, ১১)। তাই দেখা যায় শূদ্র দ্বিবিধ। শ্রাদ্ধী এবং অশ্রাদ্ধী। শ্রাদ্ধী অর্থ বিশ্বাসভাজন। শ্রাদ্ধীরা ভোজ্য, অশ্রাদ্ধীরা অভোজ্য।

শূদ্রোঽপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধী চৈবেতরস্তথা।
শ্রাদ্ধীভোজ্যস্তয়োরুক্তো হ্যভোজ্যো হীতরঃ স্মৃতঃ॥—ঐ, ৫, ১০

এইজন্যই গৌতমধর্মসূত্রে দেখা যায় "পশুপালক্ষেত্রকর্ষককুলসঙ্গতকারয়িতৃ-পরিচারকাঃ ভোজ্যান্নাঃ (১৭, ৬) অর্থাৎ নিজেদের পশুপালক, ক্ষেত্রকর্ষক, কুলক্রমাগত বন্ধু, নাপিত ও পরিচারকদের অন্ন গ্রহণ করা যায়। এখানে টীকাকার মস্করি বলেন, উশনারও এই মত, কারণ তিনি বলেন, "স্বগোপালো ভোজ্যান্নঃ স্বক্ষেত্রকর্ষকশ্চ"। মনুর সম্মতিও মস্করি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

ক্ষেত্রকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ (ঐ)

আমরা মনুতে পাঠ পাই—"আর্দ্ধিকো কুলমিত্রং চ" আর সব একই পাঠ। অর্থ একই। অর্থাৎ "যাহারা নিজেকে নিবেদন করিয়া সেবাব্রত লইয়াছে এমন ক্ষেতচাষী কুলবন্ধু গোপাল এবং দাস নাপিতেরা শূদ্র হইলেও ভোজ্যান্ন (মনু ৪, ২৫৩)। এই শ্লোকটিই দেখা যায় কূর্মপুরাণে (উপরি ভাগ, ১৭, ১৭)। গরুড় পুরাণেও এই একই কথা (পূর্বখণ্ড, ৯৬, ৬৬)।

ব্যাসও এই কথায় সমর্থন করিয়া বলেন,

নাপিতান্বয়মিত্রার্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি॥ ৩, ৫১-৫২

কূর্মপুরাণ আবার বলেন ইহাদের অন্ন গ্রহণ করায় দোষ নাই তবে অল্প কিছু মূল্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত—

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ॥ – উপরিভাগ, ১৭, ১৮)

বৃহদ্‌যমস্মৃতিতেও এই কথাই পাই :

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রাস্তু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ৩, ১০

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও দেখিতেছি

শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১, ১৬৮

গরুড়পুরাণেও এই শ্লোকটিই দেখা যায় (পূর্বখণ্ড, ৯৬ অধ্যায়, ৬৬) বৃহদ্‌যমসংহিতায় যাহা আছে যমস্মৃতিতেও (২০) ঠিক সেই শ্লোকই আছে। নির্ণয়-সিন্ধুতেও এই শ্লোকই স্থানান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (তৃতীয় পূর্বার্ধ, পৃ. ১২৯৯)। এই বিষয়ে হেমাদ্রি-পরাশরও আদিত্যপুরাণ হইতে প্রমাণ দিয়াছেন[১]।

পাণিনিও শূদ্রদের মধ্যে বহিষ্কৃত ও অবহিষ্কৃত এই দুই ভাগ দেখিয়াছেন। তাঁহার সূত্র "শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্" (২, ৪, ১০) দেখিলে ইহা বুঝা যায়। আচার্য কৈয়ট তো তাই বলেন—শূদ্রদের পঞ্চযজ্ঞে অধিকার আছে "শূদ্রাণাম্ পঞ্চযজ্ঞে অধিকারঃ অস্তি"[২]।

স্কন্দপুরাণে আছে শূদ্র যদি ভগবদ্ভক্ত হয় তবে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া চলে কিন্তু অভক্ত অশুচি ব্রাহ্মণকেও তাহা দেওয়া চলে না (নাগরখণ্ড, ২৬২, ৫০)

এইরূপ বেদেও মাঝে মাঝে সকল বর্ণের কাছেই সত্যকে ঘোষণার কথা পাই। "এই কল্যাণবাণী সকল লোকের মধ্যে প্রচারিত কর, ব্রাহ্মণ্ ও রাজন্যকে বল, শূদ্রকে বল, বৈশ্যকে বল, স্বজনকে বল, অপরিচিতকে বল।"

> যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
> ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ॥ বা, সং, ২৬, ২

সুশ্রুতসংহিতায় সূত্রস্থানে দেখা যায়, শূদ্রও যদি কুল ও গুণসম্পন্ন হয় তবে তাঁহাকে বিনা মন্ত্রে বিনা দীক্ষাতেই অধ্যয়ন করাইবে, এইরূপ মতও কাহারও কাহারও আছে।

> শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদ্ ইত্যেকে। ২, ৫।

এই কথার উপর আচার্য ডল্‌হন তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহ টীকায় বলেন, "শূদ্রমপি গুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জম্ উপনীয় অধ্যাপয়েদ্ ইত্যেকে", অর্থাৎ কেহ কেহ আবার বলেন, শূদ্র যদি গুণবান হয়েন তবে বিনামন্ত্রে তাঁহাকে উপনীত করিয়া অধ্যাপন করাইবে।"

মীমাংসাদর্শনে আচার্য জৈমিনির সূত্র রহিয়াছে :

> চাতুর্বর্ণ্যমবিশেষাৎ। ৬, ১, ২৫।

তাহাতে ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রশ্ন করিতেছেন, "এই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে কি চারি বর্ণেরই অধিকার? না, শূদ্র বাদে মাত্র তিন বর্ণেরই অধিকার? এখানে শ্রুতিতে আমরা কি পাই? বেদ তো চারিবর্ণের বিষয়েই 'যজ্ঞ করিবে,

১ *Indo-Aryan*, vol i, p. 285
২ *Indian Culture*, January, 1938, p. 371

আহুতি দিবে' এইরূপ বলে। কেননা বেদে তো কোনো বিশেষবর্ণের অধিকারের কথা নাই। তাই শূদ্রকেও এই অধিকার হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই।"

অগ্নিহোত্রাদীনি কর্মাণি উদাহরণং, তেষু সন্দেহঃ,—কিম্ চতুর্ণাং বর্ণানাং তানি ভবেয়ুঃ, উত অপশূদ্রাণাং ত্রয়াণাং বর্ণানাম্? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং? চাতুর্বর্ণ্যমধিকৃত্য, 'যজেত', জুহুয়াৎ, "ইত্যেবমাদি শব্দমুচ্চরতি বেদঃ। কুতঃ? 'অবিশেষাৎ', নহি কশ্চিদ্ বিশেষ উপাদীয়তে। তস্মাৎ শূদ্রো ন নিবর্ত্ততে"। মীমাংসা দর্শন, ৬, ১. ২৫ শবরভাষ্য।

ইহার পরের সূত্রে এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্যসহ আত্রেয়ের একটি আপত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার পরের সূত্রেই বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়া আত্রেয়ের সেই আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। বাদরি বলেন, "নিমিত্তার্থেই শ্রুতিতে কোথাও কোথাও বিশেষাধিকারের কথা বলা হইয়াছে মাত্র, তাই তাহাতে বুঝা যায় সকলেরই ইহাতে অধিকার থাকা উচিত।"

নিমিত্তার্থেন বাদরিঃ তস্মাৎ সর্বাধিকারং স্যাৎ॥ ঐ, ৬, ১, ২৭।

এইরূপ উদার মতও যে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পরবর্তী কয়টি সূত্র ও ভাষ্যের বিচারপদ্ধতি (ঐ, ৬, সূত্র ২৮-৩৮)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা শূদ্রেরও যজ্ঞাধিকার আছে ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন,

ব্রহ্ম বৈ স্তোমানাং ত্রিবৃৎ ক্ষত্রং পঞ্চদশো ব্রহ্মখলু বৈ ক্ষত্রাৎ পূর্বং ব্রহ্ম পুরস্তান্ ম উগ্রং রাষ্ট্রমব্যথ্যমসদিতি বিশঃ সপ্তদশঃ শৌদ্রো বর্ণ একবিংশো বিশঞ্চৈবাস্মৈ তচ্ছৌদ্রঞ্চ বর্ণমনুবর্ত্মানৌ কুর্বন্ত্যথো তেজো বৈ স্তোমানাং ত্রিবৃদ্ বীর্যং পঞ্চদশ প্রজাতিঃ সপ্তদশঃ প্রতিষ্ঠৈকবিংশস্তদেনং তেজসা বীর্যেণ প্রজাত্যা প্রতিষ্ঠয়ান্ততঃ সমর্ধয়তি। অষ্টম পঞ্জিকা, ১, ৪।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুবাদ এই সঙ্গে দেওয়া হইল :

"স্তোম সকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ ক্ষত্রস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ; ক্ষত্র ব্রহ্মের পূর্ববর্তী; ব্রহ্ম পূর্বে থাকিলে যজমানের রাষ্ট্র উগ্র হইবে ও অন্যের নিকট ব্যথা পাইবে না। সপ্তদশ স্তোম বৈশ্যস্বরূপ ও একবিংশ স্তোম শূদ্রবর্ণের অনুরূপ। এতদ্দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণকে ক্ষত্রিয়ের বর্ত্মানুগামী করা হয়। আবার স্তোম সকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ তেজঃস্বরূপ, পঞ্চদশ বীর্যস্বরূপ, সপ্তদশ জন্মলাভস্বরূপ, একবিংশ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। এতদ্দ্বারা যজমানকে যজ্ঞশেষে তেজ বীর্য জন্ম ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।"—পৃ. ৬২৮

এখানে শূদ্রের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠার যোগ আছে এই কথার উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে তখনকার সমাজ ও অর্থনীতির বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হবিষ্কৃদ্ এহীতি ব্রাহ্মণস্য হবিষ্কৃদ্ আগহীতি রাজন্যস্য
হবিষ্কৃদ্ আদ্রবেতি বৈশ্যস্য হবিষ্কৃদাধাবেতি শূদ্রস্য। —আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র, ১, ১৯, ৯

এই সূত্রটি দেখিয়া অনেকে শূদ্রের যজ্ঞাধিকার প্রতিপন্ন করেন।

ইহার অর্থ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যথাক্রমে "এহি", "আগহি". "আদ্রব", "আধাব" বলিয়া হবিষ্কৃৎকে আহ্বান করিবেন।

ইহার পরের সূত্র হইল,

প্রথমং বা সর্বেষাম্। —১, ১৯, ১০

অথবা সকলেই বলিতে পারেন, "হে হবিষ্কৃৎ, এহি (আইস)।"

নবম সূত্রের সূত্রদীপিকা নামক ব্যাখ্যায় রুদ্রদত্ত বলেন,

"শূদ্রস্যেতি নিষাদস্থপত্যর্থম্"

অর্থাৎ, শূদ্র বলিতে নিষাদস্থপতি বুঝাইবে। এই আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রেই নিষাদ-স্থপতিকে যজন করাইবে বলিয়া উপদেশ আছে (১২, ৯, ১৪)।

নিষাদস্থপতিদের বিষয়ে Vedic Index-এ অনেক প্রমাণাদিসহ দেখান হইয়াছে যে তাহারা আর্যদের বশ স্বীকার করে নাই অথচ তাহারা নিজেদের মধ্যে গণনেতা।

নিষাদস্থপতির্গাবেধুকেঽধিকৃতঃ। —কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র, ১, ১, ১২।

অপস্তম্ব পরিভাষা সূত্রের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সূত্রের টীকায় কপর্দিস্বামী বলেন, যজ্ঞ ত্রৈবর্ণিক হইলেও অদৃষ্ট স্থপতিকে যাজন করা যায়। কারণ এই বচন আছে যে নিষাদস্থপতিকে যাজন করিবে ("নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" ইতি বচনাৎ)।[১]

এই সূত্র ব্যাখ্যায় দেখা যায় গবেধুক যাগে নিষাদস্থপতি গৃহীত হয়। রীতিমত বেদ না অধ্যয়ন করিলেও প্রয়োজনীয় বৈদিক মন্ত্রগুলি তিনি অভ্যাস করিয়া লয়েন। নারীদের সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যবস্থা।[২] রথকারদের সম্বন্ধেও এইভাবে যজ্ঞাধিকার দেওয়া হইয়াছে।[৩]

এখনও বিবাহকালে নাপিতকে গৌর্বচন পড়িতে হয়। এখন কোথাও কোথাও প্রাচীন কালের কথা ভুলিয়া নাপিত গৌরের নামে ছড়াই বলে। কিন্তু আসলে দেখা যায় নাপিতকে উচ্চস্বরে তিনবার "গৌ র্গৌ র্গৌঃ" বলিতে হইবে (গোভিল গৃহ্য সূত্র, ৪, ১০, ১৮) "গৌরিতি নাপিতস্ত্রির্ব্রূয়াৎ"। ইহার অর্থ এই যে, "যজ্ঞস্থলে বলির নিমিত্ত গো আনীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি করা যায় ?" পূর্বে

১ Mysore G. O. L. Series, p. 11

২ আপস্তম্বযজ্ঞ পরিভাষা সূত্র। *Sacred Books of the East, xxx*, p. 317

৩ *Ibid.*, p. 316

বিবাহযজ্ঞে গোবধ হইত। পরে যখন ভারতবর্ষে ক্রমে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও পূর্বের মত গো আনীত হইত তবে বধ না করিয়া কি করা যায় তাহা নাপিত প্রশ্ন করিত।

নাপিতের প্রশ্নের উত্তরে কোনো পূজ্য ব্যক্তি বলিতেন,

> মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্ দ্বিষন্তং মেঽভিধেহীতি
> তং জহ্যমুষ্য চোভয়োঃ রুৎসৃজ গামত্তু
> তৃণানি পিবতুদকমিতি ব্রূয়াৎ —গোভিল, গৃহ্য সূত্র, ৪, ১০, ১৯

অর্থাৎ, বরুণ পাশ হইতে গোকে মুক্ত কর।……গোকে ছাড়িয়া দাও; সে ঘাস খাউক, জল পান করুক।

তাহার পরে ঋগ্বেদ হইতে মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাম্ (৮, ১০১, ১৫) মন্ত্রটি তিনি পাঠ করিবেন (গোভিল, গৃহ্য সূত্র, ৪, ১০, ২০)।

ইহাতে দেখা যায় নাপিতকে যজ্ঞের কতক অংশে কাজ করিতে হইত এবং বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে হইত।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয়শত গো নিষ্ক ও অশ্বতরীরথ উপহার লইয়া গিয়া ব্রহ্মবাদী রৈক্ককে কহিলেন (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪, ২, ১),—হে রৈক্ক, এই সব (তোমার জন্য উপহার), তোমার উপাস্য দেবতার উপদেশ আমাকে দাও (ঐ, ৪, ২, ২)। তাহাতে রৈক্ক কহিলেন, হে শূদ্র, এই সব তোমারই থাকুক। তখন জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সহস্র গো, নিষ্ক ও অশ্বতরীরথ ও আপন কন্যাকে লইয়া সেখানে গেলেন (ঐ, ৪, ২, ৩)। রৈক্ককে তিনি বলিলেন, এই সহস্র গো, নিষ্ক, অশ্বতরীরথ, এই জায়া, এই গ্রাম যেখানে তোমার বাস (তোমার দক্ষিণা হউক), আমাকে উপদেশ দাও (ঐ ৪, ২, ৪)। সেই কুমারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রৈক্ক বলিলেন, "সরাও এই সব, হে শূদ্র, এইভাবে তুমি আলাপ করিতে চাও?" (তাহার পর শূদ্র জানশ্রুতি শিষ্যরূপে রৈক্ককে সেবা করিলেন এবং রৈক্ক তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন)। ইহাই হইল মহাবৃষ দেশে রৈক্কপর্ণ নামে গ্রাম যেখানে রৈক্ক বাস করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন (ঐ, ৪, ২, ৫)।

এখানে দেখি শূদ্র জানশ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যা লইতে গেলে প্রথমে শূদ্র বলিয়া রৈক্ক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সেই বিদ্যা দিলেন। শূদ্র রাজা আপন কন্যাকে লইয়া রৈক্ককে বলিলেন, এই যে কন্যা ইহাকে আপনার জায়া বলিয়া গ্রহণ করুন (ঐ, ৪, ২, ৪)। রৈক্ক সব সরাইয়া ফেলিতে বলিলেন বটে তবে পরে তাহা গ্রহণ করিলেন কি না বলা যায় না। কারণ এখনও অনেক সময়

এইভাবে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়া লোকে গ্রহণও করেন। তারপর শূদ্রকন্যাকে জায়ারূপে যে জানশ্রুতি দিতে আসিলেন তাহাতে বুঝা যায় তখনকার দিনে তাহা অসম্ভব ছিল না। আর শূদ্রকে আগাগোড়া তিনি যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন তাহা ছান্দোগ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডে লিখিত রহিয়াছে। এখানে তো শূদ্রেরও গুরুর কাছে যাওয়া ও গুরুগৃহে বাস দেখা যাইতেছে। কাজেই শূদ্রের উপনয়নের কথা যে কেহ কেহ বলেন তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই এখানে পাওয়া গেল।

শূদ্রদের প্রতি যখন সামাজিক ব্যবহার একেবারে অভব্য হইয়া উঠিয়াছে তখনও দেখা যাইতেছে শূদ্রগণনেতা জানশ্রুতির প্রতি ব্যবহারটা ততটা অশোভন হয় নাই। নিষাদগণ তো শূদ্রদের মত আর্যশক্তির নিকট বশ্যতাই স্বীকার করেন নাই তবু তাঁহাদের যাঁহারা নেতা সেই সব নিষাদস্থপতিকে আর্যরা গবেধুক যাগের পর্যন্ত অংশী কেন করিয়াছেন, এই প্রশ্ন মনে উঠিতে পারে। চিরদিনই দেখা গিয়াছে যেভাবেই হউক না কেন যদি কেহ আসিয়া সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় বা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া নেতৃত্ব স্বীকার করে তবে তাহার মান কমিয়া যায়। গুরু বা মণ্ডলীপতিদের মধ্যে দেখা গিয়াছে তাঁহারা যখন কোনো যোগ্য লোককে চেলা করিতে চাহেন তখন সে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় এবং বুদ্ধিমান হয় তবে কখনও আসিয়া সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। বাহিরে থাকিয়া যাহারা আপন মাতব্বরি চালায় তাহাদের পদমর্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। আর যে সব সরলমতি উৎসাহী আদর্শবাদী সম্পূর্ণরূপে মণ্ডলী বা গুরুর কাছে আত্মোৎসর্গ করে তাহারা দুইদিন পরেই গলগ্রহের মত ব্যবহার পাইতে থাকে। লম্পটরাও যে-নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত করিয়া আপনার আয়ত্ত করিতে পারে তাহার প্রতি তাহাদের দুর্ব্যবহারের আর অন্ত থাকে না। ইহা অতি সহজ মনস্তত্ত্বের কথা। যাহাকে নিজের হাতের মধ্যে পাইয়াছি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাহাকে পাই নাই তাহার জন্য ভদ্রতা সৌজন্য সঞ্চিত করিয়া রাখাই হইল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

ইহাও দেখা গিয়াছে প্রবলপরাক্রান্ত যে সব রাজা নিজ প্রজাগণকে নিরতিশয় উৎপীড়ন করেন তাঁহারাও রাজ্যের বাহিরের দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল সব দস্যুদের প্রতি অত্যন্ত ভদ্রতা ও দাক্ষিণ্য দেখাইয়া থাকেন। এই রাজনৈতিক বুদ্ধি আর্যগণেরও ছিল। তাই নিষাদপতিদের প্রতি তাঁহাদের যে মমতা ছিল তাহা তাঁহাদের অধীনস্থ শূদ্রেরা সব সময় পায় নাই। অথর্ববেদে যে ব্রতহীন ব্রাত্যদের এত স্তবস্তুতি আছে (১৫, ১, ১) তাহার মূলেও কি এই একই কারণ? কেহ বলেন ব্রাত্যেরা ছিলেন

ব্রতহীন আর্য, কেহ বলেন তাঁহারা ব্রতহীন অনার্য। মোটকথা তাঁহারা বৈদিক সংস্কৃতির অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাই কি বেদের মধ্যে তাঁহাদের প্রতি এত সম্মানসূচক স্তবস্তুতি দেখা যায়? শূদ্রদের মধ্যেও যাঁহারা জানশ্রুতির মতো রাজা বা জননেতা তাঁহারা তবু কতকটা ভদ্রব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারিতেন।

মহাভারতে শান্তিপর্বে দস্যুদের সম্বন্ধে আর্যগণের নীতি কিরূপ ছিল তাহা দেখিলে এই কথার আরও ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। দস্যুরাও আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই তবু তাহাদের প্রতি তাঁহাদের কত দরদ! মহাভারতে দেখি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন, দস্যুরা সহজেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভয়ঙ্কর কাজের যোগ্য হইতে পারে (শান্তিপর্ব, ১৩৩, ১১)। অতএব তাহাদের সহিত জনচিত্ত-প্রসাদিনী মর্যাদা স্থাপন করা উচিত—

স্থাপয়েদেব মর্যাদাং জনচিত্তপ্রসাদিনীম্। —শান্তিপর্ব, ১৩৩, ১৩

তাহাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলেও নৃশংস ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে—

ন বলস্থোঽহমস্মীতি নৃশংসানি সমাচরেৎ। — ঐ, ১৩৩, ১৯

যাঁহারা দস্যুদের ধনজন নিঃশেষ করিতে না যান তাঁহারাই রাজ্যভোগ করিতে পারেন, যাঁহারা নিঃশেষ করিতে যান তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদে রাজ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে (ঐ, ১৩৩, ২০)।

এই সব কথার উদাহরণস্বরূপ ভীষ্ম কায়ব্য নামে এক দস্যুর কথা কহিলেন (শান্তিপর্ব, ১৩৫ অধ্যায়)। কায়ব্য ছিলেন কোনো ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত। দস্যুতার দ্বারা তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন (ঐ, ১৩৫, ৩)। নীতিসঙ্গত ভাবে সকলকে উপকার করিয়া, ধর্মকে লঙ্ঘন না করিয়া, তিনি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অন্ধ বধির ব্রাহ্মণ তাপস প্রভৃতিদের প্রতি তাঁহার অপরিমিত করুণা ছিল (ঐ, ১৩৫, ৬-৮)। তাঁহার শক্তি ও সিদ্ধি দেখিয়া অনেকানেক দস্যু আসিয়া তাঁহাকে তাহাদের- নেতা হইতে অনুরোধ করিল, তাহারা বলিল, "আপনি দেশ কাল ও মুহূর্তজ্ঞ, আপনি প্রাজ্ঞ শূর ও দৃঢ়ব্রত, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা আপনি আমাদের 'গ্রামণী' অর্থাৎ মুখ্যনেতা হউন।"

মুহূর্তদেশকালজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ শূরো দৃঢ়ব্রতঃ।
গ্রামণীর্ভব নো মুখ্যঃ সর্বেষামেব সম্মতঃ॥ —ঐ, ১৩৫, ১১

কায়ব্য তাহাদের কহিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, ভীত, তপস্বী ও শিশুগণকে বধ করিও না, যে জন যুদ্ধরত নহে তাহাকে বধ করিও না, বলপূর্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না (ঐ, ১৩৫, ১৩)। সর্বজীবের মধ্যে স্ত্রী অবধ্য। নিত্যই ব্রাহ্মণগণের

কল্যাণ সাধন করা উচিত (ঐ, ১৩৫, ১৪)। সত্য রক্ষা করিবে এবং বিবাহাদি মঙ্গলকার্যে বাধা দিবে না (ঐ, ১৩৫, ১৫)। যাহারা আমাদের প্রাপ্য আমাদিগকে দিতে না চাহিবে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে (ঐ, ১৩৫, ১৯)। দুষ্ট দমন করিবার জন্যই দণ্ড, শিষ্টপীড়ন বা নিজের বৃদ্ধির জন্য দণ্ড নহে, যাহারা তাহা করে তাহারা বিনষ্ট হয় (ঐ, ১৩৫, ২০)। এই সব দেখিয়া মনে হয় দস্যু নিষাদদের মধ্যেও অনেক যোগ্য লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে যজ্ঞাদিতে যোগ দিতে দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু অন্যায় হইল আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন যে সব শূদ্র তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য তাঁহাদিগকে অপমান করা। যদিও মানুষ অধীন ও নিরুপায়দের প্রতি নির্মম হইয়া থাকে তবু তো তাহা ধর্মসঙ্গত ব্যবহার নহে।

অন্যত্র আলোচিত হইয়া থাকিলেও এখানে মহাভারতের একটি কথা পুনরায় উল্লেখ না করিলে চলে না। সেখানে দেখা যায় মহর্ষি ভৃগুর মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে সবাই ছিল ব্রাহ্মণ (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১০)। ভৃগু বলিতেছেন, "এইরূপ নানাবিধ কর্মদ্বারা পৃথক্‌কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের যজ্ঞ ক্রিয়ারূপ ধর্ম নিত্য, তাহা প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না।"

> ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
> ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে। —শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১৪

চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেও তাহাদের সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, ইহাই বিধাতার বিধান ছিল কিন্তু লোভবশত অনেকে তাহা হারাইয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

> ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
> বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ। —ঐ, ১৮৮, ১৫

এখানে টীকাকার আচার্য নীলকণ্ঠ বলেন—

"চতুরশ্চত্বারঃ ব্রাহ্মী বেদময়ী চতুর্ণামপি বর্ণানাং ব্রহ্মণা পুরং বিহিতা। লোভদোষেণ ত্বজ্ঞানতাং তমোভাবং গতাঃ শূদ্রা অনধিকারিণো বেদে জাতা ইত্যর্থঃ।"

এই হিসাবে এখনও বহু তথাকথিত আর্যগণ লোভ ও তামসিকতা দোষে বেদে অনধিকারী ও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত।

সমাজে জীবন ও সচলতা.

তবু তো প্রাচীনকালে সমাজে একটু প্রাণ ও গতি ছিল। অধ্যাত্ম যোগের কথা বলিতে গিয়াও যে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন এইখানে আসিলে চণ্ডাল আর চণ্ডাল থাকে না, পৌল্কস আর পৌল্কস থাকে না—

"চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ পৌল্কসঃ অপৌল্কসো ভবতি" —বৃহ, আ, ৪, ৩, ২২

ইহাতে বুঝা যায় সমাজে তখনও একটু প্রাণ আছে, একটু গতি ও নড়াচড়া দেখা যায়।

উচ্চজাতির নীচ হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নিম্নবর্ণ হইতেও লোক যে উচ্চবর্ণ হইতে পারিত তাহার বহু দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ সমাজের জীবন ও অবস্থা অনুসারে এই সব উচ্চনীচ হওয়াটা নিয়ন্ত্রিত হয়। কখনও কখনও রাজাদের প্রসাদ বা কোপবশতঃও উচ্চ বা নীচতা ঘটে। বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদের যে পতিত করেন তাহা একটু পরে বলা হইবে। কখনও কোনো মহাপুরুষ দেশকে দেশ উদ্ধার করেন, যেমন মণিপুরে ঘটিয়াছে।

এই যুগেও সেন্সাস লইতে গিয়া জানা যায় বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিম্নজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সব বিষয় সব পুস্তকে মেলে না, Wilson তাঁহার পুস্তকে[১] ইহা বার বার দেখাইয়াছেন। কোঙ্কণস্থ বা চিৎপাবন সম্বন্ধে কথা আছে পরশুরাম শ্রাদ্ধকার্যার্থ চিতা হইতে ৬০ জনকে উঠাইয়া যজ্ঞসূত্র দিয়া ব্রাহ্মণ করেন (ঐ, পৃ. ১৯)। মহারাষ্ট্র দেশে জবাল বা জাবাল ব্রাহ্মণদিগকে সে দেশের অন্য ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন পেশওয়ার আত্মীয় পরশুরাম ভাউ ইহাদিগকে কুন্‌বী কৃষক শ্রেণী হইতে ব্রাহ্মণ বানাইয়া তুলিয়াছেন (ঐ, পৃ. ২৭)। কাষ্ট ব্রাহ্মণদেরও অন্যেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন না। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহারা পূর্বে কায়স্থ ছিলেন (ঐ, পৃ. ২৮)।

উল্টাদিকে আবার অন্ধ্রদেশে আরাধ্য নামে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের গুরুগিরি করিলেও অন্য সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত নহেন (পৃ. ৫২)। তামিল ও কর্ণাট দেশে তুম্বি ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের পূজারী বলিয়া অপাংক্তেয় (পৃ. ৫৭)। অম্বলবাসীরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, কিন্তু দেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া মহারাষ্ট্র গুরব ব্রাহ্মণদের মত পতিত (পৃ. ৮১)।

১ *What the Castes are,* Vol. II

চিৎপাবনের কথা যে বলা হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে আচার্য ভাণ্ডারকর বলেন যে তাঁহারা এশিয়া মাইনর দেশ হইতে ভারতে আগত। তাঁহাদের জাহাজডুবি হইলে তাঁহারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে উঠেন। সমাজ তাঁহাদের গ্রহণ করে নাই। পরে পরশুরামের কৃপায় তাঁহারা সমাজে গৃহীত হয়েন।[১]

গুর্জর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কণ্ডোল নামে এক শ্রেণীর যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ আছেন। কণ্ডোল গ্রামে তাঁহাদের বাস। কণ্ডোলপুরাণ মতে ১৮০০০ লোককে এক সঙ্গে যজ্ঞসূত্র দিয়া ব্রাহ্মণ করা হইয়াছিল।[২]

রাজপুতানায় সিন্ধুদেশে গুজরাত প্রদেশে বহু পুষ্করণ ব্রাহ্মণ বা পোখরনা ব্রাহ্মণ আছেন। পুষ্কর হ্রদ খনন করার সময়ে যাঁহারা কোদাল লইয়া মাটি খোঁড়েন তাঁহাদিগকে পরে ব্রাহ্মণ পদ দেওয়া হয়। তাঁহারাই পোখরনা ব্রাহ্মণ। তাঁহারা নিজেদের পরাশরী ব্রাহ্মণও বলেন।

ইহা ছাড়া সেই দেশে পোখরসেবক বা পুষ্করসেবক নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। কথিত আছে একজন মের জাতীয় লোকের তিনটি পুত্র ছিল। ভূপাল, নরপতি ও গজপাল তাহাদের নাম। ভূপাল এক মুনিকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সেবা করেন। মুনি ভূপালকে বলেন, তোমাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিব। তাহাকে তিনি যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। সেই ভূপালের বংশ হইতেই পুষ্করসেবক ব্রাহ্মণ। নরপতির বংশীয়েরা লোত্থা বানিয়া। গজপালের সন্তানেরা মের। ভূপালবংশীয়রা মন্দিরে সেবকের কাজ করেন, তাঁহাদের গোত্র বশিষ্ঠ, শাখা মাধ্যন্দিন। একবার জয়পুরাধীপ সরায় জয়সিংহ পুষ্করে যান। তীর্থগুরু বলিয়া পুষ্কর ব্রাহ্মণকে তিনি একটি "পোশাক" দেন। পোশাকটি সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার জামাতাকে দিলেন। জামাতা ছিলেন জয়পুরের এক মন্দিরে ভৃত্য। রাজা তাহা দেখিয়া তখন জানিলেন পুষ্কর ব্রাহ্মণেরা আসলে কি। তখন তিনি তাহাদিগকে মন্দিরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। সিন্ধু দেশে পোখরনা ব্রাহ্মণেরা ভাটিয়াদের পুরোহিত।[৩] কোনো কোনো মতে তাঁহারা ধীবরীগর্ভজাত।[৪]

১ *Census of India*, 1931, Vol. I, Pt 3, p. xxviii

২ *What the Castes are*, Vol. II, p. 107

৩ *What the Castes are*, Vol. II, pp. 114, 138, 169

৪ Crooke, *Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh*, Vol. IV, p. 177

গুর্জরদের মধ্যে আভীর ব্রাহ্মণেরা নাকি রাজপুতবংশীয়। তাঁহারা আহীরদের যাজন করেন।[১]

সুরাত জেলায় তপোধন ব্রাহ্মণেরা শিবমন্দিরের পূজারী হওয়ায় পতিত।[২]

সেখানকার অনাবিল ব্রাহ্মণদের অন্তেরা অনেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বৃত্তিতে কৃষক। তাঁহারা নাকি স্থানীয় পাহাড়ী লোক ছিলেন।[৩]

শূদ্রদের গলায় পৈতা দিয়া সপাদলক্ষ অর্থাৎ 'সওয়া লাখ' সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী প্রবর্তিত করা হয়।[৪] তাঁহাদের মধ্যে দ্বিবেদী, উপাধ্যায়, ত্রিবেদী, মিশ্র প্রভৃতি উপাধি আছে।

প্রতাপগড়ের কুণ্ড ব্রাহ্মণেরা নাকি আহীর। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা কুর্মী, কেহ বলেন ভাট। রাজা মানিকচাঁদ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করেন।[৫] রাজারা অনেক সময় জাতি উঠাইতে বা নামাইতে পারিতেন। কহলুর নামে ক্ষুদ্র রাজ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজা কোলিদের ক্ষত্রিয় বানাইয়াছিলেন।[৬]

ঐঝীর (Aijhi) মিশ্রবংশীয় ব্রাহ্মণেরা ছিল লুনিয়া, অসোথরের রাজা ভগবত রায় তাঁহাদিগকে পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করেন।[৭]

গোরক্ষপুরের বনজারারা ব্রাহ্মণ বনিয়া গিয়া শুক্ল পাণ্ডে মিশ্র প্রভৃতি উপাধি লইয়াছে (ঐ)। উনাওর রাজা তিলকচাঁদ তৃষ্ণার্ত হইয়া একজনের হাতে জল খান। তাহার জাতি লোধা। রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দেন। তাহারাই আমতাড়ার পাঠক ব্রাহ্মণ।[৭]

উনাওর মহাওর রাজপুতরা ছিল বেহারা। যুদ্ধে আহত রাজা তিলকচাঁদকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারণ করায় তিনি তাহাদিগকে রাজপুত করিয়া দেন। এই জেলাতেই ডোমওয়ার রাজপুতগণ পূর্বে ছিল ডোম।

১ *What the Castes are*, Vol. II, p. 120

২ *Ibid.*, p. 122

৩ *Ibid.*, p. 109

৪ Campbell, *Indian Ethnology*, p. 259 ; Crooke, *Tribes and Castes of N. W P. and Oudh*, Vol. I, p. xxi

৫ Campbell, p. 260

৬ *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab, N. W. P. and Frontier Provinces*, Vol. I, p. iv

৭ Crooke, *Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh*, Vol. I, p. xxi

এমনিই তো বহু রাজপুত জাঠ ও গুজরগণ সীদীয় অর্থাৎ শকজাতীয়।

South Indian Inscriptions, Vol. III (পৃ. ১১৪-১১৭) পুস্তকে শিবব্রাহ্মণ নামক এক বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়। (Ghurye, পৃ. ৯৮)

কুণ্ড ব্রাহ্মণদের উৎপত্তির কথা Crookeও এইরূপই লিখিয়াছেন।[১] ঐঝীর ব্রাহ্মণদের কথা এই পুস্তকেও আছে।[২] ওঝা ব্রাহ্মণেরা পূর্বে দ্রবিড় বাইগাজাতি ছিল।[৩] ভুঁঞিয়া ও তগা ব্রাহ্মণদেরও ঐ রকমেরই ইতিহাস। ওঝাদের কথা একটু বিস্তৃতভাবে আছে ঐ পুস্তকের চতুর্থখণ্ডে (পৃ. ৯৩)।

শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা জয় করিয়া দেশে ফিরিতেছেন তখন বাঁশদা রাজ্যে পতরবাড় নামক স্থানে যজ্ঞ করিতে গিয়া ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায় এইরূপ ১৮০০০ পাহাড়ী লোককে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলা হয়। হয়তো নূতন ব্রাহ্মণেরা ঐ দেশের পুরাতন ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই সব গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন। নওসারীর অন্তর্গত অনবল গ্রামের নাম হইতে ইহাদের আনবলা বা অনাবিলা বলে।[৪] চিৎপাবনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই রিপোর্টেও দেখা যায় পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যজ্ঞ করিতে চাহিলেন। শ্রাদ্ধকার্যের জন্যও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইল। ব্রাহ্মণ যখন পাওয়া গেল না তখন কৈবর্তের গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করা হইল। চিতার কাছে দাঁড়াইয়া এই কাজ হয় তাই তাঁহারা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ।[৫] বড়োদা Censusএর পুস্তকে নাগর ব্রাহ্মণদের বিষয়ে দেখা যায় যে তাঁহারা নাকি নাগবংশজাত। আবার মতান্তরে তাঁহারা শিববিবাহের জন্য উদ্ভূত। কেহ বলেন শিবযজ্ঞের জন্য নাগরদের সৃষ্টি।[৬] তপোধন ব্রাহ্মণদের লোকেরা তুচ্ছ ভাবে "ভরড়া" বা ভরটক বলিয়া উল্লেখ করে। তাঁহারা শিবমন্দির ও দেবমন্দিরের পূজারী। শিবমন্দিরের পূজারী ও শিবপ্রসাদভোজী বলিয়া তাঁহারা পতিত। ইঁহাদের মধ্যে এতদিন বিধবাবিবাহ চলিত ছিল। এখন সামাজিক সম্মানের লোভে ইঁহারা তাহা বন্ধ করিতেছেন।[৭] ব্রাহ্মণদের মধ্যে

১ *Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh*, Vol. I, p. xxi
২ *Ibid.*
৩ *Ibid.*, p. xxii
৪ *Census of India*, XIX, Baroda, Pt. 1, 1932, p. 481
৫ *Ibid.*, p. 433
৬ *Ibid.*, p. 434
৭ *Ibid.*, p. 435

বিধবাবিবাহের কথা রিজলী সাহেব তাঁহার People of India গ্রন্থে দেখাইয়াছেন (পৃ. ৯২)।

পাঞ্জাবে দেখা যায় বহু ব্রাহ্মণবংশ ক্রমে ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছে। কাংড়া পর্বতের রাজপুতেরা, কোটলের বঙ্গাহলের ও জস্বালের রাজপুতেরা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জস্বালের পুরোহিত বংশীয়েরা তাঁহাদেরই পুরাতন জ্ঞাতিবংশ।[১]

আবার অষ্টবংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ যদি শূদ্রকন্যা বিবাহ করেন, তবে পাঁচ-ছয় পুরুষ পরে ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বিবাহ হইতে থাকিলে সন্ততিরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া যান।[২] ঠিক এইরূপ বিধান পূর্বকালে শাস্ত্রেতে দেখা যায়। লাহৌলের ঠাকুররাও যদি কানেত কন্যা বিবাহ করেন তবে কয়েক পুরুষ পরে তাঁহাদের সন্ততি ঐ ভাবে বিশুদ্ধ ঠাকুর হইতে পারেন।[৩] ব্রাহ্মণরাও কানেত কন্যাকে বিবাহ করিলে এইরূপই হয়। লাহৌলের ঠাকুরেরা আসলে মঙ্গোলীয়, এখন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বনিয়া গিয়াছেন। মগীয়রা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।[৪] শকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা বিদেশী, প্রথমে তাঁহারা সূর্যমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। আভীর ব্রাহ্মণও পাঞ্জাবে দেখা যায়। গুজরগৌড় ব্রাহ্মণরাও নাকি এশিয়া ও ইউরোপের সীমান্তভাগ হইতে আগত।[৫] মৈত্রকরা হূণদের সঙ্গে ভারতে আসেন।[৬] নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে মিত্র দত্ত প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়।[৭]

শিবল্লী ব্রাহ্মণরা অহিক্ষেত্র হইতে তুলু দেশে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম থাকাতে তাঁহারা বাণ্ট প্রভৃতি নীচ জাতির কন্যা বিবাহ করিতেন। মাধ্বাচার্যের সময় আরও অনেক নূতন তৈয়ারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। মত্তি ব্রাহ্মণেরা পূর্বে ছিলেন মোগার (কৈবর্ত), পরে একজন সন্ন্যাসীর প্রসাদে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া যান।[৮] স্থানীয় গ্রন্থে ও পুরাণে পাওয়া যায় কদম্ববংশীয়

১ *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab, N. W. and Frontier Provinces*, Vol. I, p. 41

২ *Ibid.*, p. 41

৩ *Ibid.*, p. 42

৪ *Ibid.*, p. 44

৫ *Ibid.*, p. 46

৬ *Ibid.*, p. 47

৭ *Ibid.*, pp. 47-48

৮ Thurston and Rangachari, *Castes and Tribes of Southern India*, Vol. I, p. xlv ; Vol. V, p. 68

ময়ূরবর্মার সময়ে অন্ধ্র ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণ কর্ণাটে আসিয়া বাস করেন। যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণ সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় কতকগুলি অব্রাহ্মণ জাতিকেও ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। সেই সব গোত্রের নাম গাছ বা জন্তুর নামে। ময়ূরবর্মার সময় ৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি।[১] অনেক নীচ জাতি ক্রমে ক্রমে আচার ব্যবহারের গুণে ব্রাহ্মণ বনিয়া গিয়াছে। দ্রবিড় জাতিদের মধ্যে ইহা প্রায়ই ঘটিয়াছে। রাজাদের আদেশেও অনেক সময় এইরূপ ঘটিয়াছে। মহীশূরের মারক ব্রাহ্মণেরা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।[২]

নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা এখন ভারতের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও শ্রেষ্ঠতাভিমানী শ্রেণী। অনেকের মতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মৎস্যজীবী ছিলেন। বিবাহের সময় এখনও তাঁহাদের মধ্যে আচারানুরোধে মাছ ধরিতে হয়। শিবল্লী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এইরূপ আচার আছে।[৩] উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা দ্রবিড় ব্রাহ্মণদের পতিত মনে করে, তাহাদের হাতের জল খায় না অথচ অন্য নীচতর বর্ণের হাতে জল খায়।[৪] কত কৈবর্ত হইয়া গেল ব্রাহ্মণ, অথচ মুত্রাচ কৈবর্তেরা ছিল শুদ্ধ ক্ষত্রিয়, লোভে মাছ ধরিতে গিয়া তাহাদের জাত গেল। এখন তাহারা কৈবর্ত।[৫] তাহাদের জল ও স্পর্শ এখন অশুচি।

তুলুদের ঐতিহ্য অনুসারে দেখা যায় পরশুরাম কেরলের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। অহিক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁহার বনিল না। তিনি জালের সুতা লইয়া জালিকদের গলায় পৈতা পরাইলেন। তাহারা ব্রাহ্মণ বনিয়া গেল।[৬] নাগমাচী ব্রাহ্মণদেরও ইতিহাস এইরূপই। ভোদ্রী ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ ছিল নাপিত। ভোদ্রী কথার অর্থই নাপিত।[৭] দক্ষিণ দেশীয় আরাধ্য ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি করে। প্রয়োজন হইলে উত্তর সরকারের নিয়োগীদের

১ *Castes and Tribes of Southern India*, pp. xlv, xlvi

২ *Ibid.*, pp. liii, liv, 367

৩ *Ibid.*, Vol. V, pp. 202-203 ; Vol. II, p 330

৪ *Ibid.*, Vol. I, p. 386

৫ *Ibid.*, Vol. V, p. 130

৬ *Ibid.*, Vol. I, pp. 373-74 ; Vol. II, p. 330

৭ *Ibid.*, p. 388

কন্যা নেয়। ইহাতে মনে হয় তাহারাও বোধ হয় জাতিতে নিয়োগী ছিল।[১] অথচ খকড়ো ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করাতে পতিত হইয়া গেল।[২] অদিকল ব্রাহ্মণেরা ভদ্রকালী দেবীমন্দিরের পূজারি, মদ্যপান করায় তাহারা পতিত হয়।[৩] উন্নীরাও এইরূপ পতিত দেবল শ্রেণী।[৪] তম্বলরাও দেবল। গোদাবরী কৃষ্ণা ও নেল্লোর জেলায় তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তৈলঙ্গ দেশের অন্য ভাগে তাহারা শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞাত।[৫] কম্মালনরা নিজেদের বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা বেরি চেট্টী নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান।[৬] ক্ষত্রিয়েরা প্রাচীনকালে সকল প্রকার শিল্পকার্য ও শিল্পীদের ঘৃণা করিতেন।[৭] Mysore Tribes and Castes গ্রন্থেও ইহাদের কথা আছে।[৮]

দক্ষিণ ভারতে ক্ষত্রিয়েরা খুব সংস্কৃতিপ্রাপ্ত ও সুপণ্ডিত শ্রেণী। নম্বুদ্রিদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদি হয়।[৯]

ভারতের অনেক প্রদেশে কৃষকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। অন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে বলেন যে "উহারা পূর্বে ছিল চাষা, এখন হইয়াছে ব্রাহ্মণ।" তাই তাঁহাদিগকে বেদাধ্যয়ন ও যজন যাজনের অধিকারী মনে করেন না। গুজরাটের ভাতেলা ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রের সেনবী ব্রাহ্মণ, কর্ণাটের হৈগা ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যার মহাস্থান বা মস্তান ব্রাহ্মণ এই জাতীয়।[১০] উড়িষ্যার "কাম" ব্রাহ্মণরাও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত।[১১] শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও পূর্বে এই দেশে ছিলেন না। তাঁহারা পারসিকদের পুরোহিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহাদের ভাল অধিকার ছিল। এদেশে আসিয়া ক্রমে

১ *Castes and Tribes of Southern India*, p. 53

২ *Ibid.*, Vol. II, p. 166

৩ *Ibid.*, p. 3

৪ *Ibid.*, Vol. VII, p. 221

৫ *Ibid.*, p. 5

৬ *Ibid.*, Vol. III, p. 116

৭ *Ibid.*, p. 116

৮ *Ibid.*, Vol. IV, pp. 453-55

৯ *Ibid.*, Vol. IV, pp. 84-85

১০ Wilson, *What Caste is ?*, Vol. I, p. 52

১১ *Census of India*, Vol. VI, p. 349

তাঁহারা শাকদ্বীপী নামে পরিচিত হন।[১] বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভুঞিহাররাও ব্রাহ্মণত্ব দাবী করেন। তাঁহাদের ভূমিকর্ষণ বৃত্তি হওয়াতেই নাকি তাঁহাদের পাতিত্য ঘটে।

কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদের ও মালাবারের ব্রাহ্মণদের মধ্যে চক্ষুর বর্ণ অনেক সময় দেখা যায় কোমল নীল বা ধূসর (pale blue or grey)। ভারতীয়দের মধ্যে তাহা দেখা যায় না অথচ সেই দেশীয় Syrian Christian-দের মধ্যে তাহা দেখা যায়। তাহাতে অনেক কথাই মনে আসে।[২]

এখন ভারতের নানা প্রদেশে উচ্চতর অন্যান্য বর্ণদের চেহারা হইতে ব্রাহ্মণদের চেহারা কি সব সময় ভিন্ন বলিয়া চেনা যায়?

সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভোজকেরা জ্বালামুখীবাসী। সে দেশের অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বলেন ভোজকেরা পূর্বে ছিলেন চাষা। মন্দিরের ভৃত্যের কাজ করাতে ক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন।[৩]

মাররাড় বীকানের প্রভৃতি স্থানে ডাকোট নামে এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রাহ্মণ পিতা ও আহীর মাতা হইতে তাঁহাদের জন্ম। তাঁহারা শনিপূজা করেন ও হীনদান গ্রহণ করেন।[৪]

গরুড়িয়া ব্রাহ্মণেরাও শনির দান নেন। রাজপুতানায় তাঁহাদের বাস। আজমীরে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে চামার কন্যার গর্ভে তাঁহাদের জন্ম।[৫]

রাজপুতনায় "আচারজ" বা আচার্য ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশের অগ্রদানীর মতো। তাঁহাদের বেদ কি ও উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা কেহই জানেন না, তাঁহারাও জানেন না।[৬]

ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ছিলেন, ব্যাসের কথাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হন।[৭]

১ *Census of India*, Vol. VI

২ *Ibid.*, Vol. I, p. 491

৩ p. 183

৪ p. 178

৫ p. 174

৬ p. 175

৭ p. 215

এক সময় অস্পৃশ্য মাদিগা জাতি ও বৈশ্য কোমাতি জাতি হয়তো একই ছিল।[১]

যুগী বা নাথেরা তো পূর্বে বেদ-স্মৃতি-শাসিত হিন্দু ছিলেন না। নাথধর্ম একটি পুরাতন ধর্ম। মধ্যযুগে ইঁহাদের অনেকে বাধ্য হইয়া মুসলমান হন, তাঁহারাই জোলা। ইঁহাদের পৌরোহিত্য ইঁহারা নিজেরাই করিতেন। ব্রাহ্মণ ছিল না। পরে ক্রমে এইরূপ হইয়াছে যে যিনি যখন পুরোহিত হইতেন তিনি তখন গলায় পৈতা লইতে সুরু করিতেন। তাহাতে সমাজে একটা তুমুল আন্দোলন হইল। ত্রিপুরা জেলায় কৃষ্ণচন্দ্র দালাল এই সূত্রধারণটা বেশি চালাইলেন—তাই কথা আছে—

"যুগীর বামনের পৈতা আছিল কোন্ কালে ?
যুগীরে তো পৈতা দিল কৃষ্ণচন্দ্র দালালে।"

এখন তাঁহাদের কেহ কেহ বিদেশে গিয়া প্রথমে পণ্ডিত, পরে শর্মা, ও আরও পরে উপাধ্যায় হইয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি ঘটনা আমার নিজের জানা আছে।

পরবর্তী যুগে বাংলার নাথ যোগীরা অনেকে বড় বাউল হইয়াছেন। পশ্চিম ভারতে এই যোগীরাই মুসলমান হইয়া জোলা হইয়াছে। কবীর প্রভৃতিও এই শ্রেণীর মানুষ। এক সময় জোলারা অনেকেই সাধু বা সন্ন্যাসী হইতেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেক সময় তাঁহাদেরও উল্লেখ হইত। তাই তুলসীদাস বলেন,

"ধূত কহৌ অবধূত কহৌ রজপূত কহৌ জোলহা কহৌ কোউ।"
(রামচরিত মানস, রামনরেশ ত্রিপাঠী, ভূমিকা, পৃঃ ২১)

এই জোলাসন্ন্যাসীরা অনেকে পরে গৃহস্থ হন। এখনও কাশীর আলাইপুরার জোলারা নিজেদের গৃহস্থ বলেন। রায় সাহেব কৃষ্ণদাসও এই কথা তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন। বাংলার যুগীরাও গৃহস্থ যোগী।

তামিল ও তাঞ্জোর প্রদেশে পত্নুলকারন তাঁতিদের বাস। তাঁহারা গুজরাটের আদিম অধিবাসী। তাই তাহাদিগকে সৌরাষ্ট্রিক বলে। তাঁহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন।[২] তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন এবং আয়ার আয়াঙ্গার প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করেন।[৩] পটেগর জাতিও ঠিক এইরূপ গুজরাত হইতে আগত একশ্রেণীর বয়নজীবী। শিবের জিহ্বা হইতে তাঁহাদের জন্ম। মানুষের লজ্জা

১ Thurston, Vol. I, p. 327
২ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. IV, p. 474
৩ *Ibid.*, p. 475

রক্ষার জন্য বস্ত্র বয়নের আদেশ পাইয়া তাঁহারা এখন সেই কাজই করেন। ব্রহ্মা হইতে জিহ্বাজাত তাঁহাদের আদিপুরুষ বেদ ও উপবীত প্রাপ্ত হন।[১] শালে জাতিরও ঠিক এই কথা, তাঁহারাও বয়নজীবী। তাঁহারাও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন, কেহ কেহ শাস্ত্রী পদবীও ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণদের মতই ইহাদেরও নিজস্ব শাখা, সূত্র ও গোত্র আছে।[২]

আসামে "বরিয়া"জাতি নিজেদের "সূত" বলিয়া এখন পরিচয় দেয়।[৩] পূর্বেই বলা হইয়াছে কাছারীরা হিন্দুগুরুর মন্ত্র লইয়া শরণিয়া হয়। তারপর সরু কোচ তারপর বড় কোচ হইয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে।[৪] এখন এই ভাবে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা এই সব দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। আহোম ও ব্রাহ্মণদের সংসর্গে নাকি গণকদের জন্ম। গণকেরা এখন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন।[৫]

সেংগর রাজপুতরা শৃঙ্গী ঋষির বংশ বলিয়া দাবী করেন। ইহারা বোধ হয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ করিয়া পরে রাজপুত হইয়া গিয়াছেন।[৬] তাঁহারা বলেন তাঁহারা রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বঙ্গদেশ হইতে আহূত ব্রাহ্মণের বংশ। কোনো কোনো মতে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও পরিণীতা বেশ্যার গর্ভে তগা ব্রাহ্মণের জন্ম। তগারা সমাজে হীন হইলেও ব্রাহ্মণের মতই আচার পালন করেন।[৭] ভূঁইহার ব্রাহ্মণরা খুব সম্ভব পূর্বে গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন, কৃষিকর্মের জন্য ইহারা পতিত।[৮] অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর মতে দক্ষিণ ভারতের ভাটেরা হয়তো ব্রাহ্মণই ছিলেন পরে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পতিত হইয়াছেন।[৯]

দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও দরজীরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। তাঁহারা নাকি পরশুরামের ভয়ে জাতি লুকাইয়াছিলেন।[১০]

১ *Mysore Tribes and Castes,* Vol. IV, pp. 476-77
২ *Ibid.*, pp. 559-560
৩ *Census of India,* 1921, Vol. III, Assam, Pt. 1, p. 143
৪ *Ibid.*, 1931, Vol. III, Pt. 1, p. 221
৫ *Census of India,* Vol, III, Pt. 1, p. 144
৬ Crooke, *N. W. P. and Oudh,* Vol. IV., pp. 312-13
৭ *Ibid.*, pp. 351-53
৮ *Ibid,* এবং Vol. I. p. xxii
৯ *Mysore Tribes and Castes,* Vol. II, p. 276
১০ *Ibid,* Vol. III, p. 77

পাঞ্জাবের পুরাতন কথাতে পাওয়া যায় ডোমদের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সকলের হিতের জন্য মৃত গরু সরাইতে গিয়া তাঁহার জাতি গেল।[১]

এই রকম আর একটি উপাখ্যানও আছে। এক রাজার নাকি দুই কন্যা ছিল। তাহাদের একের পুত্র ছিল খুব বলবান। অন্যের পুত্র ছিল দুর্বল। দেশে এক হাতী মারা গেল। বলবান পুত্র হাতীর মৃতদেহ লোকহিতার্থ একাই সরাইল। দুর্বল ভাইটির পূর্বেই মনে মনে ঐ ভাইয়ের প্রতি হিংসা ছিল। সে ভাইকে এইজন্য পতিত করিল, তাহারাই চামার।[২] মৃত পশু বহন করা তাহাদের কাজ।

ঢেড় গুজরাটের অস্পৃশ্য জাতি। তাহারা বলে যে তাহাদের জন্ম ক্ষত্রিয় হইতে। পরশুরামের ভয়ে তাহারা জাতি লুকাইতে বাধ্য হইয়াছিল।[৩] তাহাদের চেহারা সুন্দর। গোত্রাদিও ঠিক রাজপুতদেরই মত।[৪]

ভূপাল প্রদেশ হইতে পণ্ডিত ইশ নারায়ণ জোশী শাস্ত্রী মহাশয় সেদিন আমাকে একটি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে সে দেশের জীনগর বা চিত্রকরগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া চালাইতে চাহেন। অথচ বৃদ্ধেরা জানেন যে তাঁহারা আসলে মুচী জাতি।

পাঞ্জাবে তগাদের মত অনেক ব্রাহ্মণের পতিত হইতে হইয়াছে কৃষিকার্য করার দরুন।[৫] পাহাড়ে থাবি জাতি সেদিনও ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু শিল্পজীবী হইতে গিয়া তাহারা পতিত হইল।[৬] দিল্লী প্রদেশের ধারুকৃরা ভাল ব্রাহ্মণ ছিল, বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত করিতে গিয়া পতিত হইল।[৭] ওদেশে বৃত্তির দ্বারা একই শ্রেণীর কেহ কায়েথ, কেহ বানিয়া, কেহ কৃষিকর্ম করিয়া জাঠ, কেহ রাজপুত বনিয়াছে। রাজারা সেদেশে গির্থ প্রভৃতি হীন জাতিকে অনেক সময় প্রসন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় বানাইয়াছেন।[৮] পাঞ্জাবের পার্বত্য প্রদেশে অনেক রাজপুত পরিবার পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ সব দেশে জাতিটা এখনও যেন তরল, দিনে দিনে তার

১ Crooke, *N. W. P. and Oudh*, Vol. II, p. 315
২ *Ibid.*, Vol. I, p. 22
৩ *Census of India*, 1931, Vol. XIX, Baroda, Pt. 1, p. 479
৪ *Ibid.*
৫ *Punjab Castes*, p. 6
৬ *Ibid.*; *Glossary of Tribes and Castes of the Punjab and N. W. F. Province*, Vol. III, p. 465
৭ *Ibid*, *People of India*, p. cxxx
৮ *Ibid.*, p. 7

ক্ষেত্র ও কাল ও পাত্র অনুসারে অদল বদল হয়। দিল্লীর চৌহানেরা বিধবা বিবাহ দিয়া রাজপুত হইয়াও পতিত হইয়াছে। যাহারা স্ত্রীলোকদের পর্দায় রাখে তাহারা রাজপুত হইয়া যায়, যাহারা রাখে না তাহারা জাঠ থাকে। একদল রাজ-পুত তরীতরকারী উৎপন্ন করিতে গিয়া হুশিয়ারপুরে অতি হীন অরাইন জাতি হইয়া গিয়াছে। রেওয়াড়ীর একদল আহীর বিধবাবিবাহ ত্যাগ করিয়া নারীদের পর্দার ব্যবস্থা করিয়া এবং অন্য আহীরদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছে। ক্রমে ইহারা রাজপুত বনিয়া যাইবে।[১]

রাজপুতানা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা আধা হিন্দু আধা মুসলমান বহুশ্রেণীর গুরু। আজমীর মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর সমাধিস্থানে তাঁহাদের অনেককে দেখা যায়।[২]

বেশি দিনের কথা নহে, রাজা ঘোরিট নরর্জের সময় একজন সন্ন্যাসী মণিপুরে গিয়া তাহাদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তন করিলেন। ওদেশে যে কয়েকজন বাঙালী ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন তাঁহারা মণিপুরী কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাদের সন্তানেরা মণিপুরী ব্রাহ্মণ।[৩] এখনও সেখানে হিন্দুর মধ্যে কাছারী কোচেরা যে আসিতেছেন সেকথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।[৪] মণিপুরের রাজা ও রাজবংশীয়েরা এখন হইলেন ক্ষত্রিয়, আর কিছু সংখ্যা হইলেন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। এই সব কথা মাত্র দেড় শত বৎসরের।[৫] এখন মণিপুরীদের বর্ণাশ্রম নিষ্ঠা এত দৃঢ় যে ভারতীয় কোনো প্রাচীন সনাতনী হিন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে সেখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! মাত্র দেড়শত বৎসরেই এত দূর!

১৯৩২ সালে Indian Antiquary পত্রিকায় Prof. D. R. Bhandarkar একটি বিস্তৃত লেখা বাহির করেন (পৃ. ৪১-৫৫ এবং ৬১-৭২)। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা এবং বাংলাদেশের কায়স্থেরা মূলত এক। নাগরদের মধ্যেও সেই সব গোত্র ও উপাধি যথা, দত্ত, ঘোষ, নাগ, মিত্র ইত্যাদি। ভূতি, দাম, দাস, দেব, পাল, পালিত, সেন, সোম, বসু প্রভৃতি উপাধিও আছে (পৃ. ৪৩)। শ্রীহট্টের নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সন্ধান পাওয়াতে এই যোগসূত্রটি

১ *Punjab Castes*
২ *Census of India*, Vol. I, pp. 29, 134
৩ *Census Report of India*, Vol. VI, p. 349
৪ *E. R. E.*, Vol. II, pp. 138-39
৫ *Census Report of India*, Vol. VI, p. 221

ধরিবার খুবই সুবিধা হইয়াছে (পৃ. ৪৩)। প্রাচীন তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ভূতি, চন্দ্র, দাম, দাস, দত্ত, দেব, ঘোষ, মিত্র, নন্দী, সোম প্রভৃতি আছে। উড়িষ্যায় কটকে নেউলপুরে প্রাপ্ত শাসনে ব্রাহ্মণের উপাধি দেখা যায়—ভূতি, চন্দ্র, দত্ত, দেব, ঘোষ, কর, কুণ্ড, নাগ, রক্ষিত, শর্মণ, বর্ধন প্রভৃতি। এই শাসনটি ৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সম্পাদিত (ঐ, পৃ. ৪৪))। সেন রাজারাও ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া ক্ষত্রিয়-বৃত্তিযুক্ত ছিলেন। তাই মাধাইনগর তাম্রশাসনে লক্ষণসেন নিজ পরিচয় দিয়াছেন পরম ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া (ঐ, পৃ. ৫২)।

শ্রীহট্টের সর্বত্র দাশদের বাস। পূর্বে তাঁহারা জল-আচরণীয় ছিলেন না। এখন তাঁহারা হবিগঞ্জ ছাড়া অন্যত্র জল-আচরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের ব্রাহ্মণেরা এখনও জল-আচরণীয় নহেন। এক মালীর গলায় নাকি পৈতা দিয়া রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করেন। সেই বংশই দাশদের পুরোহিত। কৈবর্তরা জলচল, অথচ তাহাদের ব্রাহ্মণেরা জলচল নহেন এই কথা লালমোহন বিদ্যানিধিও লিখিয়াছেন।[১]

দেবল ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলেই বৃত্তিহেতু পতিত হইয়াছেন। কাশীর গঙ্গাপুত্রেরা তীর্থগুরু হইলেও অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বীকৃত হন না। গয়ালী ব্রাহ্মণদেরও সেই দশা। অনেকের মতে তাঁহারা অনার্যদের ব্রাহ্মণ।[২] অথচ হিন্দুরা এমন কি ব্রাহ্মণেরাও তীর্থযাত্রাতে গয়ায় তাঁহাদের চরণপূজাও করেন। দ্বারকায় তীর্থগুরুরা গুগলী বা গোকুলী ব্রাহ্মণ। তীর্থগুরু হইলেও তাঁহারা পতিত।[৩] মথুরার চৌবেদেরও আচার ব্যবহার ও বিবাহাদি সম্বন্ধ নাকি আর্যোচিত নহে।

বাংলা দেশে আচার্য বা গণক ব্রাহ্মণেরা পতিত। অন্যত্র শাকদ্বীপীয়দেরও সেই দশা। বাংলা দেশের বর্ণব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের পৌরোহিত্য বশতঃ পতিত হইয়াছেন। অগ্রদানীরা শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করাতে পতিত।[৪] ভাট ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে অতি হীন। রাজপুতদের মধ্যে চারণদের খুব সম্মান। কিন্তু তাঁহারা ঠিক ব্রাহ্মণ নহেন। রাজপুতদের সঙ্গে চারণদের কোনো কোনো শাখায় বিবাহাদি চলে।[৫] শ্রীহট্টের ভাটেরাও বোধ হয় তাই, স্বদেশে তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত।

১ সম্বন্ধ নির্ণয়, পৃ. ১৯২
২ *E. R. E.*, Vol. III, p. 233
২ What Caste is ?, Vol. II, p. 108
৪ *Ibid.*, p. 213
৫ *Ibid.*, p. 181

পূর্বেই বলা হইয়াছে কখনও কখনও রাজারাও কোনো জাতিকে হীন বা উচ্চ করিতে পারিতেন। বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের পতিত করেন। বল্লালচরিতে আছে রাজা দম্ভভরে কহিয়াছিলেন—"যদি দাম্ভিকান্ সুবর্ণবণিজঃ শূদ্রত্বে ন পাতয়িষ্যামি...গো-ব্রাহ্মণঘাতেন যানি পাতকানি তানি মে ভবিষ্যন্তি।" "যদি সুবর্ণবণিকদের শূদ্রত্বে পাতিত না করি তবে আমার গোবধ ব্রহ্মবধের পাপ হইবে"। আবার তিনি কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার, কামারাদি অনাচরণীয় জাতিকে জলচল করেন।[১]

নাম্বুদ্রিদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র নম্বুদ্রি কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; অন্য ভাইরা নায়ার বা ক্ষত্রিয়কন্যার সঙ্গে বাস করেন। কাজেই বহু নম্বুদ্রি কন্যা ও বহু নায়ার পুরুষ বিবাহিত জীবনের খবর রাখেন না।[২] নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা ভীষণ আচারপরায়ণ কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে খান, নম্বুদ্রি নারীরা খান না।[৩]

তুলুব বা তুলব ব্রাহ্মণেরাও তামিলদেশে নম্বুদ্রিদের মতই সম্মানিত। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারই সেই দেশের মালিক। সেদেশের ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের সঙ্গে সহবাস করিতে একমাত্র তাঁহাদেরই অধিকার। কুমলীর রাজাদের কন্যাগণের সঙ্গে তুলব ব্রাহ্মণের সহবাসে যে পুত্র জন্মে তিনিই কুমলীর রাজা হইতে পারেন। রাজকন্যা ইচ্ছা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ বদলাইতেও পারেন।[৪]

ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কোথাও কোথাও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ঔদীচ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীমালী ব্রাহ্মণেরা বিধবাদের বিবাহ দেন।[৫] বগড়-ঔদীচ্যরা বিধবাবিবাহ দেন, তাই তাঁহারা হীন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে হলরদের ঔদীচ্যদের সম্বন্ধ হয় এবং হলরদের সঙ্গে কুলীন সিদ্ধপুরীদের সম্বন্ধ চলে।[৬] গুজরাট কাঠিয়াওয়াড়ের সিদ্ধব সারস্বতদের মধ্যেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত। তাঁহারা যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ।[৭]

১ বল্লাল চরিত, পৃ. ২৩
২ Wilson, *Indian Caste*, pp. 75-76
৩ *Ibid.*, p, 76
৪ *Ibid.*, p, 70
৫ *Ibid.*, p. 98
৬ *Baroda Census*, 1931, p. 432
৭ *Ibid.*, p. 105

W. Crooke বলেন যে, রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু আর্যপূর্ব জাতির মিশ্রণ দেখা যায়।[১] মধ্যভারতে গোণ্ডজাতি ক্রমে রাজপুত বনিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যা প্রদেশে অল্পকাল পূর্বেও বহু শ্রেণী রাজপুতজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। বাইগা (Baiga) নামে ভূতের ওঝারা ছিল অনার্য, ক্রমে তাহারা হইল ব্রাহ্মণ ওঝা।[২]

গুর্খাদের খস জাতির মধ্যে উচ্চ বর্ণ নিম্ন জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারে। সন্তান হয় একধাপ নিচের জাতি।[৩]

পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীর মধ্যে বিধবাবিবাহ চলে।[৪] লোহানাদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ চলে। তাহারা উপবীত ধারণ করে। তাহাদের পুরোহিত সারস্বতেরা তাহাদের সঙ্গে খায়। ভাটিয়াদের রীতিও কতকটা এই রকম।[৫] গুজরাতের সারস্বতদের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে।[৬]

ভারতের অনেক প্রদেশেই কুনবীরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্ষত্রিয় বনিয়াছে।[৭] জাতিগত বহু নড়চড়ের খবর ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেখা যায়।[৮]

১ *Tribes and Castes of N. W. P. of India*, p. 201
২ *Ibid.*, Vol, IV, p. 93
৩ Campbell, p. 318
৪ *Ibid.*, p. 403
৫ *Baroda Census*, 1931, p. 449
৬ Crooke, IV, p. 290
৭ Risley, *People of India*, p. 86
৮ *Ibid.*, p. cxxx

১৭

জাতিভেদের প্রচণ্ডতা ও পসার

ভারতে ক্রমে জাতিভেদ এমন দৃঢ়মূল হইল যে লোকেরা মনে করিল যে দেবতা-দেরও জাতি আছে। মহাভারত বলেন ব্রহ্মার পুত্র হইলেও কর্মের গুণে ইন্দ্র ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপ্ত হইলেন।[১]

জাতিভেদ এখন ভারতের মজ্জায় মজ্জায়। এইখানে এই প্রথার গায়ে হস্তক্ষেপ করিতে কোনো সম্প্রদায়ই সাহস পায় না। রাজা রামমোহন রায়ও জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া ভিন্ন একটি সম্প্রদায় স্থাপনের কথা ভাবেন নাই। তবে বর্ণভেদের মধ্যে আর কোনো অন্যায় বা অত্যাচার তিনি পছন্দ করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও জাত পাঁত ভাঙিয়া নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা মনে করেন নাই। পরে যখন কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজ নামে জাতিবর্ণহীন সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে গেলেন তখনই দেশের সঙ্গে ভয়ঙ্কর গোল বাধিল। এমন সময় পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমতের বাণী দেশে উপস্থিত হইল। সকলে সেই দিকে ঝুঁকিলেন। পরমহংসদেবের ধর্মসাধনার ভক্ত হইলেও বিবেকানন্দ ছিলেন ছুৎমার্গ ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে। লোকেরা তাঁহার সেইটুকু দিব্য বাদ দিয়া লইল। আর্যসমাজে নূতন করিয়া গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি ভাগ করার চেষ্টা হইল, কিন্তু ফলবতী হইল না। এখন জাতিভেদকে বাদ দিবার চেষ্টা লোকে মনে করে হিন্দুধর্মকেই বাদ দেওয়া। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এখন ভারতীয় আর্যধর্ম জাতিভেদ প্রথার দ্বারা এমন ভাবে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে এই বন্ধন হইতে মুক্তির কথা এখন কেহ চিন্তাই করিতে পারেন না।

বৌদ্ধেরাও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে হাজার হাজার বছর লড়িয়া অবশেষে হার মানিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা নিজেরাই সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। জৈনেরা প্রথমে জাতিভেদ না মানিলেও ক্রমে তাহার সহিত রফা করিয়া ভারতে এখনও টিকিয়া আছেন। তাঁহাদের শ্বেতাম্বর-দিগম্বর ভেদ তো জাতিভেদ হইতেও দৃঢ়বন্ধন।[২] জৈনদের মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি জাতি আছে এবং সাত কি নয় বৎসর বয়সে

১ শান্তিপর্ব, ২২, ১১

২ *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W, Frontier Province*, vol I, p. 105

গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হোম প্রভৃতি করিয়া বালকের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[১] জৈনদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হোম প্রভৃতি করেন।[২] মোট কথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়াও এখন সর্বভাবেই ব্রাহ্মণাচার স্বীকার করিয়াই তাঁহারা ভারতবর্ষে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন।[৩]

ভাগবত ধর্ম হইল ভক্তি ও প্রেম লইয়া। ইহাতে জাতিভেদ থাকার কথা নহে। কিন্তু ভাগবতেরা তাঁহাদের আদর্শ বিষয়ে জাতিপংক্তিকে যতই অগ্রাহ্য করুন না কেন সমাজের ক্ষেত্রে জাতিভেদকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে মানেন "বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতা" ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"। কিন্তু তাহা সুধু ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে, সমাজে তাহা চালাইতে পারিলেন না। মহাপ্রভু প্রেমভক্তির অধিকারে জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ অগ্রাহ্য করিলেও খাওয়ায় দাওয়ায় ও সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর দক্ষিণহস্ত। অদ্বৈতাচার্য ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সমাজ ত্যাগ করিবার মত উৎসাহ তাঁহার ছিল না। এই বিষয়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দের মত অনেক বেশি উদার ছিল। জাত পাঁত তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে নিত্যানন্দ রাজি ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য রাজি হন নাই। একা নিত্যানন্দ বৈষ্ণব সমাজের জাতপাঁত ভাঙ্গিতে পারেন নাই। অদ্বৈতাচার্য অবশ্য সমাজের বাহিরের ক্ষেত্রে খুবই উদার ছিলেন। যবন হরিদাসকে তাই তিনি শ্রাদ্ধপাত্র দিতে পারিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইহা কম কথা ছিল না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ তো শুনা যায় ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের হাতেও ভাত খাইয়াছেন। খাইতে বসিয়া তিনি "এঁটো"র বিচারও করেন নাই। এইজন্য চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লেখেন যে নিত্যানন্দ অবধূত, তাঁহার ইহাতে কিছু আসে যায় না। ("নান্নদোষেণ মস্করী")। পরে যদিও নিত্যানন্দ বিবাহও করিয়াছিলেন তবু অবধূত বলিয়াই সকলে নিত্যানন্দের এই সব ব্যাপারকে মানিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু একটি বড় কাজ করিয়াছেন বহু ব্রাহ্মণকে হীনতর জাতির মন্ত্রশিষ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া। তাহাতে আজিও বৈষ্ণব সমাজে অনেক ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ গুরুর কাছে মাথা নত করিতে হয়।

১ *Mysore Tribes and Castes*, vol III. p. 421
২ *Ibid.*, p. 409
৩ *Ibid.*, p. 463

অন্যত্রও বলা হইয়াছে মহারাষ্ট্রে নামদেব্ তুকারাম প্রভৃতি শূদ্র। নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বর সোপান মুক্তাবাই ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও তাঁহাদের পিতা সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া যে বিবাহ করেন তাহাতে তাঁহাদের জন্ম। কাজেই শাস্ত্রত তাঁহারা পতিত। তাঁহারাও দেখা যায় শূদ্র ভক্তদের প্রতি ভক্তিযুক্ত। তাই তাঁহারা শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের আগে অন্ত্যজদের খাওয়াইয়া ছিলেন। মহারাষ্ট্রেদেশেও শূদ্র ভক্তদের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।[১]

কবীর দাদূ প্রভৃতিরা জাতিভেদকে ভয়ঙ্কর আঘাত করিয়াছেন। না করিলে তাঁহাদেরই নেতৃত্ব উদারমতবাদী লোকে গ্রহণ করিবে কেন? কিন্তু তাঁহাদের পন্থেই এখন দিব্য জাতিভেদ বর্তমান। আচারবিরোধী কবীরের উত্তরকালে তাঁহারই উপসম্প্রদায় উদাপন্থী কবীরমার্গীরা যেরূপ ভীষণ আচারের দাস—তেমন বোধ হয় ভারতের নম্বুদ্রীদের মধ্যেও দেখা যায় না। এই বিষয়ে তবু শিখরা অনেক পরিমাণে সফল হইতে পারিয়াছেন। গুরুগোবিন্দ সিংহের খালসাতে জাতিবর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কলওয়ার অর্থাৎ মদ্যবিক্রেতা কলাল জাতিও ক্রমশ অভিজাত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহাদের মধ্যে মেথর প্রভৃতি শ্রেণীরা আজও বিচ্ছিন্ন। তাঁহাদিগকে "মজহবী" বলে। মুচি ও জোলা শিখদের নাম রামদাসী। সাধারণ শিখসমাজ হইতে ইঁহারা বিভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে কেশধারী ও সহজধারীরা দুই ভাগ। নিরঞ্জনী, নিরঙ্কারী, গঙ্গুশাহী, মীনা, সেবাপন্থী, কূকাপন্থী, নির্মলা, উদাসী প্রভৃতি ভাগও জাতিভেদের ভাগ হইতে কম কড়া নহে।

গোস্বামী তুলসীদাস ছিলেন পরম ভাগবত। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিলেও বাল্যকালে দারুণ দারিদ্র্যবশত সকল জাতির ঘরেই তিনি খাইতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মসজিদে ঘুমাইয়া তিনি দিন কাটাইয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়াবতার রামচন্দ্রের পূজাই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তবু বর্ণাশ্রমের বন্ধনকে তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্রবিড়দেশে ব্রাহ্মণকুলে ভক্ত বসবের জন্ম। পূর্বেও তাঁহার নাম করা হইয়াছে। শিবভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি নূতন সম্প্রদায় তিনি

১ Ghurye, pp. 94-96

প্রবর্তিত করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়। বসব ভীষণভাবে জাতিভেদকে আঘাত করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার সম্প্রদায়ের গুরুরাই জঙ্গম নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আরাধ্য নামে প্রসিদ্ধ এক বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণও আছেন। শুদ্ধ-মার্গ-মিশ্র-অন্তেবে নামে ক্রমে ইঁহাদেরও চারি বর্ণ হইল। যেন সেই পুরাতন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র নূতন চারি নাম ধরিয়া ইহাদিগকে পাইয়া বসিল। অন্ত্যজ শ্রেণীও ইঁহাদের আছে। ফলে দেখা যায় এদেশে একটি নূতন সংস্কারক আসিলে দিনকতক তিনি জাতিভেদকে সরাইয়া দেন পরে তাঁহারাই একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া অগণিত জাতির মধ্যে একধারে বসিয়া পড়েন। এমনি করিয়াই বোম্বাই প্রদেশে বিষ্ণোই, সাধ, যোগী, গোঁসাই, মহনুভাব প্রভৃতি জাতির উদ্ভব।[১]

বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় লইয়া যেমন এক এক জাতি হয় তেমনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায়ও নূতন জাতির উদ্ভব ঘটে। উড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী ছত্রে খাইয়া বহুলোকের জাতি যায়। তাহাদেরই এখন এক জাতি, নাম ছত্রখিয়া অর্থাৎ ছত্রে খাওয়া। সিংহলে বাগানে কুলগিরি করিতে গিয়া চলিয় জাতির উদ্ভব হইয়াছে।[২] উড়িষ্যায় সাগরপেশাও এই রকম এক নূতন জাতি।

মুসলমান ধর্মে কোনোপ্রকার জাতিভেদই থাকার কথা নাই। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও শেখ সৈয়দ মুগল পাঠান প্রভৃতি ভেদ আছে। এই ভেদ ধর্মত না হইলেও ইহার সামাজিক মূল্য আছে। এইজন্য Census of Indiaয় বড়োদার জনসংখ্যা দেখাইতে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান জাতিবর্ণের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[৩] এই সব মুসলমান জাতির মধ্যে বিবাহ ও অন্নজলের বিচার অর্থাৎ "রোটি-বেটি"র বিচার চলে।[৪] মহদবীরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান করে না। বাহির হইতে কন্যা আনিতে হইলে আগে তাহাকে সাম্প্রদায়িক দীক্ষা দিয়া লয় কিন্তু অন্যদের কাছে নিজেদের কন্যা দেয় না।[৫] বোহরা মুসলমানেরা নিজেদের এত শ্রেষ্ঠ

১ Ghurye, pp. 29, 95

২ *Sacred Books of the Buddhists,* Vol. II, p. 98

৩ 1931, vol. XIX, Pt. V, p. 405—Muslim Castes and Races

৪ *Mysore Tribes and Castes,* Vol. IV, p. 290

৫ *Ibid.*, p. 382

মনে করে যে তাহাদের মসজিদে অন্য শ্রেণীর মুসলমান নমাজ পড়িলে তাহারা পরে সেই স্থান ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া লয়।[১]

হিন্দুসমাজ হইতেই অনেক মুসলমান এই দেশে হইয়াছে। অনেক সময়ে তাঁহাদের মধ্যে শিখা-সূত্র-বর্জন ও কল্‌মা পড়া ভিন্ন আর-সব আচারবিচার অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া যায়। মুসলমান রাজপুত গুজর বা জাঠদের আচার ব্যবহার বিবাহাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ সবই ঐ ঐ শ্রেণীর হিন্দুদের মতোই।[২] দক্ষিণ ভারতে লব্‌বইরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি হইতে গৃহীত। তাহাদের বিবাহপ্রথা ঠিক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতিদের মতোই।[৩]

পূর্বে ইংরাজদের লিখিত গ্রন্থে ভারতীয় মুসলমানদের এইসব ভাগ-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। এখন সরকারী সেন্সসে হিন্দুদের বিভাগগুলি বেশি করিয়া ধরা হইলেও মুসলমানদের বিভাগগুলির পরিচয় আর দেওয়া হয় না। তাহাতে রাজনীতিগত সুবিধা থাকিলেও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের অসুবিধা ঘটিয়াছে।

সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশেও দেখা যায় পীরেরা যেন ব্রাহ্মণ, পাঠান ও বিলোকেরা যেন ক্ষত্রিয়, জাঠরা বৈশ্য। তাহা ছাড়া শিল্পীরা শূদ্র, অন্ত্যজ শ্রেণীও আছে।[৪]

মুসলমান সমাজের মধ্যেও জোলা, ধুনিয়া, কুলু, দরজী, হাজাম, কুংজড়া প্রভৃতিদের সামাজিক অবস্থা খুব সুখকর নহে। নিকারী মাহিমাল প্রভৃতিরা মুসলমান-সমাজেও প্রায় অন্ত্যজতুল্য। মুসলমানদের মধ্যেও মোমিনেরা বলিতেছেন, "আমরাই সংখ্যায় এই দেশের মুসমলমান-সমাজের অধিকাংশ, অথচ আমাদের কোনো দাবী নাই দাওয়া নাই অধিকার নাই।" বর্ণহিন্দুদের মতো বর্ণমুসলমানও সংখ্যায় খুব অল্প, যদিও তাঁহারাই শিক্ষিত ও তাঁহাদের সমাজের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন।

তবু তাঁহাদের সমাজে পয়সা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চে উঠা যায় এবং পয়সা না থাকিলে নামিয়াও যাইতে হয়। একটি পারসী শ্লোক আছে

পেঁশাইন কস্‌সাব বুদেম বাদ জান গস্তম শেখ।
গল্লা চু অরজান শবদ ইসলাম সয়্যদ মেশবেম॥

১ *Mysore Tribes and Castes*, p. 386

২ *Punjab Castes*, pp. 13-14 ; Crooke, *Tribes and Castes of N. W. P and Oudh*, Vol. I, p. xxvii

৩ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. IV, p. 391

৪ *Punjab Castes*, p. 15

"প্রথম বৎসরে ছিলাম কসাই, পর বৎসর হইলাম শেখ, যদি এবৎসর শস্যের দাম চড়ে তবে আমি সৈয়দই হইব।"[১]

এই কথারই সমর্থন পাই *Punjab Castes* গ্রন্থে (পৃ. ১০)। *Census Report* বলেন, এই দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দু।[২] তাই তাহাদের মধ্যে জাতিভেদের তুল্য বাঁধাবাঁধি রীতিমতই থাকিয়া যায়। তাহাদেরও পাঠান মোগল সৈয়দ শেখ ভাগ আছে। বোরা, খোজা, মেমনা, জোলা, কুলু প্রভৃতির মধ্যেও জাতিগত বাঁধাবাঁধি কম নহে।

হিন্দুদের অন্নজলের বিচারও তাঁহাদের মধ্যে আছে। শুধু হিন্দুরাই যে মুসলমানের অন্নজল ব্যবহার করেন না তাহা নহে তাঁহারাও মুসলমান ছাড়া অন্যের অন্নজল ব্যবহার করেন না। বীরভূম জেলায় দেখিয়াছি (অন্যত্রও হয়তো আছে) মুসলমানেরা হিন্দুর বাড়ী খাইতে হইলে "পক্কী" অর্থাৎ লুচী মিঠাই প্রভৃতি খাইবেন বা দধি চিড়া খাইবেন, কিন্তু ভাত ডাল খাইবেন না। এই সব

"আজ্য পকং পয়ঃ পকং পকং কেবল বহ্নিনা"

প্রভৃতি তো আমাদের স্মৃতির বিধান—এই বিধানই দেখা যায় মুসলানদের পাইয়া বসিয়াছে। নহিলে এমন সব অপূর্ব ব্যবস্থা যে কোরানে বা হদিসে আছে তাহা তো মনে হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে নবদ্বীপ কাশীর স্মার্ত ব্যবস্থা মক্কা মদিনার উপরও প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে লড়িতে গিয়াই যে তাঁহারা ভিতরে ভিতরে হিন্দুশাস্ত্রের ও আচারের পদানত হইয়া পড়িতেছেন সে খেয়াল তাঁহাদের মনে এখনও জাগে নাই।

মুসলমানদের জাতি সম্বন্ধে *Census Report of India*, Vol. VI, ৪৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বহু তথ্য দেখিবার যোগ্য।

এই দেশে প্রাচীনকালে আগত দক্ষিণ ভারতীয় খ্রীস্টানদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে।[৩] উত্তর ভারতেও জাতিভেদ খ্রীস্টানসমাজে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে তো

১ Crooke, *Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh*, IV, p. 315
তামিলদের মধ্যেও দেখা যায় অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কল্লান হয় মরবন, পরে হয় অগমুদইয়ন, তার পর হয় বেল্লাল। ক্রমে হয়তো সে মুদলিয়রও হইতে পারে। (Thurston and Rangachari, *Castes and Tribes of Southern India* Vol. III, p. 63)

২ 1921, Vol. I, Pt. 1. p. 227

৩ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. I, p. vi

ইহার বিলক্ষণ অধিকার। দক্ষিণ ভারতে বহু গির্জাতে অন্ত্যজশ্রেণীর খ্রীস্টানেরা প্রবেশ করিতে পারেন না। সেখানে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে খ্রীস্টানদেরও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ আছে। পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরীও ভারতের চার্চে জাতিভেদ বজায় রাখিয়া চলা যাইতে পারে এই বিধান দিতে বাধ্য হন।[১] হিন্দুদের মতই রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বালবিধবাদেরও বিবাহ হয় না।[২] সেদেশে খ্রীস্টানদের বিবাহে বহু হিন্দু আচার অনুষ্ঠিত হয়।[৩]

এখানে আসিয়া এই যুগেও ইংরাজরা বৈদিক আর্যদের অবস্থাতেই পড়িয়াছেন। জাতিভেদ মানেন না, অথচ এই দেশে উচ্চনীচ প্রভেদটা এত প্রবল, এবং নীচ জাতিকে ঘৃণা না করিলে উচ্চ বলিয়া যখন নিজেকে বুঝান যায় না তখন তাঁহারাও ভারতীয়দের নীচ জাতিই মনে করেন। তারা সবাই শূদ্র। তবে প্রাচীন কালের আর্যদের মতই নিজেদের শূদ্রভৃত্যদের হাতের অন্ন ও সেবা গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের চলে না। অন্য সব ক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতীয়দিগকে শূদ্র বা অস্পৃশ্যই মনে করেন। এখন রাজনীতিগত কারণে জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদকে ইংরাজেরা বরং উৎসাহই দিতেছেন।

বর্তমান যুগের তথাকথিত সাম্যবাদী শিক্ষিত লোকেরাও দেখি পূর্বতন জাতিভেদ তো সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারেনই নাই, তার উপরে এখন চাকুরি ও টাকাগত এক নূতন ধরণের জাতিভেদ তাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। আগে এক-একটি জাতির মধ্যে এক প্রকারের সাম্য বা democracy ছিল। এখন দেখা যায় জাতির মধ্যেও I. C. S.-রা এক জাতি। ডেপুটি, মুন্সেফ, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, ওভারসিয়র, কেরাণী প্রভৃতি ভিন্ন জাতির মত। ব্যবসায়ীরও স্থান অর্থানুসারে। মফঃস্বলে এই নবজাতিভেদের জন্য অনেক স্থলে একত্র ক্লাব প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান চালান কঠিন। এই বিষয়ে সকলের সেরা ভারতীয় রাজধানী দিল্লীনগরী। শিক্ষা দীক্ষা পাইয়াও তাই এই দেশ দিনে দিনে সামাজিক জীবনে এত হীন হইয়া চলিয়াছে।

যদিও এখন রেল রেস্টুরেণ্ট হোটেল প্রভৃতির গুণে অন্নজলের বিচার

১ *Encyclopaedia Brittania*, 11th Ed., Vol. V, p. 468 ; Ghurye, p. 164

২ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. III, p. 31

৩ *Ibid.*, p. 46

কমিয়া আসিতেছে তবু এইসব বিষয়ে তর্ক করিবার উগ্রতা একটুও কমে নাই। আমাদের দেশে একটা কথা ছিল—

"জাত মারলো তিন সেনে
স্টেসেন উইলসেন ও কেশব সেনে।"

স্টেসনে অর্থ রেলে চলিতে। উইলসেন তখনকার দিনের বিখ্যাত গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের মালিক ছিলেন। কেশববাবুর ব্রাহ্মধর্ম সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

এইসব আঘাতের পরও জাতিভেদের যতখানি আছে তাহাতেই ভারতীয় সমাজের এই দশা।

জাতিভেদের মূল

এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে গেলে সর্বাপেক্ষা বিরুদ্ধতা আসিবে নিম্নতম সব বর্ণ হইতে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাহিবেন যে উচ্চ বর্ণেরা তাঁহাদিগকে সমান করুন, কিন্তু তাঁহারা কখনও নিজেদের অপেক্ষা হীন কাহারও সংস্পর্শ সহিবেন না। এই জাতিভেদের তীব্র বিষ তো তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষ বাহির হইতে আগত আর্যদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। আর্যেরা প্রথমে এইরূপ ভেদবুদ্ধি যতই অস্বীকার করুন পরে তাঁহারা ইহা মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এখন তাহাই সনাতন ধর্মের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই আর্যদেরই মনীষী ও শাস্ত্রজ্ঞ সব সন্তান এখন প্রাণপণে সমর্থন করিতে চাহেন এই প্রথাকেই।

আবার দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করিয়া বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া দেখা যায় মুসলমানেরাও জাতিভেদ প্রথার নড়চড় চাহেন না। যাঁহারা গ্রামে ও পল্লীতে অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে কিছু কাজ করিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন যে এই বিষয়ে ভয়ঙ্কর বাধা পাইতে হইয়াছে মুসলমানদের কাছ হইতে। নাপিত নমঃশূদ্রকে কামাইতে গেলে, মুচি ডোম হাড়ী নমঃশূদ্রকে পাল্কীতে বা ডুলিতে উঠাইলে, এমন কি স্বধু জুতা পায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইলে অনেক সময় মুসলমান গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে দাঙ্গা করিয়াছে। রামমোহন রায়ের প্রায় সমকালীন ব্রাহ্মণবংশীয় মহাত্মা ঢেঢ়রাজ যখন আগ্রার নিকটে জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তখন ঝাঝরের নবাব তাঁহাকে আট বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া দুঃসহ কষ্ট দেন। পরে ইংরেজরা জয়লাভ করিলে যখন নবাব পলাইলেন তখন নবাবের লোক কারাগার খুলিয়া দিলেন— তবু এই বলিয়া ঢেঢ়রাজকে শাসাইলেন যে এইসব কুকর্ম তিনি যেন না করেন। ঢেঢ়রাজ তাহা না মানিয়া পুনরায় সামাজিক সংস্কারের কাজে আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বৎসর পাঁচেক পূর্বে আমি ঢাকা জেলার সাভারের নিকট বেরস গ্রামে নমঃশূদ্রদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত একটি শিক্ষায়তন দেখিতে চাই। তাহাতে একটি বৃদ্ধ মুসলমান বলেন, "কেন বৃথা ভদ্রলোকেরা এই সব ছোটলোককে শিক্ষা দিতে চাহেন? আমরা তো ইহাদের চাঁড়ালই জানিতাম। ইহারা আবার নমঃশূদ্র হইল কবে?" অন্য

ধর্মের অনেক ধর্মোৎসাহী লোক আমাদের সমাজের সনাতনী মতই পছন্দ করেন। কারণ হিন্দুসমাজের মধ্যে উদারতা আসিলে তাঁহাদের সমাজে নূতন নূতন লোকের প্রবেশ বিরল হইয়া আসে। অবশ্য বহু উদারহৃদয় লোক এইসব সংকীর্ণ ভাবের অতীতও আছেন।

মোট কথা, ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধিই অশেষ অকল্যাণের আকর। যেখানে এক পক্ষে বিদ্বেষ থাকে সেখানে অন্য পক্ষে একদিন না একদিন বিদ্বেষ জাগিয়াই উঠিবে। বিদ্বেষ যে কত তীব্র হইয়া উঠিতে পারে এবং বিদ্বেষবশতঃ মানুষ যে কত উগ্র হইয়া উঠে তাহা বুঝা যায় অথর্বের শত্রুশাতন মন্ত্রগুলিতে। অথর্বের অষ্টম কাণ্ডের অষ্টম সূক্তের আগাগোড়া এই বিষময় অগ্নিতে ভরা। যাঁহার কৌতূহল আছে তিনি তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন। যে দ্বেষকারী সে পুরুষ হউক নারী হউক তাহার সব তেজ হরণ করিয়া লইবার কি আগ্রহ!

এবা স্ত্রীণাং চ পুংসাং চ দ্বিষতাং বর্চ আ দদে॥ (অথর্ব, ৭, ১৪, ১)

মৃতের মন যেমন প্রাণহীন তেমনি প্রাণহীন করিতে চাই বিদ্বেষকারীর মনকে—

যথোত মম্রুষো মন এবেষ্যোর্মৃতং মন॥ (অথর্ব, ৬, ১৮, ২)

চর্মপাত্রে পূর্ণ বাষ্পের মত সমস্ত বিদ্বেষ বহির্গত করিয়া দেই।

ততস্ত ঈর্ষাং মুঞ্চামি নিরূষ্মাণং দৃতেরিব। (অথর্ব, ৬, ১৮, ৩)

হে সোম, যে বিদ্বেষকারী সে সমানজন্মা পরিজনই হউক বা শত্রুই হউক যে আমাদিগকে বিদ্বেষ করে তাহার সমস্ত বল অপগত কর যেমন করিয়া আকাশ বজ্রাঘাতে পৃথিবীকে আঘাত করে।

যো নঃ সোমাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অপ তস্য বলং তির মহীব দৌর্বধত্মনা॥ (অথর্ব, ৬, ৬, ৩)

মোট কথা, যে আমাদের বিদ্বেষ করে তাহাকে আমরাও বিদ্বেষ করি।

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ। (অথর্ব, ২, ১৯, ১)

এই কথাটি বার বার একুশ বার নানা মন্ত্রে উচ্চারণ করা হইয়াছে (অথর্ব— ২, ১৯—; ২, ২০—; ২, ২১—; ২, ২২—; ২, ২৩—)।

কাজেই জাতিভেদের মূলে আছে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং কোনো কোনো শ্রেণীর সুবিধা। পরস্পরের প্রতি এই বিদ্বেষ দূর না করিলে, অবিশ্বাস না জয় করিলে এবং জাতিভেদের দ্বারা স্বার্থসাধনের লোভ না ত্যাগ করিলে কোনো উপায় নাই।

প্রাচীন যুগে নারীদের অবস্থা ও ব্যবস্থা

সমাজব্যবস্থার মূলে সাধারণতঃ একটা বড় আদর্শবাদ থাকে। ভারতীয় সমাজ-নেতাদের অন্তত এইরূপ একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল। শাস্ত্রকারেরা তখন নারীত্বের যে একটা অতি উচ্চ ও মহান আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে আর ভুল নাই। এই জন্যই মহাভারত বলিতেছেন, "স্ত্রী মানুষের অর্ধভাগ, স্ত্রী স্বামীর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, স্ত্রী ধর্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গের মূল (আদি, ৭৪, ১)। সংসারে স্ত্রীদের যদি সম্মান না থাকে তবে সংসার বৃথা (অনু, ৪৬, ৫-৬ ; উদ্যোগ, ৩৮, ১১)। স্ত্রীগণের মনে যে সংসারে দুঃখ সে সংসারের কল্যাণ নাই (অনু, ৪৬, ৭)। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী যে কত মাননীয় তাহা দেখা যায় আদিপর্বে ১৯৯, ৫-১৬ শ্লোকে। পতিব্রতা সতী শীলবতী নারীর মহিমা সকল পুরাণে ও শাস্ত্রে কীর্তিত। এ সম্বন্ধে বেশি লিখিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কর্তব্য কম নহে। মহাভারত বনপর্বে দেখি পথশ্রান্ত দ্রৌপদীর স্বামীরা তাঁহার পাদ সংবাহন করিয়া দিতেন। (বন, ১৪৪, ২০) নারীদের মহিমাও কম ছিল না, অনেক স্থলে তাঁহারা যুদ্ধও করিতেন (সভাপর্ব, ১৪, ৫১)। তাঁহাদের জন্য সভাসমিতিতে স্থান নির্দিষ্ট থাকিত (আদি, ১৩৪, ১২)। হস্তিনাপুরীর কোষের সকল ভার দেওয়া হইয়াছিল দ্রৌপদীকে (আদি, ১৫৯, ১১) কেবল সংসারে নহে তপশ্চর্যায়ও নারীর বিশিষ্ট একটি স্থান ছিল। সত্যবতী, গান্ধারী, কুন্তী, সত্যভামা প্রভৃতি নারীগণ বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থব্রত গ্রহণ করেন (আদিপর্ব, ১২৮, ১২ ; আশ্র, ১৫, ২ ; ১৭, ২০ ; মৌষল, ৭, ৭৪ ; ইত্যাদি)।

সমাজপতিদের আদর্শ তখনকার দিনে যত উচ্চই থাকুক সামাজিক অবস্থা যে সব সময় অনুকূল ছিল না তাহাও বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন শাস্ত্রাদি দেখিয়া। আদর্শের উচ্চতা সত্ত্বেও চারিদিকের অবস্থা যদি প্রতিকূল হয় তবে দীর্ঘকাল সেই আদর্শ সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা অসম্ভব। তাই তাঁহারা তখনকার দিনের চারিদিকের দুরবস্থার কথাও না বলিয়া পারেন নাই। তখনকার দিনের নারীদের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা যদি সত্য হয় তবে তো চমকাইয়া উঠিতে হয়। আর যদি সেই সব শাস্ত্রকার মিথ্যাই বলিয়া থাকেন তবে এই মিথ্যার উপরে নির্ভর করিয়া কোনো সমাজের পক্ষে চলা অসম্ভব। তাহা হইলে শাস্ত্রশাসিত সনাতন ধর্ম একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা বলেন জাতিভেদের দ্বারা বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষা করা যায় তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত এই শুদ্ধিরক্ষা শুধু একটা আদর্শবাদস্থাপন বা স্মৃতিতে বিধান লেখার উপর নির্ভর করে না। তাহার প্রধান নির্ভর সমাজস্থ নরনারীর প্রতিজনের ব্যক্তিগত চরিত্রসংযমে। ভারতবর্ষে এমন কি বিশেষ প্রকারের চরিত্রসংযম দেখা যায় যাহাতে মনে করা যায় এইরূপ বর্ণশুদ্ধি রাখার ব্যবস্থায় কোথাও ছিদ্র নাই? পূর্বকালেও তো নরনারীর এই বিষয়ে দুর্বলতা কম ছিল না।

বৈদিকযুগে নৈতিক আদর্শ উচ্চ রাখিবার চেষ্টা রীতিমতই হইয়াছে তবু তখনও সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ নারী ও পুরুষের যে অভাব ছিল না তাহা বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে বাধ্য হইয়া যে সব আলোচনা করিতে হইতেছে তাহা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এই কষ্টকে মানিয়া লওয়া ছাড়া আর গতি নাই। প্রাচীনকালে নারীদের দুর্দশা ও দুর্গতির কথা সত্য হইলে চাপিয়া গিয়া লাভ নাই। এইসব দুঃখময় কাহিনী হয়তো অন্য দেশেও আছে, তবে ভারতের ইতিহাস-পুরাণের বহু কাহিনীতে সেগুলি সুরক্ষিত।

বৈদিকযুগে ভ্রাতৃহীনা কন্যাদের ছিল দুর্গতি, অনেক সময় তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত।[১] অথর্ববেদে একই সূক্তে "পুংশ্চলী" শব্দের বার বার প্রয়োগ দেখা যায় (১৫, ১, ২)। মহানম্নী বা মহানগ্নী শব্দ অথর্বের চতুর্দশ কাণ্ডে প্রথম সূক্তের ৩৬ সংখ্যক মন্ত্রে আছে। অথর্বের বিংশ কাণ্ডে কুন্তাপ সূক্তে মহানম্নী শব্দ এক স্থানেই বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে (১৩৬, ৫-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৪)। মহানগ্নী অর্থও বেশ্যা। বাজসনেয়ি সংহিতায় কুমারীপুত্রের কথা পাওয়া যায় (৩০, ৬)। সেখানে আছে "প্রমদে কুমারীপুত্রম্"। কুমারীপুত্রের অর্থ করিতে মহীধর বলেন, কানীনম্ অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার সন্তান। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও কুমারীপুত্রের কথা পাওয়া যায় (৩, ৪, ২, ১)। অথর্ববেদে গালি দিবার জন্য লাক্ষার পিতাকে কানীন বলা হইয়াছে (৫, ৫, ৮)।

অগ্রু বা অগ্রূ অর্থ অবিবাহিত কন্যা। ঋগ্বেদে অগ্রুর পুত্র অর্থাৎ "অগ্রুবের" উল্লেখ আছে (৪, ১৯, ৯)। এখানে সায়ন অর্থ করেন, "অগ্রু নাম কাচিৎ তস্যাঃ পুত্রঃ।" অর্থাৎ অগ্রু নামে কাহারও পুত্র। ৪, ৩০, ১৬ ঋকেও অগ্রু কথা আছে, আরও বহুস্থলে আছে। ঋগ্বেদে দৃষ্টান্তছলে পাপের কথাতে "রহসূরিবাগঃ" কথার উল্লেখ পাওয়া যায় (২, ২৯, ১)। এখানে "রহসূ"র অর্থ করিতে গিয়া সায়নাচার্য বলেন,

১ *Vedic Index*, vol. I, p. 395

"রহসি অন্যৈরজ্ঞাতপ্রদেশে সূয়তে ইতি ব্যভিচারিণী। সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" অর্থাৎ গোপনস্থানে প্রসবকারিণী, ব্যভিচারিণী। সে যেমন গর্ভপাত করিয়া দূরদেশে পরিত্যাগ করে সেইরূপ। বাজসনেয়ি সংহিতায় আর্যের (বৈশ্যের) উপপত্নী শূদ্রা ("শূদ্রা যদর্যজারা"—ঐ, ২৩, ৩০) ও শূদ্রের উপপত্নী আর্য (বৈশ্য)-নারীর ("শূদ্রো যদর্যায়ৈ জারঃ"—ঐ, ২৩, ৩১) উল্লেখ আছে।

এই সব দুর্গতি ঘটিবার হেতুও তখন সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বহু কন্যার তখন পতি জুটিত না, তাহাতে যে সব দুর্নীতি আসিয়া পড়িতে পারে তাহাও দেখা দিয়াছিল। ঐ সব কন্যাকে "অমাজুর্" অর্থাৎ "গৃহেই বুড়ী হইয়া যাওয়া" বলিত। ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন

অমাজুরিব পিত্রোঃ স চা সতী। —ঋগ্বেদ ২, ১৭, ৭

ইহার ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য বলেন, "অমাজূর্যাবজ্জীবং গৃহ এব জীর্যন্তী পিত্রোঃ সচা মাতাপিতৃভ্যাং সহ ভবন্তী তয়োঃ শুশ্রূষণপরা পতিমলভমানা সতী" ইত্যাদি, অর্থাৎ 'পতিলাভ করিতে না পারিয়া যেমন অমাজুর কন্যা পিতামাতার কাছে যাবজ্জীবন গৃহেই থাকিয়া জীর্ণ হইয়া যায়' ইত্যাদি।

কাণ্বসোভরি ঋষি বলিতেছেন, "আমাদিগকে যেন অমাজুরের দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে না হয়" (ঋগ্‌বেদ, ৮, ২১, ১৫)। কক্ষীবান্ ঋষির দুহিতার নাম ঘোষা। তিনি চর্মরোগাক্রান্ত হইয়া পিতৃগৃহে জীর্ণ হইতেছিলেন। দেবতার অনুগ্রহে তিনি ভালো হইয়া পতিলাভ করেন (ঋগ্‌বেদ, ১, ১১৭, ১৭)। এই "অমাজুর্" কথার সঙ্গে কি "আইবুড়ো" কথার কোনো যোগ আছে?

যে সব নারীর তখনকার দিনে পতি জুটিত না বা যাহারা স্বেচ্ছাবিহারিণী ছিল তাহারা তখনকার দিনে উৎসবগুলিতে গিয়া ভীড় করিত। সেখানে গান নৃত্য সুরার সঙ্গে নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতাও চলিত। "সমনগা ইব ব্রাঃ" (ঋগ্‌বেদ, ১, ১২৪, ৮) কথাতে, আচার্য পিশেল মনে করেন, দল বাঁধিয়া মেয়েরা "সমন" অর্থাৎ উৎসবে চলিয়াছে। "সমনেব যোষাঃ" (ঋগ্‌বেদ ৪, ৫৮, ৮)। "সমনের" দিকে নারীগণ অর্থই তাঁহারা করেন। ভরদ্বাজপুত্র পায়ু ঋষি বলিতেছেন, "ধনুর দুই কোটি সমনস্থা যোষিতের মত নিরন্তর আমার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে (ঋগ্‌বেদ, ৬, ৭৫, ৪)।

অথর্ব বেদে এই সময়ের কথা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সেখানে ঋষি বলিতেছেন, "হে অগ্নি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কন্যার্থী পুরুষ এই কন্যার কাছে আসুক। বরগণের নিকট এই কন্যা জুষ্টা (রমণীয়া), সমন সকলে এই কন্যা বল্গু (রুচিরা, হৃদ্যা, মধুরা), পতির সহবাস লাভ করিবার সৌভাগ্য ইহার হউক।"

জুষ্টা বরেষু সমনেষু বল্গুর্
ওষং পত্যা সৌভগমস্ত্বস্মৈ ॥—অথর্ব, ২, ৩৬, ১

ঋগ্‌বেদ দশম মণ্ডলে "সমনং ন যোষা" (১০, ১৬৮, ২)র অর্থে সায়নাচার্য করিয়াছেন ধৃষ্ট (নির্লজ্জ কামুক) পুরুষের কাছে কামিনীরা যেমন যায় (ধৃষ্টং পুরুষং কামিন্য ইব)।

সমাজপতিদের পক্ষে তখন সব দিকেই বিপদ। বিশ্বাস না করিলে নারীরাও বিশ্বাসের অযোগ্য হয় তাহা তাঁহারা জানেন। তাই নারীদের মহত্ত্বের কথা বার বার নানা স্থানে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। তবু দেখিলেন তাহাতে সমাজের সব সমস্যা মিটিল না। তখন নারীদের নৈতিকহীনতার কথা বারবার অতি জঘন্যভাবে ঘোষণা করিলেন। এই সব কথা বলিতে তাঁহাদের মত মানুষের পক্ষে আনন্দ হইবার কথা নহে। বড় দুঃখেই তাঁহাদের এই সব দুর্গতির কথা বলিতে হইল। তখন মনু বলিলেন, "নারীদের কিছুমাত্র সংযম নাই, কামে মোহিত করিয়া পুরুষকে ভ্রষ্ট করাই তাহাদের কাজ (মনু, ২, ২১৩-১৪)। এই বিষয়ে নারীদের আর ভালোমন্দ বিচার নাই (মনু, ৯, ১৪)। নারীদের স্বভাবের মধ্যে পুংশ্চলীসুলভ এমন একটা চাঞ্চল্য আছে যে হাজার রকমে রক্ষা করিয়াও কোনো ফল হয় না (মনু, ৯, ১৫)। এই কথাতে স্মৃতিকার মহর্ষি দক্ষেরও পুরাপুরি সায় আছে (৪, ৯-১০)।

মনু বলেন, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে নারীর ব্যভিচারশীলতা সুপ্রসিদ্ধ (৯, ১৯)। "তাই শ্রুতি অনুসারে পুত্রকেও কোনো কোনো স্থলে বলিতে হয়, আমার মাতা যে পরপুরুষলুব্ধা ব্যভিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহার দৈহিক অশুচিত্ব আমার পিতা শুদ্ধ করুন।"

যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্ক্তাম্ ইত্যেস্যৈতন্নিদর্শনম্ ॥ —মনু ৯, ২০

এই শ্লোকের প্রথম অর্ধ আছে শঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে (৩, ১৩, ৫)। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমাংশ আছে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (১, ৯, ৯), আপস্তম্ব মন্ত্র পাঠে (২, ১৯, ১) এবং হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রে (২, ১০, ৭)।

মনুর নবম অধ্যায়ের প্রথম দিকের অনেকটা দূর পর্যন্ত এই রূপে নানা ভাবে নারীদের হীনতার কথাই চলিয়াছে। মনু বলেন, নারীরা এমন হীন ও অপদার্থ যে বেদে ও মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই (৯, ১৮)। এই জন্য কোনো কালেই নারীরা স্বাধীনতা লাভ করিবার যোগ্য নহে। সর্বদাই তাঁহাদের থাকা উচিত পিতা পতি বা পুত্রের অধীন হইয়া (মনু, ৯, ৩)। বসিষ্ঠ সংহিতার মতও ঠিক এইরূপ (৫ম

অধ্যায়)। অথচ সঙ্গে সঙ্গেই মনু বলিতেছেন, কোনো প্রকারেই শাসন বা রক্ষা দ্বারা এই ক্ষেত্রে কোনো ফল হয় না (৯, ১৫)।

কিছুতেই যদি কিছু না হয় তবে পুরাতন কালে যে কন্যারা রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়া নিজেরা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেন তাহা বন্ধ করিয়া আট বৎসর নয় বৎসর বয়সে গৌরীদানের প্রথা চালাইয়া লাভ কি? পিতা-পতি-পুত্র কাহারও কোনো শাসনেই যদি কিছু লাভ না হয় তবে বৃথা তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সব বন্ধ করা। ইহাতে সমাজের সংস্কৃতির মর্যাদা কতটা নামিয়া যাইতে বাধ্য হইল! নারীদের এই সব হীনতার দোহাই দিয়াই মনু বলিতেছেন, "নারীদের বেদে ও মন্ত্রে অধিকার নাই" (৯, ১৮)। অথচ গুণগত জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া যে বংশগত জাতিভেদ রাখিলেন তাহার শুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নারীদেরই শুদ্ধতার উপর। সেখানে তাঁহারা নারীকে বলিবেন পরম পরিশুদ্ধ অথচ বেদ ও মন্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত করিবার বেলায় ও তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিবার বেলায় বলিবেন তাহাদের কামুকতা জঘন্যতা ব্যভিচার ও পুংশ্চলীত্বের তুলনা দেওয়া যায় না। এমন পরস্পরবিরুদ্ধ কথায় সঙ্গতি হয় কেমন করিয়া?

গোত্র জাতি প্রভৃতির জন্মগত বিশুদ্ধি লইয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম। অথচ নারীদের উপর যদি এতটুকুও নির্ভর না করা যায় এবং সকল প্রকার রক্ষার ব্যবস্থাই যদি ব্যর্থ হয় তবে এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তো মূলেই প্রতিষ্ঠার অভাব থাকিয়া যায়। গৌতমপুত্র চিরকারী তো স্পষ্টই বলিলেন, "জননীগর্ভস্থ সন্তানের আসল পিতা কে, এবং তাহার প্রকৃত গোত্র কি, তাহা মাতা ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?"

> মাতা জানাতি যদ্ গোত্রং মাতা জানাতি যস্য সঃ।
>
> —মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬৫, ৩৫

এই জন্যই পুরাণ বলিলেন, "নদী অগ্নিহোত্র ভারত ও কুলের মূল অনুসন্ধান করিতে নাই। মূল দেখিতে গেলেই দোষের দ্বারা তাহা হীন হইয়া যায়।"

> নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ।
> মূলান্বেষো ন কর্তব্যো মূলাদ্দোষেণ হীয়তে।
>
> —গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ১১৫, ৫৭

আর্যদের সংখ্যা যাহাতে না কমিয়া যায় সেই জন্যই বংশরক্ষার জন্য অনেক বিধিব্যবস্থা সমাজপতিরা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই প্রয়োজন হইলে দেবর বা অন্যপুরুষের দ্বারাও নারীদের গর্ভাধান করা হইত। এই সব কারণেও হয়তো

খানিকটা আদর্শ নীচ হইয়া যায়। কারণ দেখা যায় নারীরা পতির অভাবে যেন দেবরকে নিজেরাই পতিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইত—

নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্॥

—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৮, ২২

কলিতে ইহা শাস্ত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

সবগুলি কারণ তো জানা নাই, তবু নানা কারণে দেখা যায় নারীদের নৈতিক আদর্শ অনেক স্থলে নামিয়া গিয়াছিল। পুরাণগুলি দেখিলে এই বিষয়ে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। এমন কি মহাভারতেও নারীদের ভীষণ অসংযম ও কামের কথা ভয়ঙ্করভাবে বর্ণিত আছে (অনুশাসনপর্ব, ৩৮-৪০ অধ্যায়)। অবশ্য কথাগুলি সেখানে চরিত্রহীনা পঞ্চচূড়ার। তবে তাহা মুনিঋষিগণের সম্মত বলিয়াই ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। শিবপুরাণেও পঞ্চচূড়া কথিত স্ত্রীস্বভাব সনৎকুমার মহর্ষি ব্যাসকে বলিতেছেন (ধর্মসংহিতা, ৪৩ অধ্যায়)। পঞ্চচূড়া এই সব কথা পুরাকালে নারদকে বলিয়াছিলেন। মহাভারতের ও শিবপুরাণের এই স্ত্রীস্বভাববর্ণন এত জঘন্য যে ইহা এখনকার দিনে লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

বরাহ পুরাণে দেখা যায় এই সব কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন নারদকে (১৭৭ অধ্যায়, ১৮-১৯)।

পঞ্চচূড়া অসতী। তাই তাহার কথায় যদি লোকের প্রত্যয় না হয় তাই শিবপুরাণে তাহার পরই (৪৪ অধ্যায়) নারীস্বভাব সম্বন্ধে সতীশ্রেষ্ঠ অরুন্ধতীর কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানেও ঐ একই কথা (৪৪ অ, ২৫, ২৬)।

স্কন্দপুরাণে দেখা যায় নারীরা আছে কেবল পুরুষকে মোহিত করিতে (ব্রহ্ম ধর্মারণ্য খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, ৮১-৮৭)। স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে দেখা যায় নারী কখনই তাহার চরিত্র রক্ষা করিতে পারে না (৮১ অ, ৩২-৩৭)।

মহাভারতেও দেখি বহুপুরুষভুক্তা হওয়াই নারীদের কাম্য (আদি, ২০২ অ, ৮)। নারী কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে (উদ্যোগ, ৩৭ অ, ৫৭ ; দ্রোণ, ২৮ অ, ৪২ ; আদি, ২৩৩ অ, ৩১- ইত্যাদি)।

যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেলে যখন অর্জুন শোকার্ত বহু কুলচারিণীদের লইয়া দ্বারকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন আভীর দস্যুগণ আসিয়া সেই সব রমণীগণকে হরণ করিতে উদ্যত হইল। আশ্চর্যের কথা এই যে অনেক রমণী এত বড় শোকের পরেও কামার্ত হইয়া দস্যুগণেরই সঙ্গে গেল (মৌষলপর্ব, ৭, ৫৯)। শ্রীকৃষ্ণের আপন বংশেরই এই দশা!

ব্রহ্মবৈবর্তের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৮শ অধ্যায়ে গোপিকাদের যে বিলাস আছে তাহা যেমনই হউক অনেকে তাহা লীলারূপেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যায়শেষে নারীদের সম্বন্ধে যে সাধারণ সত্য কথিত আছে তাহা বড়ই অশ্লীল। তাহাতে মনে হয় কিছুতেই নারীর কামশান্তি নাই (১৭২ শ্লোক)।

লিঙ্গপুরাণেও সেই একই কথা, নারী তপ্তাঙ্গারসমা, পুরুষ ঘৃতকুম্ভ ইত্যাদি (পূর্বভাগ, ৮ম অধ্যায়, ২৩ ইত্যাদি)। গরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে, ১০৯ তম অধ্যায়ে নারী সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা আর উচ্চারণ করা চলে না।

বামনপুরাণে আছে (৪৩ অধ্যায়) মুনিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুনিপত্নীরা লিঙ্গপূজা প্রবর্তন করেন। সেখানে মুনিপত্নীদের অসংযত কামুকতা অবর্ণনীয় (৪৩ অধ্যায়, ৬৩-৭০)। ব্রাহ্মণনারীদেরই এই দশা, "অন্যে পরে কা কথা"।

বৃহদ্ধর্মপুরাণেও আছে পুরুষ ঘৃতকুম্ভ ও নারী অগ্নির মত (উত্তর খণ্ড, ৫ম, ৩)।

অগ্নিপুরাণ বলেন, নারীরা সব কামাধীন (২২৪ অ, ৩)। নারীরা দুষ্টমদা অতএব তাহারা অবলোকনেরও অযোগ্যা (৩৭২ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)। "দৃষ্টির অযোগ্যা" যে অস্পৃশ্য হইতেও ভয়ঙ্কর কথা !

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে কলা নামে যুবতী আপন পতির কাছে নারীচরিত্রের যেরূপ ভীষণ জঘন্য বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অনুবাদকেরা পর্যন্ত অনুবাদ করিতে পারেন নাই। অথচ এই অনুবাদকের দল ভালো মন্দ কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই (৬৮ অধ্যায়, ১৭-৩২ শ্লোক)। এই খণ্ডেই ৬৫ তম অধ্যায়ে এক ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত এক ক্ষত্রিয়কন্যার কথা আছে। তাহাতে নারীচরিত্র এমন জঘন্য-ভাবে বর্ণিত যে, তাহা উদ্ধৃত করা অসম্ভব (১৩-২২ শ্লোক, ৩৬-৩৯ ইত্যাদি)। অথচ সেই কন্যাই পরে স্বামীর সহমৃতা হওয়ায় পরমা গতি প্রাপ্ত হইল।

পদ্মপুরাণে সুন্দর সুন্দর মুনিকুমারকে দেখিয়া পঞ্চ গন্ধর্বকন্যা মোহিত হইয়া বলেন, কামোপভোগের উপকরণ উপস্থিত হইলে তাহা স্বীকার না করা মূঢ়তা (উত্তর খণ্ড, ১২৮ অ, ৯৬-৯৮ ; তার পর দ্রষ্টব্য ১০৫, ১০৬ শ্লোক)।

সমাজের নৈতিক অবস্থা যে অনেক সময় কিরূপ দূষিত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় পদ্মপুরাণের একটি আখ্যানে। পত্নীর দ্বারা অবজ্ঞাত এক দ্বিজের পত্নী জাররতা, অথচ তার স্বামী স্ত্রীর একান্ত বশীভূত (উত্তর খণ্ড, ২১৩ তম অধ্যায়, ৮-১৩)। অবশেষে লোকগঞ্জনায় স্বামী বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। (ঐ, ১৪)। তখন পত্নী লোকদেখান সহমরণের আয়োজন করিল। তাহার পর যেন আপন সখীদের কথায় সে শিশুপুত্রের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণধারণ করিয়া রহিল এমন ভান করিল (ঐ,

১৫-৩৩)। তাহার সখীরাও ঠিক তাহারই মত সচ্চরিত্রা। যাহা হউক নারী ঐ পুত্রের দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধ করাইল এবং কিছুদিন পরে উপপতির ধনে ঐ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করিল (ঐ, ৩৪-৩৫)। ঐ কৃতোপনয়ন জারজসন্তান তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া নারায়ণপরায়ণ হইলেন (ঐ, ৩৬)।

যখন চারিদিকে এইরূপ দুর্নীতি তখন অনেকস্থলে গর্ভপাতাদি করাইবারও প্রয়োজন হয়। তাহারও ব্যবস্থা তখনকার ইতিহাসে পাওয়া যায়। পুরাণে দেখা যায় ব্রাহ্মণ ধনলোভে নারীগণের গর্ভপাতের ঔষধ দিত (পদ্ম, উত্তর, ২১৪ অ, ৫৯)। ভ্রূণহত্যা তখন সুপরিচিত ছিল। তাই কথায় কথায় ভ্রূণহত্যার পাপের উল্লেখ ছিল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও বিহিত ছিল।

এই সব বিষয়ে হয়তো লোকের মনও অনেকটা অসাড় ছিল। তাই স্কন্দপুরাণে দেখি শারদা নামে এক বিধবার পুত্র জন্মে। দেবতার বরে নাকি তাহার মৃতপতির সহিত সমাগম ঘটিত (ব্রহ্মখণ্ড, উত্তরখণ্ড, ১৯শ অধ্যায়)। দেবতার বর যাহাই হউক সমাজে সে অচল রহিল না। যথাকালে সেই পুত্রের উপনয়ন হইল, সর্ববিদ্যায় সে পারগ হইল। সকল বেদ তাহার অধিগত হইল (ঐ, ১৬-১৮)।

মহাভারতেও দেখা যায় নারীদের সত্যভ্রষ্টা বলা হইয়াছে। এই কথা নাকি বেদেও আছে। তবে আর সহধর্ম হয় কিসে?

যদানৃতাঃ স্ত্রিয়স্তাত সহধর্মঃ কুতঃ স্মৃতঃ।
অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং বেদেষপি হি পঠ্যতে॥ —অনু, ১৯, ৬-৭

জাতিভেদ ও বংশবিশুদ্ধি

জাতিভেদের দ্বারা বংশগত একটি বিশুদ্ধ ধারা অর্থাৎ Ethnic purity রক্ষিত হয় বলিয়া একদল বিশেষ শিক্ষিত লোক জাতিভেদকে সমর্থন করেন। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের বিচার ঠিক হইলে দেখা যায় বাংলাদেশে দ্বিজগণের মধ্যেও আর্য-অনার্য-মোঙ্গল সংমিশ্রণ এবং দক্ষিণ ভারতে অনার্য সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। জাতির বিশুদ্ধি এমন একটি মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে যাহার কাছে চিরদিনই মানুষ অতি দুর্বল। এখন তবু স্বামী ও স্ত্রী অনেকটা ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেন। পূর্বে ভদ্রলোকেরা বিদেশে চাকুরি করিতেন। পরিবার লইয়া বিদেশে যাওয়া ছিল নিন্দনীয়। এমন অবস্থায় বিদেশে চাকুরিয়াদের চরিত্র খুব ভাল থাকিত না। সেই কারণে গ্রামেও তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাইত।

গুজরাটে খেড়াবাড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের কাজ পত্রাবলী রচনা। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই ব্যবসার জন্য থাকেন বিদেশে। পরিবার লইয়া বিদেশে যাইবার রীতি ইহাদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নাই। সিন্ধুদেশের ভাইবংধ সম্প্রদায় তো পৃথিবী ভরিয়া ব্যবসায় করেন, স্ত্রী সঙ্গে লইয়া গেলে তাঁহাদের জাতি যায়। ইহাতে বড়ই কুফল ঘটে। সিন্ধুদেশের "ওম্ মণ্ডলী"র মূলে এইরূপ অনেক দুঃখ আছে। বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথাতে কাহারও কাহারও হইত অসংখ্য স্ত্রী, আর বংশজ ব্রাহ্মণেরা বিবাহই করিতে পাইতেন না। এই সব কুব্যবস্থার ফল নিশ্চয়ই বিষময়। এই রকম অবস্থায় সমাজে কখনও জাতিগত শুদ্ধতা আশা করা কঠিন। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ কুলীনদের বহুবিবাহের কথা রিজলী সাহেবও উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই।[১]

এখনকার দিনে দেখা যায় সমাজকর্তারা এইরূপ ক্ষেত্রে পুরুষকে অব্যাহতি দিয়া সব দোষ চাপাইয়া দেন নারীর উপরে। পুরাতন কালে বরং দেখা যায় শাস্ত্রকাররা অনেক পরিমাণে সঙ্গত পথ ধরিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যদি নারী স্বেচ্ছায় দূষিত না হইয়া থাকেন তবে তাঁহারা ত্যাজ্য নহেন। অত্রি বলেন, যদি নারী না বুঝিতে পারিয়া, প্রবঞ্চিত হইয়া, বলাৎকৃতা হইয়া বা প্রচ্ছন্নভাবে দূষিতা হয় তবে ধরিতে হইবে ইহা তাহার স্বেচ্ছায় ঘটে নাই। এমন অবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করা

১ *Peoples of India*, p. cxl

উচিত নহে। ঋতুকালে যে স্রাব হয় তাহাতেই তাহার শুদ্ধি ঘটিবে (স্মৃতিসমুচ্চয়ে অত্রিস্মৃতি, ৫, ২, ২৯৭-৯৮)। বিধর্মী বা পাপিষ্ঠের দ্বারা যে নারী একবার মাত্র দূষিত, প্রাজাপত্যব্রত আচরণে ও ঋতুস্রাবে তাহার শুদ্ধি হয়। বলে ছলে যদি একবার মাত্র দূষিত হয় তবেও প্রাজাপত্যে শুদ্ধি হয় (স্মৃতিসমুচ্চয়ে অত্রিসংহিতা, ২০১-২০২)।

পুনানগরে প্রকাশিত আনন্দাশ্রমের স্মৃতিসমুচ্চয়ে বসিষ্ঠস্মৃতিতেও এই একই কথা (২৮ অ, ২-৩)।

মহাভারতেও দেখা যায় ধর্ষিতা নারীর দোষ কি? ধর্ষক পুরুষের ও রক্ষা করিতে অসমর্থ দুর্বল পুরুষেরই তো দোষ।

নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি। শান্তি, ২৬৫, ৪০

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠও খুব জোরের সহিত বলেন,

"বলাৎকারকৃতে ব্যভিচারাদৌ স্ত্রিয়ো নাপরাধ্যন্তি।"

প্রবলের জুলুম হইতে নারীকে রক্ষা করিতে পারিল না দুর্বল পুরুষ। অপরাধ হইবে নারীর!

দেবলও বলেন, বিধর্মীর দ্বারা বলাৎকৃতা নারীর গর্ভ হইলে সে অশুদ্ধ। অন্যথা তিন রাত্রে শুদ্ধি হয় (দেবলস্মৃতি, ৪৭)। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিধর্মীর দ্বারা গর্ভ হইলে কৃচ্ছ্রসাংতপন ও ঘৃতসেকের দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ঐ, ৪৮-৪৯)। এইরূপ সাংতপনের কথা মনুতেও আছে (১১, ২১৩ দ্রষ্টব্য)।

অনিচ্ছায় দূষিতা নারীর বিষয়ে অত্রি, বসিষ্ঠ, পরাশর, দেবল প্রভৃতি সবাই একমত। শাস্ত্রকারেরা এখানে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করাতে দেখা যায় তখন শাস্ত্রকারেরা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু বংশগত বিশুদ্ধি ইহাতেও রক্ষা পায় না।

মৎস্যপুরাণও বলেন, যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরভার্যাকে কেহ দূষিত করে তবে সেই পুরুষই দণ্ডার্হ, নারীর অপরাধ কি (২২৭ অ, ১২৮)?

অগ্নিপুরাণেরও এই মত। আবার ঋতুমতী হইলেই নারী শুদ্ধ হন। (১৬৫ অ, ৬-৭)। নারীর দেহগত সকল দুর্নীতিই ঋতুস্নানে শুদ্ধ হয়।

স্কন্দপুরাণ বলেন, নিরপরাধা হইলে অন্যোপভুক্তা নারীকে কখনও ত্যাগ করিবে না। স্রোতের দ্বারা নদীর ও ঋতুর দ্বারা নারীর শুদ্ধি (কাশীখণ্ড, ৫০ অ, ৪৭-৪৮) হয়।

অনিচ্ছায় যে নারী বলিষ্ঠের দ্বারা দূষিত তাহার কোনো দোষ নাই (ব্রহ্মবৈবর্ত, ২, ৫৮, ১০৯ ; ৪, ৬১, ৫৩); কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আছে, যদি নারীরও তাহাতে সম্মতি

থাকে তবে দোষ ঘটে। অনিচ্ছায় দূষণ হইলে নারীর প্রায়শ্চিত্ত আছে, ইচ্ছাকৃত অপরাধ হইলে নাই (ঐ, ৪, ৪৭, ৪০)। এই সব কথা যুক্তিযুক্ত হইলেও জাতিগত বিশুদ্ধি ইহাতে রক্ষা পায় না।

মহাভারতে শান্তিপর্বে দেখা যায় আঙ্গিরস গৌতমের সন্তান ছিলেন চিরকারী। গৌতমের রূপ গ্রহণ করিয়া অতিথি ইন্দ্র গৌতমপত্নীকে হরণ করেন। পত্নীকে ব্যভিচারে লিপ্তা জানিয়া পুত্র চিরকারীকে গৌতম বলিলেন, "তোমার জননীকে বধ কর।" পুত্র ভাবিলেন, ভর্তাই যখন নারীর সব ভার লইয়াছেন, তখন স্ত্রীর চরিত্রভ্রংশ হইলে তাহা রক্ষাকর্তারই দোষ অর্থাৎ পুরুষের দোষ। নারীর কোনোই অপরাধ নাই (২৬৫, ৪০)। এই জন্য তিনি জননীকে বধ করিলেন না। পরে মহর্ষিও আপন "সাধ্বী" (২৬৫, ৫২) ভার্যা হয়তো পুত্রের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। যখন তপস্যার স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পুত্র আপন জননীকে হত্যা করে নাই তখন তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। পত্নীকেও লজ্জায় "নিরাকারা" (টীকায়—পাষাণভূতা) দেখিয়া গৌতম সন্তোষলাভ করিলেন (২৬৫, ৬১)। স্ত্রী ও পুত্রের উপর গৌতমের চিত্তবৃত্তি আর বিকৃত রহিল না (২৬৫, ৬২)।

অহল্যার এই উপাখ্যানটি অন্যত্র নানাস্থলে ভিন্নভাবে আখ্যাত দেখা যায়। এইখানে যে উপাখ্যানটি দেখা যায় তাহা খুব সরল সহজ ও সঙ্গত। এখানে অহল্যাকে পাষাণ হইবার শাপ দেওয়া প্রভৃতি কথা নাই। শ্রীরামের চরণধূলিস্পর্শে সেই পাষাণত্ব ঘুচিবার কথা নাই। মোট কথা, অতিপ্রাকৃত কিছুই এখানে নাই। বরং গৌতম বুঝিলেন দর্প ক্রোধ ও অভিমানবশত কখনও স্ত্রী বা পরিজনকে দণ্ড দিতে নাই। "রাগে দর্পে মানে দ্রোহে পাপকর্মে এবং অপ্রিয় কর্তব্যে রহিয়া সহিয়া করাই ভালো। বন্ধুগণের, সুহৃদ্‌গণের, ভৃত্য ও স্ত্রীজনের অব্যক্ত অপরাধ বিষয়ে ধৈর্য ধরিয়া কাজ করাই ভালো।"

> রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্মণি।
> অপ্রিয়ে চৈব কর্তব্যে চিরকারী প্রশস্যতে॥
> বন্ধূনাং সুহৃদাং চৈব ভৃত্যানাং স্ত্রীজনস্য চ।
> অব্যক্তেষ্বপরাধেষু চিরকারী প্রশস্যতে॥ —শান্তিপর্ব, ২৬৫, ৭০-৭১

গৌতমপুত্র চিরকারীও বলিতেছেন, নারীরা অন্যায় করেন না, করে পুরুষ (ঐ, ৪০)। তাহা ছাড়া সন্তানের পক্ষে পিতা অপেক্ষা মাতাই গুরু। কারণ মাতাই জানেন তাঁহার গর্ভের সন্তান কাহার উৎপাদিত এবং তাহার প্রকৃত গোত্র কি?

> মাতা জানাতি যদ্ গোত্রং মাতা জানাতি যস্য সঃ॥ —ঐ, ৩৫

সেই যুগেও সকল পুরুষ যে ধর্মপরায়ণ শীলব্রত হইতেন, তাহা নহে। তাহা বুঝি অকামা নারীর উপর অত্যাচারের দ্বারা। মহাভারতে তো স্পষ্টই দেখা যায় পতিহীনা স্ত্রীলোকদের প্রতি সবার কি লুব্ধ দৃষ্টি! মনে হয় যেন শকুনির দল ভূমি-পতিত মাংসের দিকে লোভের সহিত চাহিয়া আছে।

উৎসৃষ্টমামিষং ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা খগাঃ।
প্রার্থয়ন্তি জনাঃ সর্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্॥ —আদি ১৫৮, ১২

সমাজে অত্যাচারী নীতিহীন গুণ্ডারও প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহাদের কবল হইতে ভাল ভাল যুবতীকে রক্ষা করারও প্রয়োজন হইত।

অহঙ্কারাবলিপ্তৈশ্চ প্রার্থ্যমানামিমাং সুতাং।
অযুক্তৈস্তব সম্বন্ধে কথং শক্ষ্যামি রক্ষিতুম্॥ —আদি ১৫৮, ১১

রাক্ষসেরাও তখনকার দিনে কন্যাদূষক ছিল। রাক্ষসাদি বর্ণ হইতে তখন কন্যা রক্ষা করা একটা মস্ত দায় ছিল।

কাজেই তখনকার দিনেও যুবক-যুবতীর সমস্যা কম ছিল না। তবে সকল ক্ষেত্রেই চতুরাশ্রম স্থাপনের দ্বারা, সদাচার-শীল-তপোধর্ম প্রভৃতির জয়কীর্তনের দ্বারা তখনকার দিনের সমাজনেতারা সর্বদা সকলকে উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু চারিদিকে যেখানে অবস্থা এই, সেখানে নিষ্কলুষ জাতিগত বিশুদ্ধির আশা করাই মূঢ়তা।

২১
বর্ণবিশুদ্ধি ও কৌলীন্য

প্রত্যেকে যদি নীতিতে ও চরিত্রে অটল থাকে তবেই জাতি ও বর্ণ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু যতই প্রাচীনকালের গুণকীর্তন করা যাউক না কেন নৈতিক দুর্বলতা ও ব্যভিচার যে সমাজে রীতিমত তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায় এই বিষয়ে স্মৃতি ও পুরাণগুলির কথাতে এবং প্রায় প্রত্যেকটিতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার দ্বারা।

এই ব্যভিচারের মধ্যেও উচ্চজাতীয় পুরুষ যদি নীচজাতীয়া বা সবর্ণা নারীকে দূষিত করে তবে প্রায়শ্চিত্ত সহজ। যদি উচ্চতর জাতির নারীকে পুরুষ দূষিত করে তবে সাধারণতঃ দণ্ড কঠিন (সংবর্তসংহিতা, ১৫২-৫৪, ১৬৬-৬৮)। ব্রাহ্মণী-গমন করিলে শূদ্রকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিতে হয়, ব্রাহ্মণীরও নিগ্রহের অন্ত নাই (বসিষ্ঠ সংহিতা, ২১ অধ্যায়)।

হীনবর্ণা নারীগমনে প্রায়শ্চিত্তের কথা অত্রি বলিয়াছেন (১৯৯, ২০০)। অত্রি এবং সংবর্ত উভয়েই এমন অবস্থায় উচ্চবর্ণের পুরুষেরই অশুচিতা হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হীনবর্ণা নারীর যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে এমন তো মনে হয় না।

বৃদ্ধ হারীত নানাবিধ নীচজাতির স্ত্রীগমনের সুদীর্ঘ তালিকা ও তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন (৯ম অধ্যায়, ৩১৬ শ্লোক ইত্যাদি)।

বৃহদ্‌যমস্মৃতিতে সবর্ণাগমন ও উচ্চবর্ণা স্ত্রীগমন ও নিম্নতরবর্ণা স্ত্রীগমনের কথা আছে। সবর্ণা ও নিম্নতরা গমনে দোষ কম, উচ্চবর্ণা গমনে দোষ বেশি (৪র্থ অধ্যায়, ৩৬-৪৮)।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখা যায় স্বজাতি নারীগমনে ও আনুলোম্যে দণ্ড কম, প্রাতিলোম্যে পুরুষের প্রাণদণ্ড বিহিত। সেক্ষেত্রে নারী অবধ্য বলিয়া তাহার নাসাকর্তনাদি বিধেয় (২য় অধ্যায়, ২৮৯-৯১)।

লঘুশাতাতপ স্মৃতিতে অবিবাহিতা কন্যাগমন উপপাতকের মধ্যে গণিত (২১)।

পরপুরুষের দ্বারা পরনারীতে যে সন্তানের জন্ম, যাহার পিতার নির্ণয় হয় না তাহাকে গূঢ়োৎপন্ন সন্তান বলে। গর্ভস্থ সন্তানের যথার্থ পিতা কে তাহার খবর মাতা ছাড়া আর কে জানে? (শান্তিপর্ব, ২৬৫, ৩৫)। এই সব সন্তানের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত তাহাও তখনকার দিনের সমাজপতিদের ভাবিতে হইত। মনুর

মতে এইরূপ স্থলে গর্ভধারিণী মাতার স্বামীই এইরূপ পুত্রের পিতৃত্বের অধিকারী, অন্তত সামাজিক আইনে ইহাই মানিয়া লইতে হইবে (মনু, ৯, ১৭০)। অবৈধভাবে যত প্রকার সন্তান হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব ব্যবস্থা মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে করিয়াছেন (৯ম অধ্যায়, ১৭০-৮১ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য)। কুমারীদের ও বিধবাদের সন্তানের বিষয়ে এবং অবিবাহিতা নারীদের গর্ভে পরপুরুষজাত সন্তানের বিষয়েও ধর্মশাস্ত্রকারদের ভাবিতে হইয়াছে।

বিষ্ণুসংহিতাতে পৌনর্ভব, কানীন, গূঢ়োৎপন্ন, সহোঢ় প্রভৃতি সন্তানের ব্যবস্থা আছে। অবিবাহিতা কন্যার পুত্র কানীন, সেই কন্যাকে যে বিবাহ করিবে সেই পুত্রও তাহার হইবে। সন্তান সহ যে নারীকে বিবাহ করা হয় তাহার সেই সহোঢ় সন্তানও নারীর পতিরই হইবে। বিবাহিতা বিধবার সন্তান পৌনর্ভব, সেই সন্তান পুনসংস্কারকর্তারই পুত্র। গূঢ়োৎপন্ন সন্তানের মালিকও তাহার জননীর স্বামী (ঐ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ৭-১৭)। যে সন্তান পিতামাতার পরিত্যক্ত তাহার নাম অপবিদ্ধ, পালকই তাহার পিতা (ঐ, ১৫, ২৫-২৬)। ইহাদের উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের ব্যবস্থাও ধর্মশাস্ত্রকার করিয়াছেন।

গূঢ়জ, কানীন, পৌনর্ভব প্রভৃতি সন্তানদের কথা যাজ্ঞবল্ক্যকেও ভাবিতে হইয়াছে (২, ১৩২-৩৩)। বসিষ্ঠ বলেন, যে প্রথম বিবাহের স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী আশ্রয় করে সেও পুনর্ভূ, তাহার সন্তান পৌনর্ভব (১৭ শ অধ্যায়)। বিধবার পুনরায় বিবাহ হইলেও সে পুনর্ভূ (ঐ)। কানীন, গূঢ়োৎপন্ন সহোঢ় প্রভৃতি পুত্রের কথাও বসিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন (১৭শ অধ্যায়)।

এই সব বিবাহে অনেক সময় মহাসত্ত্ব সব বীর ও গুণী জন্মিয়াছেন। ঐরাবত নাগের পুত্র সুপর্ণের দ্বারা হৃত হইলে সেই পুত্রবধূকে দীনচেতনা দেখিয়া ঐরাবত অর্জুনকে দান করেন (ভীষ্মপর্ব, ৯০, ৮-৯)। অর্জুন তাহাকে ভার্যার্থ গ্রহণ করেন। তাহাতে ইরাবানের জন্ম। এই বিধবার সন্তান পিতৃব্য অশ্বসেনের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাতৃকুলে বর্ধিত হন। ইরাবান ছিলেন গুণী বীর ও সত্যবিক্রম (ঐ, ৯০, ১০-১১)। ইন্দ্রলোকে ইরাবান অর্জুনের সঙ্গে দেখা করেন। পরে কুরুক্ষেত্রে পিতার সহায়তা করিতে বীরের মত প্রাণত্যাগ করেন (ঐ, ৯০ তম অধ্যায়)।

বৌধায়ন বলেন গূঢ়জ ও অপবিদ্ধ (পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান) পুত্রও রিক্থ-ভাক্ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হইবে (২, ৩, ৩৬)। কানীন সহোঢ় পৌনর্ভব ও শূদ্রা নারীতে দ্বিজগণের জাত সন্তান নিষাদগোত্রভাক্ হইবে (২, ৩, ৩৭)। এইরূপ সব সন্তানের নাম ও সংজ্ঞা বিষয়ে বৌধায়নও আলোচনা করিয়াছেন (২, ৩, ২৬-৩৪)।

এই সব দেখিয়া মনে হয় তখনকার দিনেও নৈতিক বিষয়ে সমাজে বহু ছিদ্র ছিল। তাহার মধ্যেও আবার এক একটা দেশ বিশেষভাবে নৈতিক ও চরিত্রগত শৈথিল্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

মহাভারতে কর্ণপর্বে দেখা যায় একজন ব্রাহ্মণ নানা দেশ পর্যটন করিয়া বাহীক দেশে আসিয়া দেখিলেন মানুষ সেখানে ব্রাহ্মণ হইয়া তাহার পর ক্ষত্রিয় হয়, তাহার পর বৈশ্য শূদ্র হইয়া নাপিত হইয়া যায়। নাপিত হইয়া আবার সে ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ হইয়া সেই অবস্থাতেই সে আবার দাসও হইয়া যায় (৪৫, ৬-৭)। ক্ষত্রিয়ের মল অর্থাৎ চরম দুর্গতি হইল ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রাহ্মণের মল হইল ব্রতহীনতা, পৃথিবীর মল হইল বাহীক এবং নারীদের মল হইল মদ্রস্ত্রীগণ (কর্ণপর্ব, ৪৫, ২৩)। পৃথিবীর সর্বদেশের মল হইল মদ্রক এবং সেখানকার নারীসকল নারীগণের মলস্বরূপ (ঐ, ৪৫, ৩৭)। এই জন্য সেই সব দেশে (জন্মের ঠিক নাই বলিয়া) সন্তানেরা উত্তরাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়রাই হয় উত্তরাধিকারী (ঐ, ৫৫, ১৩)। ব্রাহ্মণপরিদৃষ্ট এই সব কথা কর্ণের নিকট শুনিয়া শল্য কহিলেন, "সকল দেশেই মৈথুনাসক্ত মানুষ আছে" অর্থাৎ বিশেষভাবে বাহীক বা মদ্রের আর দোষ কি ? (ঐ, ৪৫, ৪৩)।

পাঞ্জাবের গান্ধার ব্রাহ্মণদের রীতিনীতির বহু নিন্দা শুনা যায়। সেখানকার পুরুষেরা অগম্যগামী, স্ত্রীদের অসদ্‌ভাবে উপার্জিত অর্থে নিজেরা পুষ্ট। সেখানকার নারীরা নীতি ও লজ্জাহীনা—ইত্যাদি।[১] পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকন্যারাও বৈধব্যব্রত পালন করিতে নারাজ।[২]

বাহীক দেশের কথা আরও ভাল করিয়া বর্ণিত আছে ইহার পূর্ববর্তী ৪৪ শ অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র সভাতে পরিব্রাজক ব্রাহ্মণদের বর্ণিত কথা উল্লেখ করিয়া কর্ণ বলিতেছেন, "সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তরাশ্রিত ধর্মবাহ্য অশুচি বাহীকগণকে পরিবর্জন করিবে (কর্ণপর্ব, ৪৪, ৭)। শাকল নামক নগরে আপগা নদীর দেশে জর্তিক নামে যে সব বাহীক তাহাদের চরিত্র অতিশয় নিন্দিত (ঐ, ৪৪, ১০)। সেখানে নগরাগারে বুরুজে প্রকাশ্যস্থানে মত্ত নারীগণ মাল্যচন্দনাদি শোভিত অথচ বিবস্ত্রা হইয়া হাস্য এবং নৃত্য করে (ঐ, ৪৪, ১২)। তাহারা কামচারা স্বৈরিণী হইয়া প্রকাশ্যভাবে সকলের সঙ্গে মৈথুনে রত হয় এবং বহুতর অশ্লীল সঙ্গীত সহকারে পরস্পর বিনোদবচন উচ্চারণ করে (ঐ, ৪৪, ১৩)। উৎসবকালে আরও অসংযত নীচভাবে নাচিতে থাকে (ঐ, ৪৪, ১৪)। এইরূপ অসংযত দুরাত্মা বাহীকদের

১ Campbell, *Indian Ethnology,* Vol. I, pp, 408, 871

২ *Ibid.*

মধ্যে কেহ এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারে না (ঐ, ৪৪, ২২)। যেখানে পঞ্চনদী প্রবাহিতা সেই ধর্মহীন আরট্ট দেশে গমন করিবে না (ঐ, ৪৪, ৩১-৩২)। ধর্মহীন দাসমীয় [দসম দেশোদ্ভব অথবা শূদ্র দাসগণের সঙ্গে কামরতা নারীদের সন্তান (নীলকণ্ঠ টীকা)] অথবা যজ্ঞহীন বাহীকগণের দান দেব ব্রাহ্মণ পিতৃগণ গ্রহণ করেন না (ঐ, ৪৪, ৩৩)। সেই তো আরট্ট দেশ, সেখানকার লোকদের নামই বাহীক, সেখানকার ব্রাহ্মণেরাও সৃষ্টিছাড়া (ঐ, ৪৪, ৪৪)।

শুধু বাহীকদের দোষ দিলে চলিবে কেন, এমন যুগ গিয়াছে যখন মানুষের রীতি-নীতি যথোপযুক্তভাবে সংস্কৃতই হয় নাই। পাণ্ডু বলিতেছেন, "পূর্বকালে নারীগণ অনাবৃতা অর্থাৎ ধর্ম ও লোকাচারাদির দ্বারা অনিয়ন্ত্রিতা স্বৈরিণী কামাচার বিহারিণী ও স্বতন্ত্রা ছিলেন।"

> অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
> কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥ —মহাভারত, আদিপর্ব, ১২২, ৪

পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কৌমারাবধি তাহারা এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্তা হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না, ইহাই পুরাকালে ছিল ধর্ম।

> তাসাং ব্যুচ্চরমানানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
> না ধর্মোহভূদ্ বরারোহে স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ॥ —ঐ, ১২২, ৫

উত্তরকুরুদেশে এই ধর্ম এখনও প্রচলিত রহিয়াছে (ঐ, ১২২, ৭)।

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু। তিনি পিতামাতার নিকট উপবিষ্ট, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ-পূর্বক কহিলেন, "আইস, আমরা যাই" (ঐ, ১২২, ৯-১২)। ঋষিপুত্র ইহাতে দারুণ কুপিত হইয়া উঠিলে পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "বাছা রাগ করিও না, ইহাই সনাতন ধর্ম। পৃথিবীতে সর্ববর্ণের নারীরাই অনাবৃতা অর্থাৎ সর্বজনভোগ্যা স্বেচ্ছাবিহারিণী" (ঐ, ১২২, ১৪)।

এই প্রথা সনাতন কেবলমাত্র এই যুক্তিতে ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু ইহাকে ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইলেন না (ঐ, ১২২, ১৫)। তিনি বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দিলেন, হউক না কেন সনাতন প্রথা, তবু এখন হইতে যে স্ত্রী পতিকে অতিক্রম করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী ভার্যাকে অতিক্রম করিবে তাহাদের ভ্রূণহত্যার পাতক হইবে (ঐ, ১২২, ১৭-১৮)। তখনকার দিনের সনাতনীরা শ্বেতকেতুর এই নূতন ধর্মপ্রবর্তন চেষ্টা দেখিয়া কি ভাবে সনাতনধর্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন মহা-ভারতে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। এই সব বিষয়ে প্রাচীনযুগের সনাতনীদের

অপেক্ষা অর্বাচীন যুগের সনাতনীরা যে অনেক বেশি চতুর সকল দিক দিয়াই তাহা প্রমাণিত হয়।

যাহা হউক, পুরাকালে সবই ভালো ছিল এবং সনাতন সব বিধিই অলঙ্ঘ্য ইহা তপস্বী শ্বেতকেতু মানিতে পারেন নাই। সত্য ও তপঃপরায়ণ শ্বেতকেতু এইরূপ ক্লীবোচিত ধর্মকে স্বীকারই করেন নাই। পূর্বকালে যাহা ভালো তাহা অবশ্যই শ্রদ্ধেয় কিন্তু যাহা অন্যায় ও জঘন্য তাহা নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য। পুরাকালে যে সব কিছুই ভালো ছিল তাহা তো নহে। ব্যাসাদি মুনির যাহা জন্মকথা তাহা এখনকার দিনের সমাজেও নিদারুণ নিন্দার্হ। কুরুপাণ্ডবদের জন্মকথা বা কুন্তীর সন্তানলাভের কথা এখনকার দিনে লোকে কখনও ভালো বলিয়া মনে করিতে পারে না।

তখনকার দিনের সমাজনেতাদের কাছে সমস্যা বড়ই কঠিন। চারিদিকের শিথিল সামাজিক অবস্থা তো স্মৃতি ও পুরাণ হইতে দেখানই গেল। তাহারই মধ্যে উচ্চ আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং জাতিভেদকেও রক্ষা করিতে হইবে। এখন এই ঝটিকাকুল তিন নদীর তে-মোহানায় নৌকা ঠিক রাখা কি কঠিন। জাতি নির্ণীত হয় জন্মের দ্বারা অথচ সেই জন্মের শুদ্ধি নির্ভর করে নারীর শুচিতার উপর। নারীদের নৈতিকহীনতা দেখা যায় চারিদিকে, তাহা না বলিলে প্রতিকার হয় না। আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে জাতিভেদ প্রভৃতি সমাজব্যবস্থায় ঘা লাগে। কাজেই একই সঙ্গে নানা দিক সামলাইতে ও নানা রকমের কথা বলিতে হয়। দায়ে ঠেকিলে এরূপ না করিয়া উপায় কি? এখনও দেখা যায় এক দল প্রাচীনপন্থী বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার গৌরীদান সমর্থন করিতে গিয়া বলেন, "এমন না করিলে কন্যাদের ধর্ম থাকে না, কারণ নারী স্বভাবতই অসংযত কামুক"—ইত্যাদি। আবার এই কারণেই যে বালবিধবার বিবাহের প্রয়োজন আছে সেই কথা বলিলে তাঁহারাই বলেন, "বলেন কি! আমাদের দেশে নারীরা সব দেবী, তাঁরা প্রত্যেকেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী, কামাদি প্রবৃত্তির তাঁহারা অতীত।"

আমাদের এই যুগেও সামাজিক নিয়মের মধ্যে বহু অসঙ্গতি দেখা যায়। যে সমাজে পান হইতে চুন খসিলেই জাতি যায় সেই অত্যন্ত সনাতনপন্থী দক্ষিণভারতীয়দের মধ্যে কোনো নারী যদি দেবদাসী হয় তবে সে সর্বদাই শুচি। সাতপ্রকারের দেবদাসী। (১) দত্তা, যে আপনাকে দেবতার কাছে নিবেদন করে। (২) বিক্রীতা, যে দেবতার কাছে আত্মবিক্রয় করে। (৩) ভৃত্যা, নিজ কুলের কল্যাণার্থ দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃতা। (৪) ভক্তা, যে আপন ভক্তির টানে সংসারের বাঁধন ঘুচাইয়া দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ করে। (৫) হৃতা, অর্থাৎ যাহাকে ভুলাইয়া আনিয়া মন্দিরে উৎসর্গ

করা হয়। (৬) অলঙ্কারা, নৃত্যগীতে সুশিক্ষিতা করিয়া রাজারা যাহাকে মন্দিরের কাছে উৎসর্গ করেন। (৭) রুদ্রগণিকা বা গোপিকা, যাহারা বেতন পাইয়া দেবতার কাছে নাচে গায়। ইহারা নামে দেবদাসী হইলেও আসলে কামোপভোগ্যা পণ্যনারী।[১] এই নারীরা সমাজে খুব সম্মানিতা।[২] যুদ্ধকালে সৈন্যদের খাদ্য দিতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের পত্নীরা যাইতে পারিত না। সেই কাজ করিত এই সব দেবদাসী।[৩] কাজেই সময়ে সময়ে দেবদাসীর সংখ্যা নানাপ্রকারে বাড়াইতে হইত। রথের সময় পথে কোথাও রথ ঠেকিয়া গেলে রথের সেবকরা গৃহে আসিতে পারে না, তখন দেবদাসীরাই রথের কাছে গিয়া তাহাদের খাদ্য জোগায়।[৪] চির-আয়ুষ্মতীর হাতে বিবাহের কণ্ঠসূত্র নেওয়াই সৌভাগ্য। দেবদাসীদের বৈধব্য নাই তাই তাহাদের হাতে ঐ দেশে বিবাহ-কালে তালী অর্থাৎ বিবাহসূত্র কন্যারা নেয়।[৫] এই কারণেই যে সব মাঙ্গল্য কর্মে বিধবার অধিকার নাই সেখানে বেশ্যাদের অধিকার আছে।

আমাদের দেশেও বিবাহে ও দুর্গাপূজায় বেশ্যার দ্বারের মাটির প্রয়োজন হয়। কাজেই বেশ্যার বিশেষ মাহাত্ম্য আমাদের দেশেও যে নাই তাহা নহে।

কৈকোলান জাতির মধ্যে প্রতি পরিবার হইতে অন্তত একটি কন্যা দেবদাসী করিবার জন্য দান করিতে হয়।[৬] কর্ণাটে দেবদাসীরা নিজেদের বেশ্যা বা "নাই-কানী" বলে।[৭] দেবদাসী হইলে সকল প্রকার দোষ খণ্ডিত হইয়া স্ত্রীলোক শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া যায়। বেশ্যারা "নায়িকা" বলিয়া হাব ভাব ভঙ্গীকে "নাইকামী" বলে। পূর্ববঙ্গে তাহাকে "নাইকামী-পনা" বলে। ন্যাকামিও কি তাই?

মঙ্গলকর্মে বিধবারা বর্জিত অথচ বেশ্যারা আদৃত ইহা অদ্ভুত। এইরূপ বহু অসঙ্গতিই আমাদের আছে। এইরূপ অসঙ্গতি মিলাইতে গিয়াই প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারেরা নারীর অশেষবিধ দোষের কীর্তন করিয়াও এই কথা বলিলেন যে দেবতারা নারীকে এমনই পবিত্র করিয়াছেন যে কিছুতেই তাঁহারা অশুচি হন না। দেবতারা নাকি প্রথমে নারীগণকে সম্ভোগ করেন, পরে সম্ভোগ করেন মানুষেরা, ইহাতে তো

১ Thurston, *Castes and Tribes of Southern India.* Vol. II, pp. 125-158

২ *Ibid.*, p. 127

৩ *Ibid.*, p. 133

৪ *Ibid.*

৫ *Ibid.*, p. 139

৬ *Ibid.*, Vol. III, p. 37

৭ *Ibid.*, Vol. VI, p. 406

কোনো দোষ নাই (অত্রিসংহিতা, ১৯৪)। তাই নারী উপপতির দ্বারা অশুচিত্ব প্রাপ্ত হন না—"ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ" (অত্রিসংহিতা, ১৯৩ ; বসিষ্ঠস্মৃতি, ২৮, ১)। (সবর্ণের তো কথাই নাই) যদি অসবর্ণেরও কাহারও দ্বারা নারী গর্ভিণী হইয়া থাকেন তবে প্রসব হইলেই তিনি শুদ্ধ হন (অত্রিসংহিতা, ১৯৫)। পুনরায় রজঃপ্রবৃত্তি হইলেই বিমল কাঞ্চনের ন্যায় তিনি বিশুদ্ধ হন (ঐ, ১৯৬)। দেবলস্মৃতিও ঠিক এই কথাই বলেন (৫০, ৫১)।

অত্রি বলেন সোম-অগ্নি-গন্ধর্ব দেবতা নারীকে সম্ভোগ করিয়াছেন (অত্রিসংহিতা, ১৯৪)। সোম তাহাকে দেন পবিত্রতা, গন্ধর্বগণ দেন শিক্ষিত সুন্দর বাণী, অগ্নি দেন সর্বমেধ্যতা ও সর্বভক্ষ্যতা, অতএব নারীগণ নিষ্কল্মষ ও সদাই মেধ্য (বৌধায়ন স্মৃতি, ২, ২, ৬৪ ; অত্রি ১৪০ ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১, ৭১)।

নারীগণের পবিত্রতা অতুলনীয়, কেহ তাহাদিগকে অপবিত্র করিতে পারে না, মাসে মাসে তাহাদের ঋতুস্রাবই তাহাদের সকল দুরিত ধৌত করিয়া দেয় (বৌধায়ন স্মৃতি, ২, ২, ৬৩)।

নারীদের সম্বন্ধে এই সমস্ত মতবাদ যে পুরাকালে শুধু Theory বা কথার কথা মাত্র ছিল তাহা নহে। সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেও ইহার পূর্ণ সমর্থন মেলে। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে মহাভারতে দেখা যায় মহর্ষি গৌতম তাঁহার পত্নী অহল্যাকে অতিথি ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারদোষে দূষিত দেখিয়া দণ্ড দিতে উদ্যত হন। পরে তিনি নিজেই এই জন্য অনুতপ্ত হন ও অহল্যাকে ক্ষমা করেন। সেই স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া গৌতম ক্ষমা করিলেন এবং সেই স্ত্রী লইয়াই ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুঝা যায় তখনকার দিনে লোকের মন এই সব বিষয়ে খুব সহনশীল ছিল (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬৫ অধ্যায়)।

মোট কথা আমরা দেখিতে পাই অহল্যার এই চরিত্রস্খলনের কথা জানিয়াও গৌতম তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন এবং তখনকার দিনের সমাজও এই জন্য গৌতমকে "এক ঘরে" করিল না।

পদ্মপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে যে এক মুনির মাতা ছিলেন স্বৈরিণী। এইরূপ কেমন করিয়া হয় তাহা ঔশীনর শিবি জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন, বৃহস্পতির স্ত্রী তারাতে চন্দ্র উপগত হন, চন্দ্রের দ্বারা গর্ভিণী তারার সেই সন্তান বুধ। জন্মদোষ হেতু বুধকে অনাদর করায় এক মুনিপুত্রকে বুধ শাপ দেন। সেই শাপে মুনিপুত্র স্বৈরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২১৫ অধ্যায়)। চন্দ্র কিছুতেই তারাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। অবশেষে যুদ্ধ করিয়া বৃহস্পতি তারাকে পুনঃপ্রাপ্ত

হন। তখন তারা গর্ভিণী। বৃহস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই গর্ভ কাহার? তারা লজ্জিতা হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। পরে বুধ গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজেই আপন মাতাকে আপন পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধ্বী তারা (৩০ শ্লোক) বলিলেন, "চন্দ্র"।

ইত্যুক্তে চ তয়া সাধ্ব্যা চন্দ্রঃ স্বতনয়ং বুধম্। ইত্যাদি —উত্তরখণ্ড, ২১৫, ৩০

চন্দ্র আপন পুত্র লইয়া গেলেন। বৃহস্পতিও সেই তারাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন (৩১ শ্লোক)।

এই গল্পই স্কন্দপুরাণে আবন্ত্য খণ্ডে সোমেশ্বর লিঙ্গ কথায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে (২৮ অধ্যায় ৮২-৯৫)।

এই ঘটনাটি খুব রসযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৫৮ অধ্যায়)।

শিবপুরাণে আছে যুদ্ধের পর চন্দ্র তারাকে ফিরাইয়া দিলে বৃহস্পতি গর্ভসমেত তারাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না (২৪)। গর্ভমুক্ত হইলে বৃহস্পতি তারাকে গ্রহণ করিলেন (২৭; জ্ঞান সংহিতা, ৪৫ অধ্যায়)।

বৃহস্পতি নিজেও ব্যভিচার অপরাধে অপরাধী। স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্য-পত্নীর সহিত বৃহস্পতি সঙ্গত হন। তাহাতে ভরদ্বাজের জন্ম। এইজন্য ভরদ্বাজ সঙ্করবর্ণ (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড, কেদারখণ্ড, ২১ অ, ৪৩)। অথচ বৃহস্পতি ভরদ্বাজ সকলেই তো সমাজে পূজিত।

এইখানে বায়ুপুরাণ হইতে আখ্যানটির আর একটু ভিন্ন রূপ দেওয়া যাইতেছে। অশিজ ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতি। দেবগুরু নিজ ভ্রাতৃবধূকে স্বীয় কামাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে তিনি নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া কহিলেন, "আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আহিত গর্ভ ধারণ করিতেছি (বায়ুপুরাণ, ৯৯ অ, ৩৬-৩৮)। এই অবস্থা অতীত হইলে তখন যেরূপ হয় করিও (ঐ, ৪০)। কামাত্মা বৃহস্পতি তাহা মানিলেন না (ঐ, ৪১)। গর্ভস্থ সন্তান তাঁহার রেতঃসেকে বাধা দিলে বৃহস্পতি তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে এমন সময়ে বাধা দিলে? এজন্য তোমাকে দীর্ঘতমোমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে (ঐ, ৪২-৪৫)। এই শাপ লইয়া দীর্ঘতমা ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন, তেজে তিনিও বৃহস্পতির তুল্য (ঐ, ৪৬)।

পরে দীর্ঘতমাও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন (ঐ, ৫৮), যদিও কনিষ্ঠভ্রাতা ঔতথ্যের পত্নী তাহাতে সম্মত ছিলেন না। ঋষি শরদ্বান এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া দীর্ঘতমাকে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন (ঐ, ৬২)।

ভাসিতে ভাসিতে দীর্ঘতমা বলিরাজার দেশে আসিলে বলি তাঁহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন (ঐ, ৬৪-৬৫)। পুত্রার্থী দানবরাজ তাঁহার নিকট পুত্রবর চাহিলে (ঐ, ৬৭) দীর্ঘতমা সম্মত হইলেন। (ঐ, ৬৮)। দেবী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া ঘৃণাবশতঃ নিজে তাঁহার কাছে না গিয়া নিজ দাসীকে ঋষির কাছে প্রেরণ করিলেন। ধর্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে দুইটি মহৌজা পুত্র উৎপাদন করিলেন (ঐ, ৬৮-৭০)।

জনয়ামাস ধর্মাত্মা পুত্রাবেতৌ মহৌজসৌ ॥ —ঐ, ৭০

ঐ পুত্রদ্বয়ই ঋষি কক্ষীব এবং চক্ষুষ। তাঁহারা যথাবিধি বেদাধ্যায়ী ও ব্রহ্মবাদী (ঐ, ৭১)। সমাজে কি এই সব অপরাধের জন্য বৃহস্পতি বা দীর্ঘতমাকে পতিত হইতে হইয়াছে ? মহর্ষিদের উচ্চ আসনই তাঁহাদের জন্য সমাজে নির্দিষ্ট ছিল। এই উপাখ্যানটির অনুবাদ ঠিক দেওয়া কঠিন বলিয়া মূল অংশটাই উদ্ধৃত হইল।

অশিজো নাম বিখ্যাত আসীদ্ ধীমান্ ঋষিঃ পুরা।
ভার্যা বৈ মমতা নাম বভূবাস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
অশিজস্য কনীয়াংস্তু পুরোধা যো দিবৌকসাম্।
বৃহস্পতি বৃহত্তেজা মমতাং যোঽভ্যপদ্যত ॥ ৩৭
উবাচ মমতা তং তু বৃহস্পতিমনিচ্ছতী।
অন্তর্বত্ন্যাস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যাষ্টমিতা ইতি ॥ ৩৮
অয়ং হি মে মহাগর্ভো রোচতেঽতি বৃহস্পতে।
অশিজং ব্রহ্ম চাভ্যস্য ষড়ঙ্গং বেদমুদ্গিরন্ ॥ ৩৯
আমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি ন মাং ভজিতুমর্হসি।
অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে প্রভো ॥ ৪০
এবমুক্তস্তয়া সম্যগ্ বৃহত্তেজা বৃহস্পতিঃ।
কামাত্মানং মহাত্মাপি নাত্মানং সোঽভ্যধারয়ৎ ॥ ৪১
সম্বভূবৈব ধর্মাত্মা তয়া সার্দ্ধং বৃহস্পতিঃ।
উৎসৃজন্তং তদা রেতো গর্ভস্থঃ সোঽভ্যভাষত ॥ ৪২
নো স্নাতক ন্যসোহস্মিন্ দ্বযোর্নেহাস্তি সম্ভবঃ।
আমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি পূর্বঞ্চাহমিহাগতঃ ॥ ৪৩
শশাপ তং তদা ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ।
অশিজং তং সুতং ভ্রাতুর্গর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ ॥ ৪৪
যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে সর্বভূতেপ্সিতে সতি।
মামেবমুক্তবান্ মোহাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি ॥ ৪৫ ইত্যাদি

—বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়

এই আখ্যানটি ঐ বায়ুপুরাণে ঐ অধ্যায়েই আর একটু পরে পুনরায় উল্লিখিত

হইয়াছে (১৪১-৫০)। তাহাতে নূতন যা এক আধটুকু আছে তাহাই মাত্র দেখান যাইতেছে। পূর্বে অশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর আসন্ন গর্ভাবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন (১৪১)। অশিজপত্নী বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ, বৃহস্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে শুভে, তুমি স্বীয় দেহ বিভূষিত করিয়া আমাকে মৈথুন দান কর (১৪১-১৪২)।

ভ্রাতুর্ভার্যাং স দৃষ্ট্বাথ বৃহস্পতিরুবাচ হ।
অলঙ্কৃত্য তনুং স্বাং তু মৈথুনং দেহি মে শুভে॥

বৃহস্পতির এই কথায় অশিজপত্নী উত্তর করিলেন, বিভো, আমি অন্তর্বত্নী আছি। আমার গর্ভ পূর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছে (ঐ, ১৪২)। তুমি অমোঘরেতাঃ—বিশেষতঃ এইরূপ ধর্মও অতি গর্হিত। সুতরাং আমি তোমার প্রস্তাবে অসম্মত। অশিজপত্নী এই কথা বলিলে বৃহস্পতি হাসিয়া উত্তর দিলেন (ঐ, ১৪৩), তুমি আমাকে নীতি শিখাইতে আসিও না, এই বলিয়া হর্ষভরে সহসা তাহাকে মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (ঐ, ১৪৪)। অনন্তর গর্ভস্থ বালক অমোধরেতা বৃহস্পতিকে রেতঃপাত করিতে নিষেধ করিলেন (ঐ, ১৪৫-৪৬)। সর্বভূতসুখকর এমন কালে এই নিষেধ করাকে বৃহস্পতি তাঁহাকে শাপ দিলেন যে দীর্ঘতমোমধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে (ঐ, ১৪৭)।

তবু বৃহস্পতির আহিত বীর্যে সদ্য এক শিশু জন্মিল। সেই সদ্যোজাত কুমারকে দেখিয়া অশিজপত্নী বলিলেন, হে বৃহস্পতে, আমি গৃহে যাই তুমিই এই "দ্বাজ" অর্থাৎ দুই পিতা হইতে জাত জারজ শিশুকে ভরণ কর।

সদ্যোজাতং কুমারং তং দৃষ্টাথ মমতাব্রবীৎ।
গমিষ্যামি গৃহং স্বং বৈ ভর দ্বাজং বৃহস্পতে॥ —ঐ, ১৪৯

"দ্বাজ"কে ভরণ কর এই কথা বলায় পুত্রের নাম হইল ভরদ্বাজ।

ভরস্ব দ্বাজমিত্যুক্তো ভরদ্বাজস্ততোঽভবৎ॥ —ঐ, ১৫০

স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ড হইতে আর একটি উপাখ্যান বলা যাউক। রাজা দেবপদ্মের কন্যা কামপ্রমোদিনী পরমাসুন্দরী। রাক্ষস সম্বর তাঁহাকে হরণ করেন (স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড, ১৬৯ অধ্যায়)। তাঁহার পরিত্যক্ত হারকেয়ূরাদির কাছেই মাণ্ডব্য মুনি ছিলেন তপস্যায় রত। মাণ্ডব্যকেই অপরাধী সন্দেহ করিয়া শূলে দেওয়া হইল। রাক্ষস শম্বর কিছুকাল পরে সেই কামপ্রমোদিনীকে ফিরাইয়া দিলে শূল হইতে নাবাইয়া ঐ মাণ্ডব্যের সঙ্গেই রাজা তাহাকে বিবাহ দেন (ঐ, ১৭২ অ, ১৭-২০) রাক্ষসপরিত্যক্তা কামপ্রমোদিনীকে ঘরে নিতে মুনির কোনো বাধাই দেখা গেল না।

কথাসরিৎসাগরে দেখা যায় মৃত্যুকালে স্ত্রীকে স্বামী বলিলেন, আমার মৃত্যুর পরে তুমি যদি বিবাহ কর তাহাতে সন্তান হইলে সেই সন্তানই আমার পারলৌকিক কর্ম করিবে। তাহাতেই পুত্রকৃত্য সম্পন্ন হওয়ায় আমার উদ্ধার হইবে (কথাসরিৎসাগর, ৯৩ তরঙ্গ)। ধর্মজ্ঞ রাজা ত্রিবিক্রমসেন এই কথা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন (ঐ)। বিবাহিত বিধবার পুত্র হইলেও দেখা যায় পূর্বপতির পারলৌকিক কর্মানুষ্ঠানে তখন কোনো অসুবিধা ঘটিত না।

কথাসরিৎসাগরের অনুরূপ উদারতার কথা পূর্বে বর্ণিত ইরাবানের উপাখ্যানেই দেখা যায়। নাগরাজ ঐরাবতের পুত্রকে সুপর্ণের দল জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। সেই দুঃখে নাগরাজের নিঃসন্তান পুত্রবধূ বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন মহাত্মা নাগরাজ ঐরাবত সেই কামবশানুগা দীনচেতনা পুত্রবধূকে ভার্যা করণার্থ অর্জুনের কাছে সমর্পণ করিলেন। পার্থ তাহাকে ভার্যা রূপেই স্বীকার করিলেন।

ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হৃতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥ ৮
ভার্যার্থং চ তাং চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্॥ —মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৯০, ৯

ঐরাবতের এই পুত্রবধূর গর্ভে অর্জুনের আত্মজ মহাবীর্য ইরাবানের জন্ম হইল (ঐ, ঐ, ৭)। ইরাবানের পিতৃব্য দুরাত্মা অশ্বসেন ছিলেন পার্থবিদ্বেষী। কাজেই অশ্বসেন-পরিত্যক্ত ইরাবান নাগলোকে মাতা ও মাতৃকুলের দ্বারাই পরিরক্ষিত ও সংবৃদ্ধ হইলেন।

স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিতঃ।
পিতৃব্যেণ পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্ দুরাত্মনা॥ —ঐ, ঐ, ১০

অর্জুন ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রূপবান বলসম্পন্ন গুণবান সত্যবিক্রম ইরাবান জনক অর্জুনের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

রূপবান্ বলসম্পন্নো গুণবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ইন্দ্রলোকং জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জুনং গতম্॥ —ঐ, ঐ, ১১

মহাবাহু সত্যবিক্রম ইরাবান বিনয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া শান্তভাবে পিতাকে অভিবাদন করিলেন।

সোঽভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরং সত্যবিক্রমঃ।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো বিনয়েন কৃতাঞ্জলিঃ॥ —ঐ, ঐ, ১২

অর্জুনের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র ইরাবান্।"

ন্যবেদয়ত চাত্মানমর্জুনস্য মহাত্মনঃ।
ইরাবানস্মি ভদ্রং তে পুত্রশ্চাহং তব প্রভো॥ —ঐ, ঐ, ১৩

দেবরাজনিবেশনে আগত আত্মসদৃশ গুণবান্ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পার্থও আনন্দিত হইলেন।

পরিষ্বজ্য সুতঞ্চাপি হ্যাত্মনঃ সদৃশং গুণৈঃ।
প্রীতিমান্ অভবৎ পার্থো দেবরাজনিবেশনে ॥ —ঐ, ঐ, ১৫

অর্জুন তাহাকে বলিলেন, "আমাদের আসন্ন মহাযুদ্ধে যেন তোমার সাহায্য পাই।" ইরাবানও সেই আদেশ স্বীকার করিলেন।

যুদ্ধকালে ত্বয়াস্মাকং সাহ্যং দেয়মিতিপ্রভো।
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা চ যুদ্ধকাল ইহাগতঃ ॥ —ঐ, ঐ, ১৭

কুরুক্ষেত্র সমরে ইরাবান প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করেন। যথোচিত স্নেহ ও সমাদর করাতেই পাণ্ডবেরা ইরাবানের সেবা পাইয়া ছিলেন। ঘৃণায় অনাদর করিলে এই ইরাবানই এক দুর্জয় শত্রু হইয়া উঠিতে পারিত। কাজেই শুধু মনুষ্যত্বের হিসাবে নহে রাজনীতির দিক দিয়াও পাণ্ডবেরা মূঢ়ের মত আচরণ করেন নাই।

ভক্তদের উদারতার মূলে কিন্তু রাজনীতির কোনো হিসাব নাই। সেই উদারতার মূলে হইল মানুষোচিত ভক্তি ও প্রেম।

হরিভক্তি বিলাস বলেন

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ —২, ৭

যেমন রসায়ন (alchemy) ক্রিয়াগুণে কাঁসার মত হীন ধাতুও সুবর্ণে পরিণত হয় তেমনি ভক্তি-দীক্ষার গুণে নীচবর্ণও বিপ্রতা প্রাপ্ত হন। স্বয়ং মহাপ্রভুর নির্দেশে বহু অব্রাহ্মণবংশীয়েরা গোস্বামী হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে দীক্ষা দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন।

অতিশয় আচারনিষ্ঠ দক্ষিণ ভারতেও প্রাচীনকালে বহু অলবার ভক্ত নীচ শূদ্র ও অন্ত্যজ কুলে জন্মিয়াছেন। অলবারেরা ব্রাহ্মণাদিকেও ভক্তির দীক্ষা দিয়াছেন। স্বয়ং রামানুজের গুরু তিরিকুচকুণ্ডরম্ ছিলেন অব্রাহ্মণ। মান্দ্রাজ হইতে ছয় ক্রোশ দূরে পুণামালি গ্রামে এখনও তাঁহার স্মরণার্থ বহু ভক্তের মেলা হয়।

বৈষ্ণব ভক্তদের উদারতা তো চিরপ্রসিদ্ধ। শৈবভক্তদের উদারতাও কম নহে। শৈবগুরু বসবের উদারতার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা যখন বলিলেন, "দেবতাদেরও জাতি আছে" তখন শৈবভক্তরা বলিলেন, "মহাদেব সকল বর্ণাশ্রম ধর্মের অতীত"।

জ্ঞানমার্গের প্রখ্যাত আচার্য শঙ্করাচার্য বলেন, ব্রাহ্মণ হইতেই প্রবৃত্তি ও বৃত্তি অনুসারে ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদি উদ্ভূত।[১]

মোক্ষধর্মে অধিকারিত্ব সিদ্ধির জন্য মুনি ব্যাস ঘোষণা করিলেন যে এক বর্ণের মধ্যেই গুণাত্মক চাতুর্বর্ণ্য বিদ্যমান।

একস্মিন্নেব বর্ণে তু চাতুর্বর্ণ্যং গুণাত্মকম্।
মোক্ষধর্মেঽধিকারিত্বসিদ্ধয়ে মুনিরভাষত্॥ – ঐ, ৫, ৪৯

ব্রাহ্মণদের মধ্যে জন্মিয়াও তাঁহারাই ব্রাহ্মণ যাঁহারা সরল, শুদ্ধবর্ণাভ, ক্ষমাশীল, দয়ালু ও স্বধর্মনিরত।

ঋজবঃ শুদ্ধবর্ণাভাঃ ক্ষমাবন্তো দয়ালবঃ।
স্বধর্মনিরতা যে স্যু স্তে দ্বিজেষু দ্বিজাতয়ঃ॥ —ঐ, ৫১

যাঁহারা কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধন, ভীষণ-কর্মপ্রিয়, তাই ত্যক্তস্বধর্ম্ম ও রক্তাঙ্গ তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হইলেন।

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ —ঐ, ৫২

যাঁহারা গোপালনে ও কৃষিকর্মে রত তাই স্বধর্মত্যাগী পীতবর্ণ তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলজ হইয়াও বৈশ্য হইয়া গেলেন।

গোষু বৃত্তিং সমাধায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
ন স্বকর্ম করিষ্যন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ —ঐ, ৫৩

যাঁহারা হিংসাপরায়ণ, মিথ্যাচারী লোভী এবং জীবিকার জন্য সর্বপ্রকার কর্মরত কৃষ্ণাঙ্গ শৌচপরিভ্রষ্ট তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইলেন।

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ —ঐ, ৫৪

শেষ তিনটি শ্লোক মহাভারতে শান্তিপর্বে, ১৮৮ অধ্যায়ে ১১, ১২, ১৩ সংখ্যক রূপে আছে। এই পুস্তকেই ১২ পৃষ্ঠায় তাহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গান্তরে আছে।

শুধু বেদপুরাণের যুগে কেন এই দেশের কৌলীন্যের ইতিহাস দেখিলেও সমাজের সহিষ্ণুতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসী যদি পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হন তবে তিনি ও তাঁহার বংশ পতিত হন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি অনাচরণীয় শূদ্রের অন্নও খাইতেন। পরে তিনি নীচ

১ সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, বেদব্যাস পক্ষ, রঙ্গাচার্য সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯০৯

জাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন।[১] সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার শিষ্য (জন্ম ১৪০৩ শক)। কুলকল্পতরু মতে

উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়।[২]

কুলচন্দ্রিকাধৃত কুলার্ণব মতে

অবধৌত নাহি ছিল জাতির কথাটি।[৩]

চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দপ্রভুর ভাতছিটান প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে "ভ্রষ্ট অবধূত" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "তোর জাতিকুল নাহি সহজে পাগল" ইত্যাদি (মধ্যখণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। আবার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাচার্য বলেন, অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করা কি চলে? অবধূতের তো অন্নবিচার নাই, অন্নদোষ সন্ন্যাসীর হয় না, "নান্নদোষেণ মস্করী"।

নিত্যানন্দ ভেক-বিধিতে নীচজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার গর্ভে গঙ্গা ও বীরভদ্রের জন্ম হয়।[৪]

নিত্যানন্দ ছিলেন প্রথমে সন্ন্যাসী। তাঁহার তিন পত্নীর উল্লেখ দেখা যায়। বসুধা দেবীই পাণিগ্রহণমন্ত্রে পরিগৃহীতা। জাহ্নবী বাগ্‌দত্তা, ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা। শেষ দুইজনের সঙ্গে বৈবাহিক মন্ত্রে বিবাহ হয় নাই। বীরভদ্র হইলেন জাহ্নবীর সন্তান।[৫] এই বীরভদ্র ও জাহ্নবীর ধারা এখনও সমাজে মাননীয় গুরুর পদবীতে অধিষ্ঠিত। অবশ্য এই ক্ষেত্রে নৈতিক অপরাধ হয় নাই, হইয়াছে সামাজিক অপরাধ। কিন্তু সমাজ তো নৈতিক অপরাধ অপেক্ষা সামাজিক অপরাধকেই অধিক দূষণীয় মনে করেন। বল্লাল সেনও নীচজাতীয়া পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[৬] অথচ তাঁহারই প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথা সমাজ মাথায় করিয়া লইলেন।

সন্ন্যাসীর পুনরায় বিবাহ হইলে আমরা দোষের কিছুই মনে করি না, "কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে ভক্ত নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বর সোপান ও মুক্তাবাঈও এইজন্যই সমাজে নিন্দিত হইয়াছেন।[৭] বাংলাদেশের সমাজদেহে প্রাণশক্তি বেশি ছিল বলিয়া

১ লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধ নির্ণয়, ১৯০৯, পৃ. ৩৯২

২ ঐ, পৃ. ৩৯১

৩ ঐ, পৃ. ৩৯০

৪ ঐ, পৃ. ৪৪৯

৫ ঐ, পৃ. ৫১১ ধৃত সারাবলী

৬ ঐ, পৃ. ৭৩৫

৭ R. D. Ranade, *Mysticism in Maharashtra*, pp. 30-33

নিত্যানন্দকে সকলে চালাইয়া লইতে পারিলেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ তো সমস্ত ভারতে পূজিত, তাহাদের কুলের আদি প্রতিষ্ঠা একজন সন্ন্যাসী হইতে। তখনকার দিনে কেহ কেহ ঐ সন্ন্যাসীকে কন্যাদান করিয়া সংসারী করার বিপক্ষে ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পূর্বপরিচয়ে আস্থা স্থাপন করেন নাই। কিন্তু সন্দেহবাদীদের মুখে ছাই দিয়া পাণ্ডিত্যে সাধনায় ও সর্বভাবে এই বংশ এখন দেশের গৌরবস্বরূপ।

ভাওয়ালের রাজবংশে কুমারকে লইয়া কতই গোলমাল চলিয়াছিল কিন্তু ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরও নাকি সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। একজন কৃতীপুরুষ আসিয়া বলেন তিনি ব্রাহ্মণ এবং তাঁর বিপুল বিত্তের বলে ঘটকের দল কুলশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিলেন বজ্রযোগিনী গ্রামের পুষীলালবংশীয় একটি বালক চারি বৎসর বয়সে হারাইয়া যায়। ইনিই সেই বালক। তাই কবিদের গান আছে—

তাঁতী ছিল কায়েৎ হোলো ঢাকার মুন্সী নন্দলাল।
আবার ভাওয়ালেতে উদয় হোলো বজরজুগ্গীর পুষীলাল॥

কুলশাস্ত্র দেখিলে দেখা যায় বহু কুলীনের বংশে নানা খোঁটা রহিয়া গিয়াছে। ফুলিয়া মেলের ইতিহাসে দেখা যায় শ্রীনাথ চাটুতির দুইটি অদত্তা কন্যা ধাঁদার ঘাটে জল আনিতে যান। হাঁসাই থানাদার নামে জনৈক মুসলমান তাঁহাদের নাকি জাতিপাত করে। পরে তাঁহাদের মধ্যে এক কন্যাকে বিবাহ করেন পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, অন্য কন্যাকে বিবাহ করেন গঙ্গাবর গঙ্গোপাধ্যায়।[১] কেহ কেহ বলেন এই কথা শত্রুদের রটনা।[২] কিন্তু সত্য হইলেও ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কন্যাদের তো কোনো দোষ ছিল না। তাহাদের এই দুর্গতির জন্য দায়ী সমাজ।

ভাদুড়ীদের মধ্যে রোহিলা পটী আছে, তাহার ইতিহাস কুলশাস্ত্রে পাই—

ভাদুড়ী, প্রচণ্ড খাঁ রোহিলার মহিলা।
বাদসার দেওয়ান হয়ে, সাথে লয়েছিলা॥
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দু ভাই।
দেশে আসি মাতা কয় "হাম রোহিলা যাই"॥
এই তো রোহিলাপটী সুবুদ্ধির বুদ্ধিতি॥ ৩

কুতুবখানির ইতিহাসও কুলশাস্ত্রে আছে—

কুতুব খাঁ নবাবের শোয়ার যবন।
মথুরার মেয়ে হরে, হোয়ে সে আগুন॥

১ লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধনির্ণয়, পৃ. ৪২৯-৩০
২ ঐ, পৃ. ৫০৮
৩ ঐ, পৃ. ৩৬২

সেই কন্যা বিভা করে মৈত্র মৃত্যুঞ্জয়।
ইহা দেখি কুলজ্ঞে কুতুবখানি কয়॥ [১]

আলিয়াখানির সমরূপ ইতিহাসও ঐখানেই আছে।

পণ্ডিতরত্নীমেলেও যবনদোষ আছে।[২] কুলীনের ছত্রিশ মেলেই যবনাদি অপবাদের কথা শুনা যায়।[৩] পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশী মেলে কুণ্ডদোষ ও গোলকদোষও আছে। পতি জীবিত থাকিতে জারজসন্তান হইলে হয় কুণ্ড, পতির মৃত্যুর পরে হইলে হয় গোলক (মনু, ৩, ১৭৪)। মেলচন্দ্রিকা পণ্ডিতরত্নীর এই দুই দোষের কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৪] বালীমেলেও ম্লেচ্ছদোষ কেশরকুনীদোষ আছে।[৫] শুভরাজখানী মেলে "যবননীতা কন্যাবিবাহে অপ্রায়শ্চিত্তী" হওয়ার দোষ হইল।[৬]

গৌরীর যবনদোষ প্রকাশ্য যে ছিল।
তার কন্যা কীর্তি চট্টো বিবাহ করিল॥[৭]

কেশব চক্রবর্তীর কুলেও এইরূপ দোষ ছিল।

প্রথমেতে বিয়ে করে গ্রাম রসুলপুর।
সে কন্যা হরে নিল আবদুল রসুল॥[৮]

কেহ কেহ বলেন ইহা মিথ্যা অপবাদ।

পরিহালমেলের মধ্যে সন্ন্যাসিত্ব ও বলাৎকার হইয়াছে এইরূপ অপবাদ আছে।[৯] শুঙ্গো সর্বানন্দী মেলেও এই অপবাদ আছে।

পরিহালে বলাৎকারে শুঙ্গো সর্বানন্দী॥[১০]

১ সম্বন্ধনির্ণয়, পৃ. ৩৬২
২ ঐ, পৃ. ৪৮৭
৩ ঐ, পৃ. ৬৯৫
৪ ঐ, পৃ. ৪৮৭-৮৮
৫ ঐ, পৃ. ৪৯৮
৬ ঐ, পৃ. ৪৯৫
৭ ঐ
৮ ঐ, পৃ. ৪০০
৯ ঐ, পৃ. ৪৯২
১০ ঐ, পৃ. ৪৯৯

বারেন্দ্রের মধ্যে পুরন্দর মৈত্রের কুলে "জোনালী" (জয়নালী) দোষের কথা পাওয়া যায়। চাঁড়ালী দোষের কথাও দেখা যায়।[১]

সদানন্দ-খানীমেলে ও রমাকান্ত-বংশে কেশরকুনী দোষ আছে। পূর্ববঙ্গের কুলাচার্য মতে তাহা বলাৎকার বলিয়া উল্লিখিত ও উপেক্ষিত।[২]

কাঁটাদিয়া দাস্তবংশ কথাতে আছে বানিয়ার কন্যা লইয়া হিরণ্য পালাইয়া যান। বেনেনীর পরিচয় লুকাইয়া হিরণ্য তাহাকে লইয়া অন্যত্র বাস করেন।[৩]

এই সকল দোষের মধ্যে যেথানে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা সত্য হইলেও উপেক্ষণীয়, কারণ আসলে তাহা সমাজেরই দুর্বলতা-দোষ। কিন্তু দুঃখ হয় যখন এইসব বংশীয়েরাই এখন সামান্য কারণেও অন্যের বিন্দুমাত্র দোষ দেখিলে বা না দেখিলেও তাহাকে "একঘরে" করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সনাতনী দোহাই পাড়েন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে এক-একজন পুরুষ অসংখ্য বিবাহ করিতেন। অনেক সময় খাতায় শ্বশুরবাড়ির নাম লিখিয়া রাখিতেন। স্ত্রীদের চিনিতেনও না। ইহাতে নানাবিধ নৈতিক অধোগতি অনিবার্য। অন্যদিকে বংশজ-ব্রাহ্মণেরা বিবাহই করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী দুর্লভ হওয়ায় নানা দেশ হইতে নৌকা ভরিয়া লোকে অনেক কন্যা লইয়া বিক্রয় করিতে আনিত। সেইসব কন্যার মধ্যে কেহ বা বিধবা, কেহ বা নীচকুলোৎপন্না, কেহ বা হিন্দুই নয়। সকলকেই ব্রাহ্মণকুমারী বলিয়া উপস্থিত করা হইত এবং লোকে গরজের চোটে অত খোঁজ খবর না লইয়াই অল্প মূল্যে কিনিয়া লইয়া বিবাহ করিতেন। এইসব কন্যাদের পূর্ববঙ্গে "ভরার মেয়ে" বলিত। পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক স্থানেই বংশজদের ঘরে এইসব ভরার মেয়ের খবর মেলে। অনেক ভরার মেয়ের সম্প্রদায় জাতি কুল প্রভৃতির কথাও পরে ধরা পড়িত। শত্রুপক্ষ ইহা লইয়া হৈচৈ করিলেও আত্মীয়েরা চাপিয়া যাইতেন। আর হৈচৈ করিবার মত কুলও পাওয়া যাইত কম। কারণ প্রতি ঘরেই নিজেদের বা আত্মীয়দের মধ্যে কোনো না কোনো দোষ পাওয়া যাইতই। কে কাহাকে বাধা দিবে? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে এইসব কন্যাদের বংশধরেরাও

১ সম্বন্ধনির্ণয়, পৃ. ৩৬১

২ ঐ, পৃ. ৫৬২, ৪৩৫

৩ ঐ, পৃ. ৪৩৮-৩৯

পরে প্রচণ্ড সমাজপতি হইয়া অপবাদ দিয়া অন্যকে কুল হইতে ঠেলিতে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনেক স্থানে নানা আকারে কৌলীন্য অর্থাৎ জাতির মধ্যেও জাতি বা আভিজাত্যপ্রথা (?) প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে কোনো কোনো বংশের লোক বিনা সাধনাতেই কুলীন হইয়া সকলের প্রার্থিত ও পূজিত, আর কোনো কোনো শ্রেণীর লোকেরা অকুলীন বলিয়া যোগ্যতা সত্ত্বেও উপেক্ষিত। উত্তর-পশ্চিমের সরযূপারী ব্রাহ্মণদের যাঁহারা কুলীন তাঁহারা পংক্তিপাবন বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা প্রায়ই গোরখপুর জেলার অধিবাসী। বাঙালী কুলীনের মত তাঁহাদের সম্মানই তাঁহাদের সাধনা ও যোগ্যতার বাধা হইয়াছে। অনেক স্থলে অন্য অকুলীন সরযূপারীরা সেইসব কুলীনদের অপেক্ষা সদাচার ও সুনীতিসম্পন্ন।

উত্তর-পশ্চিমে বহু ব্রাহ্মণকে কন্যা কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। গোরখপুর প্রভৃতি জেলা হইতে তাঁহারা কন্যা কিনিয়া আনিতে বাধ্য হন। সেইসব কন্যাদের মধ্যে কখনও কখনও অব্রাহ্মণকন্যা, কখনো বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্তাও কেহ কেহ থাকেন। বিবাহের অনেকদিন পরে হয়তো দূরদেশাগত কন্যার এইসব দোষ ধরা পড়ে। তখন সমাজের হিতের নামে শত্রুরা চাপিয়া ধরেন, আর মিত্রেরা দেখাইয়া দেন শত্রুদেরও ঘরে ঘরে এইরূপ দোষ। তারপর কিছুকাল হৈচৈর পর ঘটনাটা চাপা পড়িয়া যায়।

পাঞ্জাবে রাজপুতানায় সর্বত্রই এই দুর্গতি নানা আকারে বিদ্যমান আছে। পাঞ্জাবে তো রীতিমত কন্যা সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় আছে। এইসব দোষ বাহির হইয়া পড়িলেও কেহ কাহাকেও চাপিয়া ধরিতে সাহস করেন না, কারণ কোন্ কুলে এইসব দোষ না আছে?

এইসব আলোচনা করিতে গিয়া গরুড় পুরাণের এই বচনটি মনে হয়—

> নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ।
> মূলান্বেষো ন কর্তব্যো মূলাদ্দোষেণ হীয়তে॥ —পূর্বখণ্ড, ১১৫, ৫৭

নদীর অগ্নিহোত্রের ভারতের ও কুলের গোড়ার কথা খোঁচাইয়া বাহির করার চেষ্টা করিবে না। তাহা করিতে গেলে এমনসব দোষ বাহির হইয়া পড়িবে যে নিজেই শেষে আপশোষ করিয়া মরিবে।

এই সঙ্গে সঙ্গে নৈষধের একটি বিখ্যাত শ্লোকার্ধ মনে হয়। চার্বাকের মুখ দিয়া বলাইলেও তাহার মধ্যে যুক্তিযুক্ততা আছে। তাই টীকাকার শ্রীনারায়ণ নানা শাস্ত্র হইতে সেই কথাটির সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছেন।

তদনন্তকুলদোষাদদোষা জাতিরস্তি কা। — উত্তর নৈষধ, ১৭, ৪০

অনন্তপরম্পরার মধ্য দিয়া কুল ও জাতি চলিয়াছে। তাই জাতি এবং কুলে কত দোষই থাকিতে পারে। জাতিগত নির্দোষতা আশা করাই অন্যায়, কারণ দোষহীন জাতি আছে কোথায়?

এইখানে নৈষধীয় প্রকাশ-টীকাকার শ্রীনারায়ণের টীকাতে যাহা উদ্‌ধৃত এবং যে মত সমর্থিত হইয়াছে তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া যাউক। নারায়ণ এই জন্য একটি প্রাচীন বচন উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, "সংযত স্বজনগণের সঙ্গেও এক পংক্তিতে খাইতে নাই, কারণ কে জানে কাহার মধ্যে কি পাতক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে?"

অপ্যেকপংক্ত্যাং নাশ্নীয়াৎ সংযতৈঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং ভবেৎ॥

কিন্তু ইহাতেই কি ল্যাঠা চুকিল? দোষভয়ে না হয় অন্যের সঙ্গ ত্যাগ করা গেল কিন্তু নিজ নিজ জন্ম ও কুলগত যে সব প্রচ্ছন্ন পাপ রহিয়াছে তাহা ঘুচাইবার উপায় কি? কত কত যুগ হইতে এই সংসারের অনাদি কুলপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সেই কুলের বিশুদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি নারীকে হওয়া চাই কামমোহাদির অতীত। অথচ কামতৃষ্ণা দুর্বার, কুলবিশুদ্ধি কামিনীদেরই ইচ্ছাধীন, এমন অবস্থায় জাতিপরিকল্পনার কোনো অর্থই হয় না।

অনাদাবিহ সংসারে দুর্বারে মকরধ্বজে।
কুলে চ কামিনীমূলে কা জাতিপরিকল্পনা॥

—উত্তর নৈষধ, ১৭, ৪০, টীকায় উদ্‌ধৃত

২২
জাতিভেদের পরিণাম

মানুষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ সর্বত্রই আছে কিন্তু আমাদের দেশের ঠিক এই ভাবের জাতিবিভাগ তো ভারতের বাহিরে কোথাও নাই। যদিও সকল দেশেই মানুষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ ঘটিবার মত মনোবৃত্তি আছে, তবু সেইসব দেশে যে অনৈক্য তাহার মধ্যে ঐক্যবিধায়ক এক মহা বস্তু আছে, তাহার নাম ধর্ম। আমাদের দেশে এই ভেদের মূলই ধর্ম, হয়তো সহজবুদ্ধি এই ভেদকে অনেক সময় স্বীকার না-ও করিতে পারে। কিন্তু ধর্মের মধ্যেই এই ভেদের মূল থাকায় ইহার কিছু প্রতিকার করাই এই দেশে অসম্ভব।

দেহের মধ্যে স্বাস্থ্য অর্থ সামঞ্জস্য। ব্যাধিতে অনেক সময় সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের পাকযন্ত্র, রক্তপ্রবাহ, শ্বাসচলাচল, স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি ক্রমাগতই এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আনয়ন করে। যদি কথনও সামঞ্জস্য নষ্ট হয় তখন আমাদের পাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতির দ্বারা এই দোষ বিদূরিত হয়। কিন্তু যদি চিকিৎসক দেখেন সন্নিপাতে সামঞ্জস্যবিধায়ক সেইসব যন্ত্রই বিকল বা বিকৃত, তিনি তখন হন হতাশ। তাই ধর্মই যখন এইরূপ সামাজিক বৈষম্যের মূল বলিয়া আমরা মনে করি তখন আর ইহার প্রতিকার কোথায়?

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে জাতিভেদ থাকাতে এই দেশের পক্ষে ফলাফল কি হইয়াছে?

জাতিভেদপ্রথা সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পূর্বে অতীত কালে ভারতে যে সব বাহিরের লোক আসিতেন তাঁহারা ভারতীয় সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্পাদিত বেসনগরে প্রাপ্ত শিলালেখে দেখা যায় তক্ষশিলাবাসী দিয়সের পুত্র গ্রীক হেলিয়োডোর পরম বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণু-মন্দিরের গরুড়ধ্বজ করাইয়া দিতেছেন। কনিষ্ক হুবিষ্ক প্রভৃতি শক্তিশালী বিদেশী রাজার দল ভারতীয় সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। কাডভাইসস্ হইয়া গেলেন পরম শৈব বা "মাহেশ্বর"। রাজতরঙ্গিণীতে আছে তুরষ্কবংশীয় এইসব পুণ্যশীল রাজারা শুষ্কল প্রভৃতি দেশে মঠ চৈত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন (১, ১৭০)। নহপানের জামাতা উষবদাত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগে একজন বড় ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। শ্রীনগরে রাজা মিহিরকুল মিহিরেশ্বর নামে শিব স্থাপন করেন (রাজতরঙ্গিণী, ১, ৩০৬)। এমন করিয়া যুগে যুগে ভারতে আগত ও সমাজে গৃহীত শক, হূণ, যবচী, কাঠী,

মীনা প্রভৃতি বীরের দল এই ভারতীয় সমাজের শক্তি সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। যে রাজপুত বীর্যের জন্য আমরা এত গর্বিত তাঁহারা এক সময়ে বাহির হইতেই এই সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই সেদিনও দলকে-দল জয়ন্তিয়া মণিপুরী ও কাছারীগণ হিন্দুসমাজের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছেন। এখনও কোনো কোনো প্রত্যন্ত দেশে এই কাজ ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তবে আগেকার যুগের মত প্রবল শক্তি আর তাহার নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে আসামে কাছাড়ীরা প্রথমে কোচ হইয়া পরে রাজবংশী ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তবু এই প্রণালীতে পূর্বেকার দিনের মত সেই বেগ আর সমাজের নাই। এক সময়ে নাথ যোগীদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত ছিল, ক্রমে তাহারা ধীরে ধীরে নাথধর্ম ছাড়িয়া হিন্দুসমাজের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্বে তাহারা বর্ণাশ্রম মানিত না, এখন তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের ব্রাহ্মণ হইয়াছে। আগে তাহারা মৃতদেহ দাহ করিত না, কবর দিত। এখন তাহারা মৃতদেহ দাহ করে। তাহারা এখন অনেকেই বৈষ্ণব এবং কেহ কেহ অতিশয় গোঁড়া বৈষ্ণব। গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, পূজা, অর্চনা প্রভৃতি সবই ক্রমে ক্রমে তাহাদের পাইয়া বসিতেছে যদিও এখনও তাহাদের নিজস্ব পরিচায়ক লক্ষণও কিছু কিছু আছে, তবু তাহা ক্রমেই ক্ষয় পাইতেছে। হিন্দুসমাজই তো ক্রমে এই নাথদেরও আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু তবু এই আত্মীয়করণের প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুসমাজে আগেকার কালের প্রবল শক্তি আর নাই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নানা উপায়ে সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় এইসব সামান্য দুই একটু পথ কিছুই নহে। বরং আমরা সামান্য সব কারণে বহু লোককে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই সমাজ হইতে নির্বাসন দিয়া সামাজিক আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিয়া আসিয়াছি।

ত্রিপুরা জেলার মাহীমাল বা মাইফরোশ মুসলমানেরা আগে হিন্দু কৈবর্ত ছিল, বিনাদোষে সমাজ হইতে জোর করিয়া তাহাদিগকে তাড়ান হয়। ত্রিপুরা জেলায় মাইফরোশদের ইতিহাস যাহা শুনিয়াছি তাহা এই। একটি মুসলমান গ্রাম কলেরাতে উৎসন্ন হইয়া গেলে একটিমাত্র ছয় মাসের শিশু রক্ষা পায়। পার্শ্ববর্তী কৈবর্তগ্রামের একটি মাতা তাহাকে দয়াবশত পালন করায় পরে তর্ক উপস্থিত হয় ঐ কৈবর্তদের জাতি আছে কিনা। হিন্দুসমাজের পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন ঐ কৈবর্তেরা গ্রামকে-গ্রাম ধর্মচ্যুত হইয়াছে। তাই এক সঙ্গে ৮০০ ঘর কৈবর্ত বহিষ্কৃত হয়। বহুদিন তাহারা এই সমাজের দিকে চাহিয়া ছিল কিন্তু সমাজপতিদের হৃদয় তাহাতে টলে নাই। তাই জোর করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

অনেক আপন জনকে আমরা জোর করিয়া পর করিয়া দিয়াছি। মালকানা রাজপুতেরা ভারতবর্ষের জন্যই ঘোরতরভাবে লড়িতেছিল। তাহাদের প্রাণ থাকিতে

তাহারা বিদেশীকে দেশে আধিপত্য করিতে দিবে না। কে মিথ্যা রটাইয়া দিল তাহাদের কূপে নাকি গোপনে শত্রুপক্ষ গোমাংস ফেলিয়া দিয়াছিল। সমাজ বিনা কোনো অপরাধে মালকানা রাজপুতদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। বহু যুগ তাহারা তবু ঘরের মায়া ছাড়িতে পারে নাই। এখনও তাহাদের অনেক আচার হিন্দু ক্ষত্রিয়দেরই মত—তবু তাহাদিগকে বিনা দোষে নির্বাসন না দিয়া আমরা ছাড়ি নাই, এখন তাহারা মালকানা মুসলমান। কাশীর কাছে যোগীদের গান করিয়া বেড়ায় সব "ভর্থরি" বা ভর্তৃহরির দল। এমন করিয়াই তাহাদেরও আমরা তাড়াইয়াছি। তবু তাহারা এখনও গেরুয়া বস্ত্রে ভূষিত হইয়া যোগীর গান গাহিয়া ফেরে, তাহাদের না হইলে সে দেশে কোনো হিন্দুর বাড়িতেই শুভ অনুষ্ঠান সুসম্পূর্ণ হয় না—তবু তাহারা আজ নামতঃ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য। অথচ মুসলমানত্ব কিছুই তাহাদের মধ্যে নাই। পটুয়া ও চিত্রকরেরা নামে আচারে ব্যবহারে পুরা হিন্দু, দেবদেবীর পট ও চিত্র করাই তাহাদের ব্যবসা, তবু তাহাদের আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়াছি। এমন করিয়াই দক্ষিণের মাপিল্লারা মুসলমান হইয়া যায়।

এইরূপ হিন্দুসমাজ হইতে জোর করিয়া নির্বাসিত অর্ধ হিন্দু-মুসলমান বহু জাতি এখনও ভারতের নানা স্থানে আছে। মৌল-ইস্লামদের এক সময়ে অন্যায়ভাবে রাজপুত সমাজ হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে। এখনও তাহারা কাজী মৌলবীকে ডাকে বটে কিন্তু পুরাতন গুরুপুরোহিতও তাহারা ছাড়ে নাই। তাহারা পূর্বপ্রথামত বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ভাট চারণাদি ডাকা বজায় রাখিয়াছে। বহু আচার আচরণ তাহাদের এখনও হিন্দু।[১] মাদ্রাজের দুদেকুলরা এইরূপ না-হিন্দু-না-মুসলমান জাতি, গুজরাতে ও সিন্ধুদেশে এইরূপ বহু শ্রেণী আছে। মতিয়া, মেমনা, শেখ, মৌল ইসলাম, সংঘরদের অকারণেই মুসলমান বলিয়া লেখান হইয়াছে। সিন্ধুদেশের সংযোগীরা তো কিছুতেই নিজেদের মুসলমান বলিয়া সেন্সাসে লেখাইল না। তখন অগত্যা তাহাদিগকে "অন্যান্য জাতি" বলিয়া লেখা হইল।[২] এই ভাবেই রাজপুত "মেও"রা ঘরের ছেলে হইয়াও পর হইয়া গেল।[৩] মীরাশীদেরও এই রকম অবস্থা।[৪] তাহারা দেবীর ভক্ত ও

১ *Census Report, 1931*, Vol. XIX, Baroda, Pt. I, p. 432

২ *Census Report, 1921*, Vol. I, Pt. 1, pp. 115-116

৩ *Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W. F. Province*, Vol. III, p. 82

৪ *Ibid.*, pp. 105-119

দেবীর গান গায়,[১] তাহাদের বহু গোত্রও আছে। লবানাদের বিষয়ে খোঁজ করিলেও দেখা যাইবে এই একই কথা।[২] সখী সরবরের উপাসকেরাও না হিন্দু না মুসলমান।[৩] সাম্‌সী সম্প্রদায় পীর শাম্‌স তাব্রেজের অনুরাগী। তাহারা হিন্দু ছিল, গীতা মানিত, মুসলমান গুরুদেরও ভক্তি করিত। মুসলমান গুরুরা পূর্বে কিছু বলেন নাই, পরে বলেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা গোপনে মুসলমান ধর্ম মানিতেন"; তাই হিন্দুরা তাহাদের সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিল।[৪]

রসুলসাহীরা একদিকে হিন্দু যোগী ও তান্ত্রিক, অন্যদিকে মুসলমান। ইহাদিগকে ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায় তাহা বলা কঠিন।[৫] গঞ্জামে উড়িষ্যা হইতে আগত আরুবা জাতি আচারে ব্যবহারে হিন্দু, কিন্তু বিবাহের সময় মোল্লা ডাকে। তাহারা জানে মুসলমান শাস্ত্রই অথর্ব বেদ। যেহেতু তাহাদের ক্রিয়া অথর্ববেদ মতে করা চাই তাই মোল্লাদের ডাকা দরকার।[৬] দুদেকুলদের কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে, তাহারা বিবাহে হিন্দু অনুষ্ঠান করে, দেবমন্দিরে পূজা-অর্চনাও বাদ দেয় না।[৭] তৈলঙ্গদেশে কাটিকেরাও এইরূপে জোর করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত।[৮] মারাকায়্যারেরা পূর্বে হিন্দুই ছিল, এখনও বিবাহে হিন্দু আচার ইহারা ত্যাগ করে নাই।[৯] মোপ্‌লারা এখনও দেবীমন্দিরে পূজা-অর্চনা করে, তিয়ারাও মোপ্‌লা মসজিদে মানত করে।[১০] অনেক স্থলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে একই দেবমন্দিরে পূজা করে ও মানত মানে। দক্ষিণে কোনো কোনো মুসলমানশ্রেণী মহাদেব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়।[১১] মুক্কুবরা সমুদ্রের কৈবর্ত। তাহাদের মধ্যে কখনও মুসলমান সংস্রব ঘটিলে সন্তানকে মুসলমানেরই হাতে দেওয়া হয়। সেই শ্রেণীর নাম পুটিয়া অর্থাৎ নূতন ইসলাম।[১২] উত্তর-পশ্চিমের ভাটদের নাকি জোর করিয়া একবার মুসলমান করা হয়, তাহারা এখনও অনেক হিন্দু

১ *Ibid.*, p. 115
২ *Ibid.*, p. 1
৩ *Ibid.*, pp. 235, 436
৪ *Ibid.*, pp. 402-403
৫ *Ibid.*, p. 324
৬ Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, Vol. I, p. 59
৭ *Ibid.*, II, p. 195
৮ *Ibid.*, III, p. 259
৯ *Ibid* , V, p. 5
১০ *Ibid.*, VII, p. 105
১১ *Ibid.*, IV, p. 326
১২ *Ibid.*, V, p. 111

আচার পালন করে। বিবাহে আগে তাহারা ডাকে পুরোহিতকে, তাহাতে কন্যাদান ও প্রদক্ষিণাদি করাইয়া তখন তাহারা কাজীকে ডাকে।[১] বোহরা মুসলমানরাও নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের কোনো কোনো বংশ পালিওয়াল গৌড়ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত। রাজপুত বোরাও আছেন।[২] ডফালীরা কতক মুসলমান আবার কতক হিন্দু আচার পালন করে। তাহারা গঙ্গা ও দেবীপূজা ও পর্বাদি পালন করে।[৩] ঘোসীদের পূর্বপুরুষ মুসলমান প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন, তাঁহারা এখনও বহু হিন্দু আচার ও সংস্কার মানিয়া থাকেন।[৪] হুসেনী ব্রাহ্মণরা না-ব্রাহ্মণ না-মুসলমান[৫]—ঐরকম সব আধা হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীরই গুরুপুরোহিতের কাজ তাঁহারা করেন। রাঁকীরা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইলেও ভবানী প্রভৃতি দেবীর পূজক।[৬] কিংগরিয়াদেরও ঠিক একই কথা।[৭] আগাখানী ও লালখানীরাও নবমুস্লিমের দলে। তাহাদের এখনও বহু হিন্দু সংস্কার ও আচার রহিয়া গিয়াছে।[৮] এই রকম আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান মণ্ডলী বহু আছে। হিন্দুরা তাহাদের স্বীকার করেন না, মুসলমানসমাজে তাহারা আদৃত। ইহাতে সমাজের ক্রমেই শক্তিক্ষয় হয়। শুধু ডোম্বরা-দাসরীদের দলে মুসলমানও গৃহীত হইয়াছে এইরূপ জানা যায়।[৯] তবে ইহারা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর দুই-একজন মাত্র।

এইখানে আধা হিন্দু আধা মুসলমান একটি নূতন দলের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইঁহারা আলিগড়ের সার সৈয়দ অহমদ খাঁয়ের অন্তরঙ্গ। ইঁহারা উদার দার্শনিক মুসলমান ধর্ম মাত্র মানেন, সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত সহজ সত্যকে স্বীকার করেন। প্রকৃতি বা নেচার (Nature)কে অনুসরণ করেন বলিয়া ইঁহাদের বলে "নেচরী"। এই দলে হিন্দুও অনেক আছেন।[১০]

যেখানে এইরূপ হিন্দু মুসলমানের মাঝামাঝি সব জাতি দেখা যায় সেখানে

১ Crooke, *Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh*, Vol II, p, 25

২ *Ibid.*, p. 140

৩ *Ibid*, p. 241

৪ *Ibid.*, p. 420

৫ *Ibid.*, p. 499

৬ *Ibid.*, III, p. 7

৭ *Ibid.*, p. 282

৮ *Ibid.*, p. 363

৯ Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, Vol. II, p. 192

১০ *Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W. F. Province*, Vol. III, p. 166.

তাহাদের অবস্থা অনুসারে কতক এদিকে কতক ওদিকে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমাদের সমাজ হইতে বাহির হওয়ার পথই আছে, ভিতরে আসিবার পথ রুদ্ধ। ঘরের লোকও একবার বাহিরে গেলে আর আপনার ঘরেও ফিরিবার উপায় নাই। অভিমন্যু ভিতরে যাইতে জানিতেন, বাহিরে যাইবার উপায় জানিতেন না। আমরা বাহিরে যাইতে জানি, ভিতরে আসিতে জানি না।

ভিতরে আসিবার প্রধান বাধাই জাতিভেদ। যে জাতি হইতে কেহ বাহিরে যায় সে জাতি আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য আর তাহাকে নিজের দলে স্থান দিতে চায় না। আর যাহারা বাহিরে গিয়া ঠিক জাতপাত যথাযথরূপে রাখে নাই তাহাদের কোন্ জাতির মধ্যে স্থান দেওয়া যায়? বাহিরে গেলে তো আর সর্বভাবে বর্ণাশ্রম বজায় রাখা যায় না, কিন্তু ফিরিতে হইলে তখন তাহাকে বসাইবার কোঠা পাওয়া যায় না। এই দুর্গতির জন্য আমরা ক্রমাগতই স্বজনকে হারাইয়াছি এবং সেইসব স্বজনই পরজন হইয়া যাইতেছে। আপন যদি একবার পর হয় তবে সে একান্ত নির্মমভাবেই আঘাত করিতে পারে। কর্ণ অর্জুন জানিত না যে তাহার পরস্পরের সহোদর, তাই তাহাদের আঘাত হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক।

আবার, একেবারে বাহির হইতে পরকে ঘরে নিতে হইলে তাহাকে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়? তাই বাহির হইতে আমাদের আনিবার প্রথাই নাই। জাতিভেদই ইহার হেতু। ভগিনী নিবেদিতা, এনি বেসান্ত প্রভৃতির মত বন্ধুকেও ঘরে স্থান দিবার উপায় নাই।

আবার হিন্দুদের মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের কোনো নাম ধাম সংজ্ঞা উৎপত্তি কিছুই কোনো শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। শুদ্ধ বর্ণ, সঙ্কর বর্ণ, অতিসঙ্কর বর্ণ, প্রকীর্ণ সঙ্কর বর্ণ প্রভৃতি নানা সংজ্ঞার দ্বারা বহু বহু জাতির একটা ঠিক ঠিকানা স্মৃতিতে পুরাণে করা হইয়াছে। জোলা-কুলিন্দ-লেট-তীবর আদি বহু জাতির এইরূপ সব উৎপত্তি বাহির করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যখন Census নেওয়া বা বর্গীকরণের প্রয়োজন হয় তখন দেখা যায় এমনসব বহু জাতি আছে যাহাদের কথা কোনো শাস্ত্রে নাই, কোনো শাস্ত্রকার তাহাদের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। এইসব জাতির লোকেরা যদি জাগ্রত হইয়া নিজেদের দাবি খোঁজে এবং তাহা না পায় তবে তাহারা কি মনে করে? আইন আদালতেই বা তাহাদের ব্যবস্থা কি ভাবে সমাধান করা যায়? আর এইসব শ্রেণীর লোকদের যদি বাহির হইতে ভাগাইবার চেষ্টা বা মোট হিন্দুশ্রেণীর বিরুদ্ধে নানাভাবে লাগাইবার প্রয়াস করা হয় তবে তাহাতে আমরা কী বলিতেই বা পারি?

পূর্বে যখন জাতিভেদের এত কড়াকড়ি ছিল না তখন ভারতবর্ষ দেশে দেশে গিয়া নূতন নূতন উপনিবেশ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি তখন ব্রহ্মদেশ শ্যাম, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেইসব দিক হইতে ভারতে কখনো কোনো আঘাতও আসে নাই। ভারতে যখন জাতিভেদ স্পর্শাস্পর্শ বিচার প্রভৃতি প্রবল হইল তখনই এইসব বিদেশযাত্রা পরিত্যক্ত হইল। তাই পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা গেল, সকলের সঙ্গে পরিচয় লুপ্ত হইল। তখন পশ্চিম দেশ হইতে তাহার জন্য আঘাতের পর আঘাতে আসিতে লাগিল। পূর্বে মধ্য এশিয়াতে কুচার প্রভৃতি স্থানে ভারতের সংস্কৃতির একটি মহাকেন্দ্র ছিল। সেখান হইতেই কুমারজীব প্রভৃতি মহাপুরুষেরা চীনদেশে গিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচার করেন। ভারতের এই প্রাণশক্তির বিকাশ এখন অসম্ভব।

যে ব্যক্তিকে অন্ধকূপে (solitary cellএ) আবদ্ধ করা হয়, যে ঘরের বাহির হইতে পারে না তাহার স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য, সবই ক্রমে ক্রমে যায়। ভারতও বাহিরের জগতে যাইতে না পারিয়া তাহার সব কিছুই হারাইয়াছে। পূর্বে হয়তো বাহিরের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই গণ্ডী টানা হইয়াছিল। কিন্তু এখন এই গণ্ডীই তাহার মৃত্যুর হেতু হইয়াছে। আজ এইসব কারণেই সে দিন দিন শক্তিহীন হইয়া চলিয়াছে। বাহিরের যে সংস্পর্শ এড়াইতে গিয়া এত কড়াকড়ি তাহা আজ ঘরেই আসিয়া বসিয়াছে, কাজেই ব্যর্থ গণ্ডীর দ্বারা ফল হইল কি ?

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণকে যে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছিল একদিন তাহার সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় ও জ্ঞান ধ্যান কর্মের পবিত্র তপস্যায় ব্রাহ্মণ তাহা সার্থক করিয়া সমাজকেও পবিত্র করিয়াছিল। কিন্তু যে শ্রদ্ধা সহজে মেলে তাহা লইয়া কয়জন মহাপুরুষ স্বীয় নিষ্ঠা ও তপস্যাতে অটল থাকিতে পারে ? কাজেই তাহার ফলে ক্রমে যে তামসিকতা পরবর্তী কালে আসে তাহাতেই পতন ঘটে। ব্রাহ্মণের এই পতনে সমস্ত দেশকে দুর্গতির দিকে টানিয়া নামাইয়াছে।

পদ্মপুরাণ বলেন, "আপৎকালেও যেন ব্রাহ্মণ চাকরি না করেন (পাতালখণ্ড, ৪ অ, ১৬০), রাজসেবা না করেন (ঐ, ১৬৮)। অথচ আজ তাঁহারা চাকরি রাজসেবা ও নানা হীনবৃত্তির দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই সমাজের উপর তাঁহাদের সেই প্রভাব আর নাই। অবশ্য দায়ে পড়িয়াই তাঁহারা এইসব পথে গিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে যে কল্যাণ তাঁহারা পূর্বকালে সমাজের জন্য করিতে পারিতেন, এখন আর তাহা সম্ভব নহে। যে সমাজে তপস্যারত নেতার অভাব ঘটে সে সমাজ দিনে দিনে নষ্ট হয়।

পূর্বে জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদের জন্য অন্নোপার্জনের ক্ষেত্রে অন্যায় প্রতিযোগিতা থাকিত না। কিন্তু সেই রাজা নাই। কাজেই সেই সমাজব্যবস্থাও নাই। এখন সেই বৃত্তিভেদ বজায় থাকে কেমন করিয়া?

যে সব দেশে জাতিভেদ নাই সেখানে দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে সবাই দেশের জন্য যুদ্ধ করে। এই দেশে যুদ্ধ করা একটিমাত্র শ্রেণীর কাজ। ক্ষত্রিয়েরা নষ্ট বা অসমর্থ হইলে বাকি সকলে অসহায়ভাবে বিপন্ন হয়। ইহাতে সুবিধা হয় আক্রমণকারীদের। এই দেশে মাঝে মাঝে অক্ষত্রিয়েরা বাধা যে দেন নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। স্থলবিশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই উপায়েই ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত দেশরক্ষার কাজে নূতন শক্তি ও বীর্য যোগাইয়াছেন। তবু মোটের উপর জাতিভেদের দ্বারা দেশরক্ষার কাজে ক্ষতিই হইয়াছে।

এই জাতিভেদের জন্য একটা বড় নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘ'টে। বর্মা আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বহু ভারতীয় বাস করেন ও সেই দেশের কন্যাদের বিবাহ করেন। তাঁহারা জাতির ভয়ে নিজ স্ত্রীকে দেশে আনিতে পারেন না। আপন সন্তানদেরও নিজ ধর্মে রাখিতে পারেন না। বাধ্য হইয়া নিজেরাই জোর করিয়া তাহাদিগকে খ্রীস্টান কি মুসলমান করাইয়া দেন। ইহা কি কম দুঃখের কথা? কোনো সময়ে এইসব সন্তান অনায়াসে হিন্দুই হইত, এখন জাতিভেদের কড়াকড়িতে তাহা অসম্ভব। এইভাবে কেবল ক্ষয়ই চলিয়াছে। এইরূপ সামাজিক ক্ষয় দেখিয়াই প্রাচীনকালে সিন্ধুদেশীয় দেবল-স্মৃতির মধ্যে দেখা যায় অন্যধর্মীয় দ্বারা লাঞ্ছিত নারীকে সমাজে নেওয়ার ব্যবস্থা (দেবলস্মৃতি ৪৪-৪৬; অত্রিসংহিতা, ১৯৭-২০১)। অন্যায়ভাবে ধর্ষিতা নারীকে ত্যাগ করা সমাজের অন্যায় (অত্রিস্মৃতি, ৫, ২-৩)। যাহারা তাহার প্রতি অত্যাচার করে ও যাহারা তাহাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, আসলে তাহারাই নিন্দনীয়।

এইমাত্র বলা হইয়াছে বাহির হইতে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীকেও আমরা আপন করিতে পারি না। সিস্টার নিবেদিতার মত নারী, কি ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির মত পুরুষকে আমরা সন্ন্যাসী বানাইয়া তবে লইতে পারি, গৃহস্থভাবে কখনই পারি না। গৃহস্থ হইলে ইঁহাদের কি জাতি হইত? যদি তাঁহাদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় করা যায় তবে কোন্ মুখে ঘরের মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলকে তাঁতি করিয়া মহেন্দ্র সরকারকে চাষা করিয়া রাখি? আবার বাহিরের যোগ্য লোককে ব্রাহ্মণ করিব এবং আচার্য জায়সরাল আচার্য মেঘনাদ সাহা ঘরের ছেলে বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না এই কি যোগ্য বিচার? মহাত্মা গান্ধী সকলের পূজ্য কিন্তু গৃহস্থ গান্ধীকে চিরদিনই গন্ধবণিক থাকিতে

হইবে, যদিও তিনি তাঁহার পুত্র দেবদাসের সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজগোপালাচার্যের কন্যা বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যোগী অরবিন্দ যতই পূজ্য হউন গৃহস্থ হিসাবে তাঁহারা অব্রাহ্মণ। যতই যোগ্য হউন রাজা রাজেন্দ্রলালও কিছুতেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুবিধার। তবু বাংলাদেশে সকলপ্রকার বাণিজ্যগত উদ্যোগ এই প্রথার চাপেই সমূলে নষ্ট হইয়াছে। জমীদারের ছেলে জমীদার, বিনা কষ্টেই ঐশ্বর্যের মালিক, কোনো উদ্যোগ করিতে হয় না, তাই বাংলাদেশের ধনীশ্রেণী হইয়া পড়িল উদ্যোগহীন। আর দরিদ্রেরা উদ্যোগী হইলেই বা কি করিবে, মূলধন কই? তাই বাংলায় কোনো কল কারখানা বাণিজ্য নাই। এখানে বাণিজ্য করে ইংরাজ, আমেরিকান, মারবাড়ী, গুজরাটী, খোজা, সিন্ধী, চেট্টী প্রভৃতি বণিকের দল, আমরা করি চাকরি। স্বদেশী আন্দোলন করি আমরা, কলকারখানা খোলে বোম্বাইর ও মধ্যভারতের লোক। চিনি খাই আমরা, কারখানা হয় বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে। খনিসম্পদ আমাদেরই দেশে, তাহা লইয়া কাজ করে অবাঙ্গালী। জমীদারের ছেলে জমীদার, আর সে উদ্যোগ করিবে কেন? পূর্বে বাংলায় জমীদাররাও ভালো ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন, দৃষ্টান্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি। কিন্তু এখন বাংলায় সব উদ্যোগ নিবিয়া গিয়াছে। জমীদারদের উদ্যোগের প্রয়োজন নাই, গরীবদের উদ্যোগের সামর্থ্য নাই। বাংলা খেয়াঘাটের মালিকও অবাঙ্গালী বিহারী রাজা ছত্রপতি সিং।

এই বিপদটিই ঘটে জাতিভেদের দ্বারা সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, তাহার আর বিদ্যা সাধ্যির সাধনার দরকার কি? সে যে নীচবৃত্তিই করুক, সকলের সে পূজ্য হইবেই। আর যে নীচস্তরে পড়িয়া আছে, সে সাধনা করিলেই বা লাভ কি? তাহার তো আর উঠিবার কোনো পথ নাই? এইভাবে যে ভারত মানবসাধনার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্যোগ হারাইয়াছে, সেই ক্ষতির আর তুলনা নাই।

কেহ কেহ বলিবেন, আজও তো ভারতে ব্রাহ্মণই জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ পূর্বকালীন সাধনা ও মনুষ্যত্ব সহজে মরে না। তবু অন্যান্য দেশের জ্ঞানীদের তুলনায় তাঁহাদের স্থান কোথায়? আর নিম্ন হইতেও যে কিছু কিছু মানুষ ওঠে তাহারও সেই হেতু। ভগবানের দেওয়া মনুষ্যত্বকে কে আর কত কাল সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিতে পারে? তবু ভারতের উৎসাহ উদ্যম নিভাইয়া দিয়া যে চিত্ত-দারিদ্র্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহার ফলে আজ আমাদের এত দুর্গতি। সেই দুর্গতি ধনে জ্ঞানে শক্তিতে সামর্থ্যে—সর্বত্র। তাহার কথা আর বেশি করিয়া বলিয়া কোনো লাভ নাই।

জাতিভেদে নারীদের সাধনার বাধা

এমনিই তো কলিকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। তার উপর কলিতে নিয়মেরও কড়াকড়ি। তাই এখনকার দিনে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আচারবিচার বজায় রাখিয়া বিদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা অসাধ্য। ভারতে লোক ধরিতেছে না, বেকারের অন্ত নাই, অথচ বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই—ফিজি ট্রিনিডাড প্রভৃতি দেশে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা সেখানে জাতিবর্ণের সকল অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারেন নাই। তাই এখন তাঁহাদের আর ভারতে ফিরিবার উপায় নাই। ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়া সেই দেশীয় কন্যা বিবাহ করেন তাঁহারা দেশে ফিরিতে হইলে স্ত্রী পুত্র কন্যা বিসর্জন দিয়া আসেন। সেই স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পিতার ধর্মে আশ্রয় নাই। কারণ পতির বা পিতার জাতিতে তাঁহাদের স্থান কোথায়?

দেশে বিদেশে জাতি বাঁচাইয়া চলা কঠিন। তাই দেশ-বিদেশের নৌযুদ্ধবিভাগে কি জাহাজচালনায় খালাসী লস্কর ও সারেং প্রভৃতির কাজ আমাদের কাছে রুদ্ধ। বহু বেকার লোকের হয়তো ইহাতে অন্নসংস্থান হইত। এইসব কাজ করিয়া নোয়াখালী চট্টগ্রামবাসী ও দক্ষিণভারতীয় বহু মুসলমান সুখে জীবিকা অর্জন করিতেছেন, এই-সব কাজ তাঁহাদিগেরই একচেটিয়া। পূর্বে চট্টগ্রামের হিন্দু পাটনীরা সমুদ্রযাত্রায় পটু ছিলেন। এখন সেখানে সব নাবিক মুসলমান। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলে কালিকটের জামোরিন আপন হিন্দু নৌজীবী প্রজাদের মুসলমান করিয়া শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করেন।

জাতিভেদপ্রথায় সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইয়াছে নারীর। পূর্বে কন্যাদের বিবাহ হইত যৌবনে। তাই তাঁহাদের যথারীতি শিক্ষা দিবার সময় থাকিত এবং তাঁহারা শিক্ষা পাইতেন। বেদে কন্যাদেরও ব্রহ্মচর্যের কথা দেখা যায়—

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্‌॥ —অথর্ব, ১১, ৭, ১৮

পরাশরমাধবে আচারকাণ্ডে বিবাহপ্রকরণে যমবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান আছে পুরাকালে কুমারীদের মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হইত।[১] কন্যারা তখন

১ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্পাদিত, ২ অধ্যায়, পৃ. ৪৮৫

বেদও অধ্যয়ন করিতেন।[১] সেই গ্রন্থেই হারীতোক্ত বলিয়া উদ্ধৃত বচনে বলা হইয়াছে নারীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। একদল ব্রহ্মবাদিনী, অন্যদল সদ্যোবধূ।[২]

উপনয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া নারীরা রীতিমত জ্ঞানলাভ করিতেন। উত্তরচরিত নাটকে ভবভূতি তাহার একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। ভবভূতির কালকে হয়তো কেহ কেহ প্রমাণ না মনে করিতে পারেন কিন্তু গুরুকুলে ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা নারীরা যে শিক্ষালাভ করিতেন সে কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে মেলে। কুরুক্ষেত্রের নিকট একটি আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা তপঃসিদ্ধি লাভ করেন (মহাভারত, শল্যপর্ব, ৫৪, ৬)। মহাভারতে আর একটি ঋষিকন্যার বিবরণ পাই; তিনি ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া তপস্যায় রত থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়েন, পরে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা প্রয়োজন এই উপদেশ শুনিয়া বৃদ্ধকালে বিবাহ করেন (শল্যপর্ব, ৫২, ২০)।

সুলভা নামে এক মনস্বিনী নারী মুনিব্রতধারিণী হইয়া তপশ্চর্যা করেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩২০, ১৮৩)।

সিদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা শিবা যথারীতি সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে সিদ্ধা হন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১০৯, ১৯)।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন, পতিব্রতা সতী সামবেদোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ৮৩ অধ্যায়, ১৩০)।

স্থানান্তরে বলা হইয়াছে মহর্ষি নারদও হরিভক্তিময় গান শিক্ষা করিতে জাম্ববতী সত্যভামা রুক্মিণী এমন কি রুক্মিণীর সহচরীদের কাছেও শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (লিঙ্গপুরাণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৮৯-১০০)।

বেদ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত নারীরা সত্য সত্যই শূদ্রা হইয়া উঠিলেন। বিনা শিক্ষায় শূদ্রতা দূর হইবে কিসে?

পূর্বে কন্যারা বড় হইয়া নিজে ইচ্ছামত পতিকে নির্বাচন করিতেন। বরণ করা হয় বলিয়া নাম বর। অনেক ক্ষেত্রে কন্যারা নিজে পছন্দ করিয়া গান্ধর্ব মতেই বিবাহ করিতেন। মনুও এইরূপ বিবাহ স্বীকার করিয়াছেন (৩, ২১)। পরাশরমাধবেও গান্ধর্ববিবাহের বৈধত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।[৩] পরাশরমাধবেই দেখা যায় বৌধায়ন

১ চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার সম্পাদিত, ২ অধ্যায়, পৃ. ৪৮৫

২ ঐ

৩ ঐ পৃ. ৪৮৫-৮৯

দেবল প্রভৃতিও গান্ধর্ববিবাহকে স্বীকার করেন। অগ্নিপুরাণেও গান্ধর্ববিবাহের বৈধতার কথা আছে (১৫৪ অধ্যায়)। বেদে, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে গান্ধর্ববিবাহের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

জাতিভেদ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন কন্যা বড় হইয়া কাহাকে বরণ করিবে, বর ঠিকমত জাতিকুলের হইবে কিনা, এইসব উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে জাতিভেদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া পছন্দ-অপছন্দের বালাই জন্মাইবার পূর্বেই বাল্যকালেই কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হইতে লাগিল। বরণের দ্বারা বিবাহের বদলে কন্যাদান গৌরীদান প্রভৃতিই প্রবর্তিত হইল। এইজন্যই স্মৃতিতে অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিবার জন্য এত পীড়াপীড়ি।

কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে ঋতুমতী হয় তবে পাতকের আর অন্ত নাই (শঙ্খ ১৫, ৮; যম, ২২-২৩ ইত্যাদি)। এইরূপ কন্যার নামই বৃষলী বা শূদ্রকন্যা। এইরূপ বৃষলীকে বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ পতিত হয়েন (যম, ২৪-২৮)। এইরূপ বিধান প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়, তাই অধিক দিবার আর প্রয়োজন নাই।

কাজেই নারীরা সর্ববিধ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলেন (মনু ৫, ১৪৭-৪৯; বসিষ্ঠসংহিতা ৫ম অধ্যায়; বৌধায়ন ২, ২, ৫০; মহাভারত অনুশাসনপর্ব ২০, ২০-২১; ২০, ১৪; ৪৬, ১৪ ইত্যাদি)।

গৌরীদান করিতে গিয়া কন্যাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা তুলিয়া দিতে হইল, বিবাহের সময় তাহাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দ করিবার অধিকার লুপ্ত হইল, সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিকে পিতা পতি ও পুত্রের অধীনে রাখিবারই ব্যবস্থা হইল।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ —মনু, ৯, ৩

এই অবিশ্বাসও আবার মানুষকে পতিত করে। যে ক্রমাগত অবিশ্বাস করে এবং যাহাকে ক্রমাগত অবিশ্বাস করিয়া চোখে চোখে রাখা হয়, সেই উভয়েরই তাহাতে ক্ষতি হয়।

নারীদিগের স্বাধীনতা চলিয়া যাওয়ায় ভারতের পক্ষে একটা বৃহৎ ক্ষতি হইল এই যে বাহিরে আসিয়া নারীরা কোনোপ্রকার জীবিকা অর্জনের কাজে সহায়তা করিতে পারিতেন না। জাতীয় সম্পৎ সৃষ্টির কাজে অর্ধেক লোক তাহাতে অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। ঘরে বসিয়া যতটুকু হয় তাহার বেশি আর কিছু করা অসম্ভব হইল। ইহাতে পৃথিবীর সঙ্গে জীবিকাযুদ্ধে আমরা অনেক পরিমাণে শক্তিহীন হইয়া

পড়িলাম। য়ুরোপ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশের নারীদের কর্মশক্তি দেখিলে এইসব কথা বিশেষ করিয়া আমাদের মনে আসে।

নারীরা নিজেরা বর বরণ করিতে গেলে কামমোহাদিবশত ভুলভ্রান্তি ঘটিতে পারে এই ভয়ে নারীদের সর্ববিধ স্বাধীনতা ও অধিকার তো নিষিদ্ধ হইল তবু কি বিপদ সর্বভাবে ঠেকান গেল? পিতামাতা বিবাহ দিলেও মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটিত। কন্যারা যখন নিজেরা পছন্দ করিয়া বিবাহ না করিতে পারে তখন চেষ্টা করিয়া তাহাদের বিবাহ দিতে হয়। ইহাতেই পণপ্রথার উৎপত্তি। মাঝে মাঝে এইসব সত্ত্বেও প্রমাদ ঘটে। পদ্মপুরাণে এইরূপ একটি আখ্যান আছে। এক শ্বপচ, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বিপ্রের কন্যা প্রার্থনা করিল। বিপ্র তাহাকে কন্যা দিবেন এই বাগ্‌দান করিলেন। পরে যখন সব কথা জানাজানি হইল তখন ব্রাহ্মণ পড়িলেন বিপদে। কন্যা দিলে জাতি যায় কন্যা না দিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ঘটে। তখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই যুবা ও বিপ্রকন্যাকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। সেখানে জাতিভেদ নাই। তাই তাঁহারা সেখানে সুখে মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪৯তম অধ্যায়)। হয়তো উভয়ের মধ্যে পূর্বেই প্রীতি হইয়াছিল।

এখনও কন্যা পাত্রস্থ করা এত কঠিন হইয়াছে যে লোকে অনেক সময় ভালো করিয়া খোঁজ না করিয়াই কন্যাদান করেন। কোনো একটি পাত্রের খবর পাইলে আর ধীরভাবে সন্ধান করিবার তর সহে না। তাই ভারতের নানাস্থানে এক একজন দুষ্ট লোক বহু লোককে প্রতারিত করিয়া বহু কন্যার সর্বনাশ করে। বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্বে এইরূপ একজন বিবাহবিশারদের আবির্ভাবের কথা সকলেই সংবাদ-পত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন।

এখন আবার অর্থনীতিগত কারণ বশতঃ কন্যাদের বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেকের বিবাহ হওয়াই কঠিন হইয়াছে। ইহাতে কন্যারা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে বর মনোনয়ন করিতেছে। তাহাতে ভালো-মন্দ দুই হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাতে জাতিকুল বাঁচাইয়া সব সময়ে মনোনয়ন ঘটে না। কাজেই এখন এই দিক দিয়া জাতিভেদ প্রথার একটি প্রচণ্ড বিপদ আসিয়া উপস্থিত। সামাজিকগণের পক্ষে ইহা একটা দুর্ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত।

এখনকার এই সমস্যার আলোচনা না করিয়া পুরাতন কথাতেই মন দেওয়া যাউক। সমাজের মধ্যে জাতির উপর কুল যখন আসিয়া জুটিল তখন বিপদ আরও ঘনাইয়া উঠিল। বাংলাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক একজন অসংখ্য বিবাহ করিতেন,

বংশজ ব্রাহ্মণেরা বিবাহ করিতেই পারিতেন না। এই কথা অন্যত্রও বলা হইয়াছে।

জাতিকুলের দিকে চাহিয়া আত্মসম্মান বাঁচাইতে গিয়া অনেক সময় রাজপুত জাতিরা সূতিকাতেই কন্যাবধ করিত। গুজরাতের পাটীদার অর্থাৎ পাটেলদের মধ্যে কন্যাকে দুধে ডুবাইয়া মারা হইত। তাহার নাম ছিল "দুধপীধী"। কন্যা যে একটা দুর্ভাগ্য। কন্যা জন্মাইলে লোকের দুঃখের আর অন্ত নাই। কন্যার বিবাহে পণের কথা চিন্তা করেন না আমাদের দেশে এমন লোক কয়জন আছেন?

ব্রাহ্মণগ্রন্থে কন্যাকে পিতার হৃদয়দারিকা বলা হইয়াছে। তবু দেখা যায় মহাভারতের যুগেও কন্যাকে রীতিমত প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাই ক্রমশ কন্যা সমাজের পক্ষে ও পরিবারের পক্ষে দুর্বহ ভার হইয়া উঠিতেছে। মহাভারতে দেখা যায় যে কন্যা লোকে দত্তকপুত্রের ন্যায় অপরের নিকট হইতে লইয়া পালন করিতেন। কন্যা দুর্ভাগ্য হইলে তাহা হইত না। যদুশ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা পৃথা। শূর নিজ পিসতুত ভাই কুন্তিভোজকে আপন কন্যা পালন করিবার জন্য দেন। পৃথা কুন্তিভোজের কন্যা হওয়াতে তাঁহার পরে নাম হইল কুন্তী (আদিপর্ব, ১১১, ৩)।

কিন্তু ক্রমেই কন্যারা পিতামাতার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভারতবর্ষে কন্যাবধও সম্ভব হইয়া উঠিল। এই কারণে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্রে কন্যাবধের মহাপাপও স্বীকার করিয়া লইল।

মহাভারতের যুগে নারীদের স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা স্থানান্তরে দেখান হইয়াছে।

নারীরা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সমাজের মধ্যে এমন একটি অন্ধকার স্থান রচিত হইয়াছিল যেখানে মানসিক জগতের সকল রকমের দূষিত রোগবীজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাই আজও দেশে কোনো ভালো কাজ করিতে গেলে, এমন কি নারীদের কল্যাণের জন্য কোনো কাজে হাত দিলেও সর্বাপেক্ষা বাধা পাইতে হয় নারীদের দিক হইতে। মানবের অগ্রগতিকে বাধা দেয় যে সব অন্ধ সংস্কার তাহার প্রধান আশ্রয় তাহাদের চিত্তে। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে জন্মলাভ করায় আমাদের দেশের পুরুষেরও চিত্তবৃত্তি এই দোষে দোষাক্রান্ত হইয়া পড়ে। জীবনের বড় দৃষ্টি, বড় প্রেরণা হইতে তাহাদের চিত্ত বিযুক্ত থাকে।

যেখানে মায়েদের প্রতিষ্ঠা নাই সেখানে মায়েরাও সন্তানের চিত্তে তেমন করিয়া আধিপত্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সমগ্র সমাজের নৈতিক মানদণ্ড হীন হইয়া আসে।

মানুষ যখন একাকী তখন সে শক্তিহীন। সমাজের সহায়তাতেই নানাভাবে মানুষ শক্তিলাভ করে। কিন্তু জাতিভেদের দ্বারা কি ভারতীয় সমাজ কোনোরূপ শক্তিলাভ করিয়াছে? গুজরাতে আমেদাবাদের লেডী বিদ্যাগৌরী রমণভাই এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান করিবার যোগ্য। তিনি বলেন, সমাজসেবার কর্মে জাতিভেদই একটা মস্ত বাধা। কন্যাকে শিক্ষা দিতে গেলে জাতি হইবে তাহার বিরোধী। কন্যাদের বিবাহের বয়স বাড়াইতে গেলে বাধা দিবে জাতি। বিধবাকে বিবাহ দিতে গেলে, কি শিক্ষার্থ বিদেশে যাইতে হইলে, কি তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি মানুষোচিত ব্যবহার করিতে হইলে সর্বত্রই বাধা পাইতে হইবে জাতির কাছে।[১]

১ Ghurye, p. 161

২৪

জাতিভেদে অসংহতি

মানবসমাজে একত্র থাকিতে গেলেই পরস্পরে একটা যোগ ঘটে। এই সামাজিকতা বা সংহতির বোধ মানুষের একটা বড় সম্পদ্‌। গ্রামে দেখা যায় জাতিভেদ ও ধর্মভেদ সত্ত্বেও উচ্চনীচে কি খ্রীস্টান হিন্দু মুসলমানে দাদা-মামা-কাকা প্রভৃতি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যখন জাতিভেদের বিষ তীব্র হইয়া উঠিল তখন পুরাণে দেখি ব্রাহ্মণে শূদ্রে এইরূপ দাদা কি কাকা কি ভাইপো প্রভৃতি সম্ভাষণও নিষিদ্ধ হইল (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৪অ, ৪৮)। রাজনীতিগত হেতুতে এই ভেদবুদ্ধি আবার এখন প্রশ্রয় পাইতেছে।

জাতিতে জাতিতে ভেদবশতঃ সমগ্র সমাজের মধ্যে যে অসংহতি ঘটে তাহাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। এই জাতিভেদের জন্যই আমাদের দেশে একে অন্যকে পর ভাবে। দেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি স্থানে অনেক সময় সীমান্তবাসী দুর্বৃত্তেরা আসিয়া হিন্দুদের গৃহ লুণ্ঠন করে ও কন্যা হরণ করে। দেরা ইসমাইল খাঁ-বাসী আমার একজন বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি, "একবার শেষরাত্রে ব্রাহ্মণদের পাড়ার মধ্যে মহা কোলাহল শোনা গেল। বুঝা গেল কোনো একটি কন্যাকে দুর্বৃত্তেরা হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কন্যাটি একজন দস্যুর কাঁধের উপর হাত-পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে। পাড়ার সকলে লাঠি-সোটা লইয়া তাড়া করিয়া দেখিলেন যখন সেই কন্যাটি বৈশ্যের, তাঁহাদের স্বজাতীয় নহে, তখন তাঁহারা বলিলেন 'ও মেয়েটী দেখিতেছি বানিয়াদের' (য়হ লড়কী বণিয়াকী হৈ), এই বলিয়া সকলে যার যার ঘরে গিয়া শুইলেন। দুর্বৃত্তেরা বিনা বাধায় বণিক্‌কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল!"

জাতিভেদবশতঃ সমাজের মধ্যে অসংহতি ঘটে বলিয়া বিদেশী ও বিধর্মী রাজার পক্ষে এই প্রথা বড়োই সুবিধার। খাদ্য যদি আকারে বড়ো হয় তবে টুকরা টুকরা করিয়া গ্রাসযোগ্য সব খণ্ড বানাইতে হয়। তেমনি বড়ো দেশ ও সমাজ শাসন করিতে গেলে তাহা সুবিধামত নানাভাগে বিচ্ছিন্ন হইলেই গ্রাস করার পক্ষে সুবিধা। এই জাতিভেদ প্রভৃতি বিচ্ছেদকর প্রথার দ্বারা তাঁহাদের প্রভূত উপকার হয়। এই জন্যই প্রাচীনকালে হিন্দু রাজাদের সময় যেরূপ হীনজাতি হইতে উচ্চতর জাতি হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায় মুসলমান রাজাদের সময় তাহা বিরল, এখনকার দিনে তাহা আরও কঠিন।

লোকগণনা প্রভৃতি নানাপ্রথার মধ্যে এইরূপ সচলতার বিরুদ্ধে বহুপ্রকারের বাধা বাড়িয়া চলিয়াছে। কোনো একটি দেশকে পদানত রাখিতে হইলে সেই দেশে যত প্রকারের জাতিগত ও ধর্মগত ভেদকে জাগাইয়া রাখা যায় ততই সুবিধা। বিশেষত যদি কোনো বাহিরের সংহত শক্তির কাছে দেশকে পদানত রাখিতে হয় তবে তাহার পক্ষে জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা একেবারে অপরিহার্য দৈব-আশীর্বাদ-স্বরূপ।

ভারতে মুসলমানধর্মপ্রচার বিষয়ে নবম শতাব্দীতে লেখা জৈমুদ্দীনের তুহফতুল মোজাহদীন গ্রন্থে দেখিতে পাই, "ভারতবর্ষে হীনবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের লোকদের কাছে বসিতে পারে না। তাহারাই যখন মুসলমান হয় তখন সর্বত্র আদরে গৃহীত হয়। ভারতে মুসলমানধর্মপ্রচারের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধার কথা" (ফিরিশ্‌তা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০, নবল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ)। এই সব লেখকদের মতে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতাই মুসলমানধর্মপ্রচারের পক্ষে পরম সহায়। হিন্দু-সমাজের পক্ষেও কি তবে তাহা বাঞ্ছনীয়?

এখনকার কালের সেন্সস রিপোর্টগুলি দেখিলে কতকগুলি কথা মনে না আসিয়া যায় না। মানুষের স্বাভাবিকবৃত্তি হইল স্নেহ ভালোবাসা চিত্তের ঔদার্যবশত ভেদজ্ঞান-গুলি ভুলিয়া যাওয়া। কিন্তু জাতিভেদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ঘন ঘন লয়েন এবং হিন্দুদিগের জাতি প্রভৃতি লেখাইবার জন্য যেরূপ কড়াকড়ি করেন তাহাতে যাহাদের মনের মধ্যে এইসব বিষ বেশি প্রবল নহে তাহারাও এই বিষে জর্জরিত হইয়া উঠে। আদালতে এমন কি রেজেস্ট্রী আপিসে দেখিয়াছি কাহারও পরিচয় দিতে গিয়া যদি জাতি লেখান না হয় তবে তখন সবাই মিলিয়া "জাতি জাতি" বলিয়া অস্থির। এমন একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নামে একবার একটি কবালা রেজেস্ট্রী করিবার সময়ে মুসলমান রেজিস্ট্রার মহাশয় জাতি উল্লেখ না করিলে রেজেস্ট্রী করিতেই সম্মত হইলেন না। অথচ যাঁহার পরিচয় দিতে হইবে তিনি চক্রবর্তী এবং সেখানে সকলের পরিচিত। ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্টে আছে পাঞ্জাবের নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদের বোধটা খুব কম। কিন্তু সেন্সাসের ঘর পূরণ করিতে গিয়া সেই দিনে-দিনে-বিলীয়মান ভেদবুদ্ধিটা আরও প্রবল করিয়া তোলা হয়।[১] শিখেরা জাতিভেদ মানেন না। জাতি তাঁহারা লেখাইতে চান না, তবু সেন্সাস তাহা লেখাইবেই। ইহা লইয়া এত গোলমাল হইল যে অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে হুকুম প্রচার

১ *Census Report, 1921*, Vol. I, Pt. I, p. 223, পাদটীকা

করিতে হইল যে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যদি শিখেরা জাতি না লেখাইতে চাহে তবে যেন কর্মচারীরা বেশি গোলযোগ না করেন।[১]

ইংলণ্ডে নাকি রাজা হইলেন defender of faith অর্থাৎ ধর্মের রক্ষাকর্তা। ভারতেও জাতপাঁত ও সম্প্রদায়ের প্রধান সমর্থক ও রক্ষাকর্তা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট। যাহা যুগের ধর্মের ও কালের প্রভাবে দিনে দিনে বিলীয়মান তাহাকে জিয়াইয়া রাখিবার ভার ইংরাজ-সরকারী ব্যবস্থার। অথচ আমাদের মধ্যে জাতপাঁত ও সম্প্রদায়ের অন্ত নাই এই খোঁটা তাঁহাদের দিক হইতেই নিরন্তর আসে। এইসব ভেদ-বিভেদ জিয়াইয়া রাখিতে তাঁহাদের এত ব্যাকুলতা কেন?

এক এক সময় আবার কর্মচারীরা নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রভাবের বশে গণনার সময় সব লেখা ইচ্ছাপূর্বকই ঠিকভাবে লেখেন না।[২]

১ *Ibid.*, p. 226, para 197

২ *Ibid.*, p. 119, para 96 ; p. 120, para 98, etc.

সামাজিক অবিচার সত্ত্বেও ব্যক্তিমহিমার জয়

যে সমাজে চরিত্র গুণ মনীষা সাধনা ও তপস্যার অপেক্ষা জন্মগত জাতিরই আদর অধিক, সে সমাজ কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। নারদ ব্যাস বিদুরাদি মহাপুরুষের জন্ম তো বহু দোষযুক্ত কিন্তু সাধনার বলে কি উচ্চস্থান তাঁহারা লাভ করিয়াছেন! হীনবংশে জন্ম হইলেই কি হীন হইতে হইবে? অনেক সময় দেখা যায় অতি হীনবংশে যাঁহাদের জন্ম তাঁহাদের চরিত্র ও সাধনার তুলনা হয় না। মহাভারতে এক ধর্মজ্ঞ ব্যাধের সঙ্গে এক দ্বিজের কথা বর্ণিত আছে। সেই ব্যাধের জ্ঞান ও দৃষ্টি দেখিলে, তাঁহার চরিত্র ও সাধনা বিচার করিলে বিস্মিত হইতে হয় (বনপর্ব, ২০৬-১৫)। দশটি অধ্যায়ে এই আখ্যানটি বর্ণিত আছে। শূদ্র পৈজবনের দান ও ঔদার্যের সীমা নাই (শান্তিপর্ব, ৬০ অধ্যায়)। ঐন্দ্রাগ্নিবিধানে তিনি দক্ষিণা দেন। বৈশ্য তুলাধারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ জাজলির সংবাদও চমৎকার (ঐ, ২৬৩ অধ্যায়)। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে তুলাধার ব্যাধ। উপদেশ দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ জাজলির অন্তরের সব সংশয় দূর করেন। এক শূদ্রমুনির তপশ্চর্যার বিবরণ দেখা যায় মহাভারতের অনুশাসনপর্বের দশম অধ্যায়ে। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে হরিভক্তিবিলাসের মতে, রসক্রিয়ার গুণে যেমন কাঁসাও স্বর্ণে পরিণত হয় তেমনি দীক্ষাবিশেষের গুণে মানুষ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

> যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
> তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ —হরিভক্তি বিলাস, ২, ৭

কিন্তু স্মৃতির গ্রন্থ দেখিলে দেখা যায় শূদ্র যদি কখনও ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেন তবে কঠিন দণ্ড। মনু বলেন, দম্ভবশতঃ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেন তবে রাজা তাঁহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন (৮, ২৭২)। মনুর দণ্ডবিধির অষ্টম অধ্যায়ে ২৬৭-৮৩ শ্লোক দর্শনীয়।

ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণীয় লোকেরা এক সময় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত সংসক্তই ছিলেন। পরে তাঁহারা পৌরোহিত্য ও যজনেতৃত্ব প্রভৃতি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজকার্য লইয়াই থাকিতে বাধ্য হন। তবু তাঁহাদের মধ্যে যুগে যুগে জনক, রাম, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের সাধনাকে যদি এই কারণে বাদ দেওয়া যায় তবে ভারতের কত বড় দারিদ্র্য। গীতা, উপনিষৎ, জৈন বৌদ্ধাদি শাস্ত্র কি আজ উপেক্ষার বস্তু?

ভগবান বুদ্ধের পরই বৌদ্ধসঙ্ঘে যাঁহার প্রতিষ্ঠা সেই উপালি ছিলেন নাপিত-বংশজ। সুনীত ছিলেন পুক্কস, থেরগাথায় তাঁহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সাতি ছিলেন মৎস্যজীবী। নন্দ ছিলেন গোয়ালা। পণ্ঠকেরা দুইজন অভিজাতকন্যার গর্ভে দাসের ঔরসে জাত জারজসন্তান। তপস্বিনীদের মধ্যে চাপা ছিলেন মৃগয়াজীবী ব্যাধের কন্যা। পুণ্ণা এবং পুণ্ণিকা ছিলেন দাসদুহিতা। সুমঙ্গলমাতা জাতিতে ছিলেন বেণ। সুভা কামারের কন্যা। এইরূপ আর কত বলা যায়?[১]

দক্ষিণ ভারতবর্ষে তামিল ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই শূদ্র। যায়ু মানুবর, সিদ্ধিয়র, পত্তিনাত্তু পিল্লেয়ার, অমৃত সকৈনার প্রভৃতি ভক্তগণ শূদ্র। অরুণ গিরিনাথর, অরুমুগুনাথর প্রভৃতি ভক্তগণও অব্রাহ্মণ। রামানুজ হইলেন আচারী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু। পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার গুরু তিরিকুচকুণ্ডরম্ ছিলেন অব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহার সাধনার স্থান পুনামালী গ্রাম এক মহাতীর্থ। মান্দ্রাজ হইতে তাহা ১২ মাইল দূরে হইলেও বহু দূরপ্রদেশের ভক্তেরা সেখানে তীর্থদর্শনে যান।[২] নাম্মালবর বা মুনিবাহন অস্পৃশ্যজাতি। কুরাল নামক অপূর্ব ভক্তিশাস্ত্র রচয়িতা তিরুবল্লুবর অতি নীচ জাতি। কণ্ণপ্পনয়ন জাতিতে ব্যাধ। পংহত্তি সিত্তার শূদ্র হইতেও হীন জাতি। থিরুমল নায়নার জাতিতে অন্ত্যজ। ভক্ত নন্দনার অস্পৃশ্য পারিয়া। আলবাররা অনেকেই জাতিতে নীচ অথচ অপূর্ব তাঁহাদের ভক্তি। কি মধুর তাঁহাদের সব বাণী ও গান! এখন ব্রাহ্মণোত্তমদের গৃহেও যে-কোনো পবিত্র অনুষ্ঠানে নন্দনার প্রভৃতি ভক্তদের গান ছাড়া চলে না। চিদম্বরমের মন্দিরের মধ্যে এই অস্পৃশ্য পারিয়ার মূর্তি। অথচ এই মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশে আজ এত বাধা! আচার্য রামানুজ এইসব ভক্তগণকে পূর্বভাগবতদের মধ্যে স্থান দিয়া ভারতের একটি মহদুপকার করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে তুকারাম নামদেব প্রভৃতি ভক্তেরা শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণাদির গুরু হইয়াছেন। বাংলাদেশে মহাপ্রভুর কৃপাতেও বহু ব্রাহ্মণ নিম্নতর বর্ণের কাছে দীক্ষা লইয়াছেন, এবং আজিও সেই রীতি সমানভাবে চলিয়াছে। এখনও দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নারায়ণগুরু জন্মিলেন থিয়া জাতির মধ্যে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভবিষ্যপুরাণ গ্রন্থখানি বেশি প্রাচীন নহে। তবু তো তাহা পুরাণ বলিয়া গৃহীত। ভবিষ্যপুরাণে দেখা যায় দেবী সরস্বতীর আজ্ঞায় কণ্বমুনি

১ *Sacred Books of the Buddhists*, Vol II, p. 102

২ ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ. ৭৪২

মিশরদেশে যাইয়া দশ সহস্র ম্লেচ্ছকে সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার দ্বারা আপনার করিয়া লইলেন।

সরস্বত্যাজ্ঞয়া কণ্বো মিশ্রদেশমুপাযয়ৌ ॥
ম্লেচ্ছান্ সংস্কৃত্যমাভাষ্য তদা দশসহস্রকান্।
বশীকৃত্য স্বয়ং প্রাপ্তো ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে ॥

—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, চতুর্থ খণ্ড, ২১শ অধ্যায়, ১৫

তাহাদের তপস্তায় তুষ্ট হইয়া দেবী সরস্বতী তাহাদিগকে গুণানুসারে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন (ঐ, ১৬-১৯)। ভবিষ্যপুরাণমতে ম্লেচ্ছদিগের অনেককে তিলক ও তুলসীমালা দিয়া নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব করিয়া লওয়া হইল (ঐ, ৫২-৬৩)।

শৈবগণও এইভাবে ত্রিপুণ্ড্র ও রুদ্রাক্ষমালা দিয়া অনেককে শৈব করিয়া লইলেন (ঐ, ৬৪-৭৩)।

মধ্যযুগে সন্তসাধকেরাও এইভাবে অনেককে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন (ঐ, ৭৮ ইত্যাদি)।

আসামে শঙ্করদেব ছিলেন জাতিতে শূদ্র। তাঁহারই প্রবর্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়। পরে তাঁহারই ধারাতে দামোদর নূতন এক সম্প্রদায় চালাইলেন। দামোদর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নাম বামুনিয়া। ক্রমে বামুনিয়ারা তাঁহাদের পুরাতন শূদ্রগুরুর সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিলেন এবং আসামদেশের ভক্তগণকে নূতন করিয়া বর্ণাশ্রমের বাঁধনে বাঁধিলেন।

আসলে যে সব ভক্তগণ ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মকে প্রবর্তিত করেন তাঁহাদের মধ্যে দ্রবিড়ভক্তেরাই অতিপ্রাচীন ও প্রধান। এই জন্যই দেখা যায় পদ্মপুরাণে স্বয়ং ভক্তি বলিতেছেন, "দ্রবিড় দেশেই আমার জন্ম, কর্ণাটে আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, মহারাষ্ট্রে কিছুকাল বাস করিয়া গুজরাটে আমি জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি।" (উত্তর খণ্ড, ১৯৩ অধ্যায়, ৫১)।

উত্তর ভারতেও মধ্যযুগে কবীর, রবিদাস, সেনা, সদনা, ধন্না, দাদূ, নাভা প্রভৃতির জন্ম অত্যন্ত নীচকুলে। নামদেব দরজী। আরও যে কত নীচকুলোৎপন্ন ভক্ত আছেন তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

বাংলাদেশে আউল বাউলদের মধ্যে কেহ নমঃশূদ্র, কেহ কাপালি, কেহ জেলে কৈবর্ত, কেহ ভুইঁমালী প্রভৃতি অতি হীন জাতি। কিন্তু তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও দৃষ্টির তুলনা নাই।

এখনকার দিনেও বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ব্রজেন্দ্র শীল, মহেন্দ্র সরকার, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য জগদীশ, প্রফুল্ল রায়, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির স্থান কি কোনো ব্রাহ্মণের অপেক্ষা নীচে হওয়া উচিত? অথচ শাস্ত্রমতে যদি তাঁহাদের জ্ঞান ধ্যান ও সাধনাকে উপেক্ষা করা যায় তবে ভারতে আর থাকে কি?

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশকে আজ আমরা বেদবাক্যের মত শ্রদ্ধা করি কিন্তু দেশাচার ও লোকাচার কি তাহা করিতে সম্মতি দেয়? এইরূপ সুযোগের অভাবে সমাজের আনাচে কানাচে উৎপন্ন বহু বহু শক্তিশালী পুরুষের সাধনা মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই। সেইসব ক্ষতি আমাদের সমাজকে কম পঙ্গু করে নাই। আর এই জাতিভেদ যাহাদের শক্তিহীন দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের ভারও সমাজকে নিত্য নীচের দিকে টানিয়াছে। নানা অন্যায়ের বোঝায় আমরা আজ ডুবিতে বসিয়াছি।

পরিশিষ্ট

জাতিভেদের পুরাবৃত্ত

বেদের প্রথম দিকটায় নানা জাতির উল্লেখ বড়ো একটা পাই না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে মাত্র চারি জাতির উল্লেখ দেখা যায়। তখন বেদপন্থীরা আর্য আর তদিতর সকলে অনার্য। ক্রমে অনেক আর্যেতর লোকও আর্যদের আশ্রয়ে আসিয়া দাস বা শূদ্র হইলেন। অনেকে আবার বাহিরেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা দস্যু। যাঁহারা শূদ্র হইয়া আশ্রয় পাইলেন সমাজের নিম্নভাগে তাঁহাদের স্থান হইল। কিন্তু তাঁহাদের হাতে খাইতে বা স্পর্শে আর্যদেরও তখন কোনো দোষ ছিল না। তাঁহাদের কন্যাও আর্যেরা বিবাহ করিয়াছেন। আর্যদের মধ্যে বৃত্তিভেদে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন জাতির উদ্ভব হইল। শূদ্র হইল চতুর্থ জাতি। আর কোনো পঞ্চম জাতির স্থান আর্যেরা দিতে না চাহিলেও ক্রমে পরে সমাজের বাহির হইতে আগত পঞ্চম ও আরও নানা রকমের বৃত্তিগত ও বংশগত (tribal) জাতির স্থান হইল। পরে চেষ্টা হইল চারি জাতির মিশ্রণেই ইহাদের উৎপত্তি, ইহাই বুঝাইতে।

তখনকার দিনে দেশভেদে ও বংশ (tribe, race) ভেদে কিরাত, কীকট, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুণ্ড্র প্রভৃতি আরও বহু জাতির নাম ক্রমে দেখা যায়। আবার চণ্ডাল, কর্মার, কুলাল, কৈবর্ত, জ্যাকার, তক্ষন্, তলব, তষ্টা, দার্বাহার, ধীবন, ধ্মাতা, নাপিত, বপ্‌তা, নাবজ, পর্ণক, পশুপ, প্রেষ্য, মৃগয়ু, মৃৎপচ, মৈনাল, রথকার, বংশনর্তিন্, বনপ, বয়িত্রী, শৌষ্কল, সুরাকার, হস্তিপ প্রভৃতি নানা বৃত্তির লোকের উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, শূদ্রদের বর্ণ ছিল কালো, নাক ছিল বোঁচা, এবং শ্রেণী-বিশেষের উপাস্য ছিল লিঙ্গ। কেহ কেহ বলেন, শিশ্নদেব অর্থে শিশ্নপরায়ণ বুঝিতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭, ২৯, ৪) মতে শূদ্র হইল অন্যের আজ্ঞাবহ ("অন্যস্য প্রেষ্য")। যখন খুসি তাহাকে বিদায় দিয়া বাসস্থান হইতে উঠাইয়া দেওয়া যায় ("কামোত্থাপ্য")। যখন ইচ্ছা তাহাকে বধ করা-যায় ("যথাকামবধ্য")।

স্মৃতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও বলেন, আর্য দ্বিজগণের পরিচর্যাই শূদ্রের একমাত্র বৃত্তি। ইহাই বিধাতার বিধান। দ্বিজগণের পরিচর্যাতেই শূদ্রের মহৎ সুখ (শান্তি, ৬০, ২৮-২৯)। শূদ্র কখনও সঞ্চয় করিতে পারিবে না (ঐ, ৩০)। জীর্ণ বসনাদিই তাহার প্রাপ্য (ঐ, ৩১-৩৩)। তবে শূদ্র বৃদ্ধ অশক্ত হইলে তাহাকে

ভরণ করা উচিত (ঐ, ৩৫)। শূদ্রের আপন ধন বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্জিত ধনে তাহার প্রভুরই অধিকার।

নহি স্বমস্তি শূদ্রস্য ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ ॥ —ঐ, ৩৭

বেদমন্ত্রেও তাহার কোনো অধিকার নাই (ঐ)। দাক্ষ্যই (সেবার্থ উৎসাহ) শূদ্রের ভূষণ (শান্তি, ২৯৩, ২১)।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলেন বহু পশুর মালিক সমৃদ্ধশূদ্রও দাস মাত্র। সে অযজ্ঞিয় (৬, ১, ১১) অর্থাৎ যজ্ঞশালায় তাহার কোনো স্থান নাই।

তখনকার দিনে যজ্ঞশালার চারিদিকেই ছিল সব বিদ্যার চর্চা। কাজেই সেখানে যে স্থান না পাইল সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিল। মহীদাস ঐতরেয় যজ্ঞশালাতে পিতার কাছে প্রত্যাখ্যাত হন। তাঁহার পিতা ঋষি হইলেও তাঁহার মাতা শূদ্রকন্যা। যজ্ঞস্থলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পরে তিনি পৃথিবী মাতার কাছে সর্ববিদ্যা লাভ করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনা করেন।

তবে যজ্ঞশালার বিষয়ে এই নিষেধ হয়তো পরে ক্রমে শিথিল হইয়া গিয়াছে। কারণ, মহাভারতে দেখা যায়, মান্য শূদ্রেরা যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী (সভা, ৩৩, ৪১)।[১]

শূদ্রেরা যজ্ঞশালার অনধিকারী এই কথার সঙ্গে আর একটি কথা পাই। যজ্ঞের জন্য শূদ্রের কাছে কিছু লইবে না।[২]

১ এইখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই উদারতা যে ঠিক পরবর্তী কালেই ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে হয়তো সেরূপ নহে। একই সময়ে কেহ উদার কেহ অনুদার ও স্বার্থপরায়ণ। কাজেই এইরূপ মতভেদ সব সময়েই আছে। এখনকার দিনেও কোনো কোনো ইংরাজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চাহেন, কেহ কেহ আবার চাহেন তাহাকে চিরকাল দাসরূপেই রাখিতে। এবং তদনুরূপ যুক্তিও তাঁহারা দেখান। বেদে পুরাণে ঠিক সেইরূপ অনুদার স্বার্থপরায়ণ লোকেরও অভাব নাই। একই কালে একই পথে দুই নদীর দুই রঙের জলধারা যেমন পাশাপাশি চলে সেইরূপ পাশাপাশি উদার অনুদার এই দুই বিভিন্ন মত চলা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।"

২ এই শ্লোক দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন "ইহাতে কিছু দোষের কথা নাও থাকিতে পারে। কারণ শূদ্রের যদি যজ্ঞে অর্থাৎ শিক্ষায় অধিকার না থাকে তবে যজ্ঞের জন্য তাহাকে কিছু দিতে বাধ্য করা সত্যই অন্যায়। এখনকার দিনে সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষা দীক্ষার জন্য বা প্রচারের জন্য যে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে জুলুম করিয়া ট্যাক্স আদায় করা হয় তাহাই অন্যায়। এইরূপ জিজিয়া যে মহাভারত পছন্দ করেন নাই তাহাই বরং ভাল। অবশ্য যজ্ঞশালার প্রবেশাধিকার, এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের জন্য ব্যয় দিবার অধিকারও শূদ্রকে দিলে আরও ভালো হইত।"

আহরেদথ নো কিঞ্চিৎ কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
নহি যজ্ঞেষু শূদ্রস্য কিঞ্চিৎদস্তি পরিগ্রহঃ॥ —শান্তি, ১৬৫, ৮

দাস্যবৃত্তি ছাড়া যে সব শূদ্র শিল্পোপজীবী ছিলেন তাঁহাদের উপর ট্যাক্সের জুলুম যাহাতে না হয় সেই দিকেও তখন দৃষ্টি ছিল। তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সর্ববিধ করসংগ্রহ ব্যাপারে লোভী নির্বোধদের নিয়োগ করা অনুচিত (শান্তি, ৭১, ৮)। কারণ এইরূপ ভাবে কর ধার্য করিয়া প্রজাদের পীড়ন করা হয় ও ইহাতে শিল্প ও ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায় (ঐ, ৮৭, ১৪-১৮)।

যজ্ঞস্থলে শূদ্রদেরও যে একেবারে যাওয়ার ও জ্ঞানলাভ করিবার অধিকার ছিল না তাহা তো মনে হয় না। কারণ "আগম"-সম্পন্ন শূদ্রদের কথাও আছে। আগম বলিতে শাস্ত্র ও জ্ঞান বুঝায়। যদি যজ্ঞস্থলে আগম পাওয়া শূদ্রদের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে শূদ্রদের পক্ষে অন্য কোথাও তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে উমাকে মহেশ্বর বলিতেছেন, হউক না কেন ন্যূনজাতিকুলোদ্ভব তবু যদি শূদ্র সদাচারের দ্বারা আগম-সম্পন্ন সংস্কৃত হয় তবে সে দ্বিজই হইবে।

এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥[1] —অনু, ৭৮, ৪৬

এই শ্লোকটি ব্রহ্মপুরাণেও পাই। মহাভারতেও অনুশাসন পর্বের উমা-মহেশ্বর সংবাদে এই একই মত দেখা যায়। সেখানে দেখি কুৎসিতাচার করিলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যায় (শান্তি, ৭৮, ৪৭)। শুচি কর্মের দ্বারা শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎ সেব্য হইয়া ওঠেন, স্বয়ং ব্রহ্মাও এই কথা বলেন।

কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥ —ঐ, ৪৮

শূদ্রেও যদি সৎস্বভাব ও শুভ কর্ম থাকে তবে আমি (মহেশ্বর) বলিতেছি সে দ্বিজাতিরও বিশিষ্ট।

স্বভাবঃ কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥ —ঐ, ৪৯

এই বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের (২২৩, ৫৬-৫৯)[1] যে শ্লোক কয়টি আছে তাহা মহাভারতের অনুশাসন পর্বে (৭৮, ৫০-৫২) উমা-মহেশ্বর সংবাদেও আছে।

১ ৪১ পৃ.

ভীষ্মও বলেন, অকূলে যে কূলস্বরূপ হয় অপারে যে তরণী হয় সে ব্যক্তি শূদ্রই হউক বা অন্য কেহই হউক সে সর্বথা সম্মানের পাত্র।

অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বা প্যন্যঃ সর্বথা মানমর্হতি॥ —শান্তি, ৭৮, ৩৮

চার বর্ণ তো বুঝা গেল। পঞ্চজনের মধ্যে সেই পঞ্চম বর্ণ কে? ঔপমন্যব বলেন পঞ্চমেরা নিষাদ (যাস্ক, ৩, ৮)।[১]

লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে নিষাদ-গ্রামের উল্লেখ আছে (৮, ২, ৪)। নিষাদ-স্থপতির কথা কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১, ১, ১২) পাই। স্থপতি বলিতে ছুতার ছাড়াও রাজা ও প্রধান প্রভৃতি বুঝায়। কাজেই নিষাদদের গ্রাম ও তাহাদের রাজা বা নেতাও ছিলেন। নিষাদস্থপতিরা গবেধুক যাগও করিতেন (পৃঃ ১২১)।

রবীন্দ্রনাথের মতে সমাজে উদার ও অনুদার মতসম্পন্ন দুই রকমের মানুষই যে তখন ছিলেন তাহা বুঝি যখন দেখি "শূদ্রদের আপন ধন বলিয়া কিছুই নাই" (নহি স্বম্ অস্তি শূদ্রস্য; মহা, শান্তি, ৬০, ৩৭) বলা সত্ত্বেও শূদ্র গৃহপতিদের উল্লেখ পাই (মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪, ২, ৭, ১০; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ৬, ১, ১১)। স্মৃতিতে শূদ্র রাজার উল্লেখও বহু স্থলে আছে (মনু ৬, ৬১; বিষ্ণু ৭১, ৬৪)। দস্যুদের পুরের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে।

পুরো বিভিংদন্ অচরদ্ বি দাসীঃ। —১, ১০৩, ৩

অন্যত্র নব্বইটি দাসাধিকৃত পুরের কথাও ঋগ্বেদে পাই।

নবতিং পুরো দাসপত্নীঃ। —৩, ১২, ৬

দস্যুদের মারিয়া তাহাদের লৌহময় পুরী ধ্বংস করার কথাও ঋগ্বেদে দেখা যায়।

হত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীর্নি তারীৎ॥ —ঋগ্বেদ ২, ২০, ৮

শূদ্র বণিক্ ও ব্যবসায়ীর উল্লেখ শাস্ত্রে নানাস্থানে পাওয়া যায় (গৌতম ধর্মশাস্ত্র ১০, ৬০)। প্রয়োজন হইলে শূদ্রও যে-কোনো ব্যবসা করিতে পারিতেন (বিষ্ণু স্মৃতি, ২, ১৪)। মহাভারতও বলেন এইরূপ স্থলে বাণিজ্যে, পশুপালনে ও শিল্পকর্মে শূদ্রের অধিকার আছে।

বাণিজ্যং পশুপাল্যং চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তি র্ন জায়তে॥ —শান্তি, ২৯৪, ৪

এক দেশে বাস করিলে পরস্পরের সুখ-দুঃখে পরস্পরের যোগ না হইয়া যায় না।

১ ১২১ এবং ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তাই শূদ্রকে যতই দূরে ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টা হউক না কেন আর্য ও শূদ্রের কল্যাণ অকল্যাণকে বিযুক্ত রাখা সম্ভব হয় নাই। কাজেই শূদ্র ও আর্যের প্রতি "এনঃ" অর্থাৎ অন্যায়ের কথা যুক্ত ভাবেই দেখা যায় "যচ্ছূদ্রে যদর্যে এনশ্চকৃমা বয়ং" অর্থাৎ শূদ্রে বা আর্যে যে পাপ করা হইয়াছে (বাজসনেয়ি সংহিতা, ২০, ১৭; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১, ৮, ৩, ১; কাঠক সংহিতা, ৩৮, ৫)।

অথর্ববেদে দর্ভের কাছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-আর্য ও শূদ্রের নিকটে যুক্তভাবে প্রিয় হইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ। —অথর্ব, ১৯, ৩২, ৮

আর কয়েকটি সূক্তের পরেই আবার প্রার্থনা আছে "শূদ্র-আর্য উভয়ের কাছেই আমাকে প্রিয় কর।"

প্রিয়ং মাং কৃণু…উত শূদ্রে উতার্যে॥ —অথর্ব, ১৯, ৬,২১

বাজসনেয়ি সংহিতায়ও (২৬, ২) শূদ্র ও আর্যের কাছে সমভাবে কল্যাণ বাণী প্রচারের কথা আছে।[১]

ধীবর, রথকার, কামার এবং মনীষীদিগকে এক সঙ্গে সকলকে আবাহন করা হইয়াছে।

যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ সর্বান্ কৃণু॥ —অথর্ব, ৩, ৫, ৬

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কাছে রুচির হইবার প্রার্থনা কাঠক সংহিতায় আছে।

রোচয় মা ব্রাহ্মণেষু অথো রাজসু রোচয়।
রোচয় মা বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচারুচম্॥ —৪০, ১৩

তৈত্তিরীয় (৫, ৭, ৬, ৪), মৈত্রায়ণী (৩, ৪, ৮), বাজসনেয়ি (১৮, ৪৮) সংহিতায়ও অনুরূপ কামনা আছে।

কাজেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা যে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়াছেন বা শূদ্রকন্যায় পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। দীর্ঘতমা উশিজ কক্ষীবান প্রভৃতির কথা শাস্ত্রে আছে।[২] মহাভারতে আদিপর্বে ১০৪ অধ্যায়ে তাহা দ্রষ্টব্য। ভ্রাতৃবধূর গর্ভে বৃহস্পতির দ্বারা দীর্ঘতমার জন্ম (ঐ)।

দাসীপুত্র ঐলূষ-কবষের কথাও শাস্ত্রে আছে।[২] মহাভারতে শান্তিপর্বে পশ্চিম তীর্থের ঋষিদের মধ্যেও তাঁহার কথা আছে (১২, ৩০)। পূর্বদিকের মহর্ষিদের মধ্যে উশিজপুত্র কাক্ষীবানের নামও কীর্তিত (ঐ, ১২, ২৭)।

১ ১১৯ পৃ.
২ ২৫ পৃ.

সত্যকাম জাবালের জন্মকথাও সুপরিচিত।[১] পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৪, ৬, ৬) শূদ্র কন্যার গর্ভে জাত বৎস ঋষির কথা আছে। বৎস অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা আপন শুচিতা প্রমাণিত করেন।

কাজেই শতপথ ব্রাহ্মণে (৫, ৩, ২, ২) রাজাদের যে শূদ্র অমাত্যের কথা আছে তাহাতে অদ্ভুত কিছু নাই। মহাভারতেও তিনজন বিনীত শুচি শূদ্রকে অমাত্য করার কথা আছে।

ত্রীংশ্চশূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্মণি পূর্বকে।[২] —শান্তি, ৮৫, ৮

সামাজিক ভাবে শূদ্রদের প্রতি এক দলের অনুদারতা থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শূদ্রদের প্রতি যথাসাধ্য সুবিচার করার চেষ্টা হইয়াছে। মহাভারতেও দেখা যায় ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও শূদ্রকে চতুরাশ্রমের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অন্ত্যান্তরগতস্যাপি দশধর্মগতস্য বা
আশ্রমা বিহিতাঃ সর্বে বর্জয়িত্বা নিরাশিষম্ ॥[২] —শান্তি, ৬৩, ১৩

এখানে নীলকণ্ঠের টীকাটুকুও উদ্ধৃত করা যাউক।

"অন্ত্যান্তরগতস্য আচারনিষ্ঠয়া ত্রৈবর্ণিকসমস্য, দশধর্মগতস্যেতি মত্তপ্রমত্তাদীন্ প্রকৃত্য দশধর্মং ন জানন্তি ইত্যুক্তেরত্র যোগধর্মানভিজ্ঞস্য গ্রহণং, তস্যাপি আশ্রমাঃ সর্বে বিহিতাঃ। শূদ্রোঽপি নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্যং বানপ্রস্থং বা সকলবিক্ষেপককর্মত্যাগ-রূপং সন্ন্যাসং বানুতিষ্ঠেদেব। নিরাশিষং শান্তিদান্ত্যাদিকল্যাণগুণরহিতম্।"

মহাভারতে বনপর্বে নাগরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সত্য দান ক্ষমা শীল অহিংসা তপস্যা কৃপা যে মানুষে দেখা যায় সেই মানুষই ব্রাহ্মণ (১৮০, ২১)।" সর্প বলিলেন, "শূদ্রেও তো এই সব গুণ দেখা যায় (ঐ, ২৩)।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "শূদ্রেও যদি এই সব সদ্‌গুণ থাকে তবে সে আর শূদ্র থাকে না, ব্রাহ্মণেও এইসব

১ ২৫ পৃ.

২ পরবর্তীকালেও মহাভারতের এই নির্দেশ লোকে বিস্মৃত হয় নাই। প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজাদের জন্য বরদরাজ তাঁহার বিখ্যাত নিবন্ধ ব্যবহারনির্ণয় সংগ্রহ করেন। তাহাতে দেখা যায় বৃহস্পতির মতে বিচারকালে বিচারার্থীর দলের লোককে "জুরি" অর্থাৎ বিচারকের সহায়ক হইতে হইত। চাষা, মজুর, শিল্পী, নটুয়া, জঙ্গলী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিচারার্থীদের জন্য সেই সেই শ্রেণীর "জুরি" থাকার প্রয়োজন ছিল। শূদ্র, অন্ত্যজ, জঙ্গলী সকলকেই বিচারক হইতে হইত।

কীনাশঃ কারুকঃ শিল্পী কুসীদঃ শ্রেণী নর্তকাঃ।
যে অরণ্যচরা স্তেষাম্ আরণ্যৈঃ করণং ভবেৎ ॥

— ব্যবহারনির্ণয়, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার সম্পাদিত, পৃঃ ১১)

গুণ না থাকিলে সেও আর ব্রাহ্মণ নহে (ঐ, ২৫)। এই গুণ যাঁহাতে থাকিবে তিনিই ব্রাহ্মণ, আর যাঁহাতে না থাকিবে তিনিই শূদ্র (ঐ, ২৬)।"

এই শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন, "শমাদি গুণ থাকিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার্য আর কামাদি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণও শূদ্র বলিয়া গ্রহণীয়।" শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এবেতার্থঃ।[1]

শূদ্রের নিজস্ব ধন বলিয়া কিছু নাই বলা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে শূদ্র রাজা পৈজবন ঐন্দ্রাগ্নযজ্ঞবিধানে শত সহস্র দান করিয়াছেন (শান্তি, ৬০, ৩৯)।

মহাভারতে আছে কৌশিক নামে বেদাধ্যায়ী তপোধনকে বলা হইয়াছিল "ধর্ম যদি জানিতে হয় তবে মিথিলাতে ধর্মব্যাধের কাছে যাও" (বনপর্ব, ২০৫, ৪৪-৪৫)। ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহাকে মাংসের দোকানে উপবিষ্ট দেখিলেন (ঐ, ২০৬, ১০)। ব্যাধ মাংস বেচিতেছেন, চারি দিকে ক্রেতার ভিড় (ঐ, ঐ, ১১)। অনুরুদ্ধ হইয়া যে সব উপদেশ ব্যাধ দিলেন তাহা ঐ অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ আছে। তাহা অপূর্ব। তাহার মধ্যে অনেক কথা এখনও লোকের মুখে মুখে। যথা,

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ। —ঐ, ঐ, ৪৪

অর্থাৎ,যাহা কল্যাণ বলিয়া বুঝিবে তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবে। এই উপদেশ শান্তিপর্বেও (৯৪, ১০) আছে। এবং

ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ। —ঐ, ঐ, ৪৫

যে অন্যায় করে তাহাকে অন্যায় ফিরাইয়া দিবে না, ইত্যাদি। এইসব উপদেশের মধ্যে সর্বত্র গীতার ও ধম্মপদের সায় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে মুদি তুলাধারের কথাও স্মরণ করা উচিত। শান্তিপর্বে ২৬০-৬১ অধ্যায়ে তুলাধারের উপদেশগুলি বর্ণিত আছে।

মহাভারতে মহত্তম মানুষ হইলেন বিদুর। দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম। সাধনায় ও জ্ঞানে তিনি ব্রাহ্মণেরও নমস্য। তিনি আপনাকে শূদ্রযোনিজাত বলিয়াছেন,

শূদ্রযোনাবহং জাতঃ। —উদ্যোগ, ৪১, ৫

তাঁহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই।

দাসীতে প্রভু পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন বলিয়া দাসী প্রভুর ক্ষেত্র।[2] কাজেই

১ ব্রহ্মপুরাণেরও মতও যে ঠিক এইরূপ তাহা এই পুস্তকে ৪১ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে।

বাস্তবিকও যে এইরূপ ঘটে তাহা মহাভারতের কৃতঘ্ন উপাখ্যানে দেখা যায় (শান্তিপর্ব, ১৬৮-১৭৩ অধ্যায়)। সুপর্ণ নাড়ীজঙ্ঘের এই উপাখ্যান এই পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় আছে।

২ এই পুস্তকে ৮৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ দাসীপুত্রের কথা লেখা আছে।

বিচিত্রবীর্যের দাসী ছিলেন বিচিত্রবীর্যেরই ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে ধীবরকন্যার পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস বিদুরকে জন্ম দিলেন (আদি, ১০৬, ৩২)।

ধৃতরাষ্ট্রেরও এইরূপ এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম যুযুৎসু। তিনি পরিচারিকা (আদি, ১১৫, ৪১,৪৩) এক বৈশ্যা নারীর গর্ভে জাত (আদি, ৬৩, ১২০)। তিনি বীর মহারথ ছিলেন (ঐ ; আদি, ১১৫, ৪৪ ; আশ্রম, ১৬, ৫)। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের অন্যায়াচরণ দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষে যুযুৎসু যোগ দেন (ভীষ্ম, ৪৩, ১০০)। বারণাবতে রাজারা ছয় মাস এক সঙ্গে ক্রোধে যুদ্ধ করিয়াও যুযুৎসুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পরে পাণ্ডবগণ যুযুৎসুকে প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারীর পদে রাখিয়া (যুযুৎসুম্ অগ্রতঃ কৃত্বা) শ্রাদ্ধ তর্পণ সম্পন্ন করিলেন (আশ্রমবাসিক পর্ব, ৩৯ অধ্যায়)। দুর্যোধন প্রভৃতির মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, "যুযুৎসু আপনার ঔরস পুত্র। তিনিই না হয় রাজা হউন।" (আশ্রম, ৩, ৪৭)।

কাজেই দাসীগর্ভজাত হইলেও কুরুবংশে বিদুর ও যুযুৎসুর প্রভূত সম্মান ছিল। ইঁহাদের "কুরুবংশবিবর্ধন" বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে (আদি, ১০৬, ৩২)। বিদুর প্রভৃতিকে "কুলতন্তু" বলা হইয়াছে (ঐ, ১১০, ৩)।

যদিও কথা ছিল যে শূদ্রের মন্ত্রাধিকার নাই (মন্ত্রঃ শূদ্রে ন বিদ্যতে—শান্তি, ৬০, ৩৭) তথাপি বিদুরের বিদ্যার পার ছিল না। তাঁহাকে সর্বদাই মহাত্মা বলা হইয়াছে (উদ্যোগ, ৯১, ৩৪)। সর্ব বিদ্যায় নিষ্ণাত বিদুরে এই মহাত্মা পদটি সার্থক হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে দ্বিজাতিদের বিদ্যার ক্ষেত্র ছিল যজ্ঞভূমিতে। শূদ্রদের বিদ্যার ভূমি ছিল তীর্থে। শূদ্রদেরও বহু প্রকারের জ্ঞান ছিল। ৬৪ কলার গীত বাদ্য প্রভৃতি বহু অংশই শূদ্রের বিদ্যা। তাহা বেদবাহ্য। ক্রমে সেই সব বিদ্যা ব্রাহ্মণদেরও আদরণীয় হইয়াছে। কাজেই বিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শূদ্রদের সাধনাও উপেক্ষণীয় নহে। তাই মহাভারতে আছে "শুভা বিদ্যা হীনদের কাছ হইতেও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয়।"

শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাপ্নুয়াৎ। —শান্তি, ১৬৫, ৩১

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যাহার কাছেই কেন হউক না শ্রদ্ধাতব্য জ্ঞান নিতে হয় শ্রদ্ধার সহিত। যে শ্রদ্ধাবান সে জন্মমৃত্যুর অতীত।

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্ বা
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণম্।,
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং
ন শ্রদ্ধিনং জন্মমৃত্যু বিশেতাম্॥ —শান্তি, ৩১৮, ৮৮

অন্যান্য কৌরবদের মতো বিদুরও আর্যবিদ্যায়ও নিষ্ণাত ছিলেন। তিনি সংস্কার সকলের দ্বারা সংস্কৃত ও ব্রতাধ্যয়নসংযুক্ত ছিলেন।

সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা স্তে তু ব্রতাধ্যয়নসংযুতাঃ॥ —আদি, ১০৯, ১৮

তিনি ইতিহাসে পুরাণে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ ও সর্বত্র কৃতনিশ্চয় (ঐ, ঐ, ২০)। কাজেই বিদুরকে ধর্মতত্ত্বজ্ঞও (ঐ, ঐ, ২৬) বলা সঙ্গতই হইয়াছে। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শুনাইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকেই অনুরোধ করিয়াছেন (উদ্যোগ ৪১ অধ্যায়)। সেখানে বিদুর অতিশয় বিনয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণেও শূদ্রের কাছে ব্রাহ্মণদের বিদ্যালাভের কথা দেখা যায়। বিদুর যুধিষ্ঠিরেরও মান্য (আশ্রম, ৪, ২১)। পাণ্ডবেরা বিদুরের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন (আদি, ১৪৫, ২ ; সভা, ৫৮, ৪ ; বন, ২৫৯, ৮)।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী সহমৃতা হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কুরু-পাণ্ডবগণের সঙ্গে বিদুরও যথা নিময়ে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলেন (আদি, ১২৭, ২৮ ইত্যাদি)। ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করিলে বিদুরও বনে গেলেন (আশ্রম, ১৮, ১৯)। সেখানে বানপ্রস্থ বিধিতে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পূর্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া বিদুর প্রভৃতি সকলে উপবাস করিয়া রহিলেন (ঐ, ঐ, ২৩-২৪)। ধৃতরাষ্ট্র বনে গিয়া বিদুরের বিধি ও মতানুসারেই বানপ্রস্থ ধর্মপালন করিতে লাগিলেন (ঐ, ১৯, ১)।

বিদুর ধর্মের অবতার (আদি, ৬৩, ৯৬)। ধর্মো বিদুরতাং গতঃ (আশ্রম,২৮,২১) ধর্মই বিদুর হইলেন। ধর্ম ও বিদুর একই—যো হি ধর্মঃ স বিদুরঃ (ঐ, ২৮, ২১)। সংসিদ্ধির পর বিদুর ধর্মেই বিলীন হইলেন (ঐ, ২৯, ২)। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মেই প্রবিষ্ট হইলেন (স্বর্গা ৫, ২২)।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাজে গিয়া বিদুরের গৃহেই উপস্থিত হইলেন (উদ্যোগ, ৮৯, ২২)। কৃষ্ণ-বিদুর সংবাদ ভক্তদের চিরস্মরণীয়। মহাভারতের মধ্যে বিদুরের চরিত্রমাহাত্ম্য অতুলনীয়। যেই শূদ্রকুলে এই মহাপুরুষের জন্ম, সেই কুল তো জগতের সর্বজনের চিরদিন নমস্য হইয়া থাকিবে। পরবর্তী কালে এই হীন কুলেই কবীর, রবিদাস, দাদু, রজ্জবজী, সেনা, সদনা, ধন্না, নাভা, ভান সাহেব, জীবন সাহেব প্রভৃতি ভক্তের দল জন্মিয়াছেন। এই কুলেই আউল বাউল প্রভৃতিরা জন্মগ্রহণ করিয়া মানবজাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির কাছে অতি বড়ো কুলীন এবং অভিজাতেরও মাথা হেঁট হইয়া যায়।

এত দূর পর্যন্ত বেদ পুরাণ শাস্ত্রের কথাই আলোচিত হইল। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া লোকাচারের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িলেও ভাবিবার মতো অনেক কথা পাওয়া যায়। সমাজ সব সময় শাস্ত্রের নির্দেশেই চলে না। চলে কতকগুলি দেশপ্রচলিত আপন নিয়মে। তাহাকেই সামাজিক আচার বা লোকাচার বলে। তাহাতে দেখা যায় বাংলাদেশে জাতিভেদের উপরেও আবার কুলীন অকুলীন প্রভৃতি নানা রকমের বিচার ছিল এবং এখনও তাহা আছে। কুলীন ব্রাহ্মণ অকুলীনের কন্যা বিবাহ করিবেন না। তাহার হাতে খাইবেন না। অবশ্য এখন এইসব বিধি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের সামাজিক আচারের বিষয়ে স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থখানি খুব সম্মানিত। তাহাতে চোখ বুলাইয়া দেখা যায় অনেক কুলে সন্ন্যাসিত্ব দোষ আছে। কেহ যদি সন্ন্যাস নিয়া ফিরিয়া আবার গৃহস্থ হয় তবে সে শাস্ত্রানুসারে পতিত। রাঢ়ীশ্রেণীর পরিহাল মেলে এই দোষ আছে (পৃঃ ৪৯২)। স্থানান্তরেও বলা হইয়াছে মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দও অবধূত হইয়া প্রথমে জাতিভেদ মানেন নাই (পৃঃ ৩৯০, ৩৯২)।[১] তিনি অনাচরণীয় শূদ্রের অন্নও খাইতেন। নীচ জাতীয়া কন্যাও তিনি বিবাহ করিয়াছেন (পৃঃ ৩৯২)। সেই কন্যার গর্ভে গঙ্গা ও সাধকশ্রেষ্ঠ বীরভদ্রের জন্ম (পৃঃ ৪৪৯)। এই গঙ্গাকে চট্টবংশীয় গৌরীদাসসুত মাধব বিবাহ করেন (ঐ)। নিত্যানন্দের কয় পত্নী। তাহার মধ্যে বসুধাদেবীই বিবাহমন্ত্রের দ্বারা পরিগৃহীতা। জাহ্নবী বাগ্‌দত্তা। ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা। তাঁহাদের সহিত বিবাহে বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করা হয় নাই। কুশণ্ডিকাও হয় নাই। সুতরাং জাহ্নবীর সন্তান হইলেও বীরভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় হওয়ার কথা। অথচ কন্যা পুত্র উভয়ের বংশই নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী বলিয়া প্রসিদ্ধ (সারাবলী, সম্বন্ধনির্ণয়, পৃঃ ৫১১)। বীরভদ্রের কন্যার বিবাহ হয় ফুলের মুখুটি গঙ্গানন্দের পৌত্র পার্বতীনাথের সঙ্গে। তদবধি পার্বতীনাথে বীরভদ্রী দোষ। অরবিন্দ প্রমুখ মনোবংশের মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত গঙ্গার বিবাহ হয় (ঐ)।

এক কলুর কন্যা সর্পাঘাতে মরে। নিত্যানন্দ তাহাকে বাঁচাইয়া তোলেন। কন্যা পরমা সুন্দরী। নিত্যানন্দ মুগ্ধ হইলেন কিন্তু প্রাণ দেওয়ার দরুণ এই কন্যা

১ ১৭৫-৭৬ পৃ.

নিত্যানন্দের সন্তানতুল্যা, তার পরে সে জাতিতে কলু। প্রত্যাদেশ হইল "এই কন্যা বিবাহ কর। ইহাতে কোনো প্রত্যবায় ঘটিবে না।" এই দৈববাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তান্ত্রিকমতে বীরাচারে নিত্যানন্দ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী। জাতির বিচার না করিলেও সন্ন্যাসীর বিবাহ নিষিদ্ধ। তিনি জীবন দেওয়ায় ঐ কন্যার পিতৃতুল্য, তাহার পরে সে কলুর মেয়ে। নিত্যানন্দ মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার দোষ মার্জিত হইলেও তাঁহার পুত্র বীরভদ্রে দোষ স্পর্শিল। বীরভদ্রের তিন পুত্র (ঐ, ৫১২, ৫১৩)। কেহ কেহ বলেন সূর্য দাসের কন্যা জাহ্নবীই নিত্যানন্দের বিবাহিতা। বসুধা ও ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা (ঐ)।

হরিমজুমদারী মেলে অস্পৃশ্যসংসর্গ ও বর্ণসঙ্করবিবাহ দোষ আছে (পৃঃ ৪৯৩), নড়িয়া মেলেও এই দোষ (পৃঃ ৪৯৫)। কাকুৎস্থী মেলে বলাৎকার দোষ আছে (ঐ)। পরিহাল মেলে (পৃঃ ৪৯২), ছয়ী মেলে (পৃঃ ৪৯৬), মেলবিজয়পণ্ডিতী মেলে (পৃঃ ৪৮৮), দশরথঘটকী মেলে (পৃঃ ৪৯৪), ভৈরবঘটকী মেলে (পৃঃ ৪৯৭), শুঙ্গো সর্বানন্দী মেলে (পৃঃ ৪৯৯) ও পণ্ডিতরত্নী মেলেও (পৃঃ ৬০৩) বলাৎকার দোষ আছে। কাকুৎস্থী (পৃঃ ৪৯৩), শুভরাজখানী (পৃঃ ৪৯৫), শ্রীবর্দ্ধনী, দশরথ-ঘটকী (পৃঃ ৪৯৪), মেলবিজয়পণ্ডিতী (পৃঃ ৪৮৮), আচার্যশেখরী (পৃঃ ৪৮৯), দেহাটা ও ছয়ী (পৃঃ ৪৯৬), ধরাধরী ও বালী (পৃঃ ৪৯৮) মেলে যবনদোষ আছে। বাঙ্গালপাশী (পৃঃ ৪৮৮) ও চাঁদাই মেলে (পৃঃ ৪৮৯) অন্ত্যজজাতিসম্পর্ক দোষ ও রাঘব ঘোষালী মেলে অস্পৃশ্যদোষ আছে। বিধবার জারজ সন্তানকে গোলক বলে। শ্রীবর্ধনী মেলে (পৃঃ ৪৯৪) এই দোষ আছে। চরিত্রহীনা ও ব্যাভিচারিণী নারীকে রণ্ড বলে। বাঙ্গালপাশী (পৃঃ ৪৮৮), প্রমোদিনী (পৃঃ ৪৯৪), নড়িয়া ও রায় (পৃঃ ৪৯৫) এবং ছয়ী (পৃঃ ৪৯৬) মেলে এই দোষ আছে। শ্রীরঙ্গভট্টী মেলে ভাট-সংস্রব দোষ দেখা যায় (পৃঃ ৪৯৩)। বাঙ্গালপাশী (পৃঃ ৪৮৮) ও সদানন্দখানী (পৃঃ ৪৯৯) মেলে ধোপাপরিবাদ আছে। মেলবিজয়পণ্ডিতী মেলে (পৃঃ ৪৮৮) কলুপরিবাদ আছে। তাহা ছাড়া চরিত্রহীনতা, অগম্যাগমন, মদ্যপান, নারীঘটিত দোষ কুলশাস্ত্রে কুলীন কুলের সর্বত্র দেখা যায়।[১]

সমাজের দোষ দেখাইয়া নিন্দা করিবার জন্য বা মান্য সব বংশের মানহানি করিবার জন্য এইসব দোষের কথা বলা নয়। গ্রন্থ ও কুলপঞ্জিকার মধ্যে কয়টি দোষেরই বা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক মানুষ যেখানে আছে সেখানে বারবার নানা দোষ

১ কুলগত আরও কিছু কথা এই গ্রন্থ মধ্যেও আছে। ১৭১-১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘটিতেই বাধ্য। তাহাতে মানবসমাজ আজিও রসাতলে যায় নাই। কোনো সময়েই সমাজ নির্দোষ ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। বেদে পুরাণেও তাহা বারবার দেখা গিয়াছে। কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব হইতেও বারবার নানা দোষ ঘটিয়াছে। এখনকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এইসব কথা জানিয়া শুনিয়াও যে এক জাতির লোকে অন্য জাতিকে খোঁটা দেয়, কি কেহ কাহাকেও অস্পৃশ্য বা হেয় করিয়া রাখিতে চাহে, তাহাই অদ্ভুত। এমন জাতি নাই, এমন বংশ নাই, এমন মানুষ নাই, যেখানে দোষ নাই। তবু প্রত্যেক মানুষে সত্য আছে, আদর্শ আছে, ভগবান আছেন তাই প্রত্যেক মানুষই নমস্য ও পূজ্য। এই বিষয়ে প্রাচীনেরা আমাদের চেয়ে উদার ছিলেন। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,

> খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গঃ বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
> বেশ্যাপুত্রো বসিষ্ঠঃ সরুজপদযমঃ সর্বভক্ষো হুতাশঃ।
> ব্যাসোমৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা
> রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ॥

—সম্বন্ধনির্ণয় ধৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্র, পৃঃ ৬৪৩

ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র মলিন, কৃষ্ণ গোপকুলজাত, বসিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র, বিমাতার শাপে যমের চরণ শীর্ণ, অগ্নি সর্বভুক্, ব্যাস মেছুনীর পুত্র, সমুদ্র লবণাক্ত, পাণ্ডবগণ জারজ, শিব প্রেতাস্থিধারী এই কথা কে না জানে। ত্রিভুবনে আসিয়া দোষ কাহার না ঘটিয়াছে?

নির্দেশপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

অথর্ববেদ

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা—সায়ণাচার্য

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুক্রমণিকা—রমানাথ সরস্বতী

যজুর্বেদ, কাঠক সংহিতা

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ

শতপথ ব্রাহ্মণ

ঐতরেয় আরণ্যক

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

বজ্রসূচী বা বজ্রসূচিকোপনিষদ্

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

উশনঃ সংহিতা

কাঠক সংহিতা

কাত্যায়ন সংহিতা

দক্ষ সংহিতা

বসিষ্ঠ সংহিতা

বিষ্ণু সংহিতা

ব্যাস সংহিতা

মনুসংহিতা

মৈত্রায়ণী সংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

শঙ্খ সংহিতা

সংবর্ত সংহিতা

সুশ্রুত সংহিতা

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র

দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র

অগ্নিস্বামিবিরচিত লাট্যায়নাচার্য
প্রণীত শ্রৌতসূত্র, আনন্দ বেদান্তবাগীশ
কৃত প্রথম সংস্করণ

আপস্তম্ব পরিভাষা সূত্র

আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা সূত্র—
Sacred Books of the East

গোভিল গৃহ্যসূত্র

পারস্কর গৃহ্যসূত্র

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র

হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র

গৌতম ধর্মসূত্র

বৌধায়ন ধর্মসূত্র

অত্রি স্মৃতি

আপস্তম্ব স্মৃতি, আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী

দেবলস্মৃতি

পরাশর স্মৃতি

বসিষ্ঠ স্মৃতি

বৃহদ্‌যম স্মৃতি

যমস্মৃতি

লঘু বিষ্ণু স্মৃতি

লঘু শাতাতপ স্মৃতি

স্মৃতি সমুচ্চয়

রামায়ণ

রামায়ণ, বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ

মহাভারত, মূল সংস্কৃত, বঙ্গবাসী সংস্করণ

মহাভারত, বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ

গীতা

হরিবংশ

অগ্নি পুরাণ

আদিত্য পুরাণ

কূর্ম পুরাণ

গরুড় পুরাণ

পদ্ম পুরাণ

প্রভাস খণ্ড (স্কন্দ পুরাণ)

বরাহ পুরাণ
বামন পুরাণ
বায়ু পুরাণ, Biblotheca সং
বিষ্ণু পুরাণ
বৃহদ্ধর্ম পুরাণ
ব্রহ্ম পুরাণ
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
ভবিষ্য পুরাণ
ভাগবত পুরাণ
ঐ —শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য
মৎস্য পুরাণ
মার্কণ্ডেয় পুরাণ
লিঙ্গ পুরাণ
শিব পুরাণ, ধর্মসংহিতা
সৌর পুরাণ
স্কন্দ পুরাণ
অম্বট্‌ঠ সুত্ত
আমগন্ধ সুত্ত
সুত্ত নিপাত
তামিল গ্রন্থ
উত্তর নৈষধ
উত্তররামচরিত
ঐতরেয়ালোচনম্—সত্যব্রত সামশ্রমী
কথাসরিৎসাগর,
Ocean of Story
কুলকল্পতরু
কুলচন্দ্রিকা
কুলার্ণব
চতুর্বর্গ চিন্তামণি, হেমাদ্রি
তন্ত্ররহস্য—রামানুজাচার্য, শাম শাস্ত্রী সম্পাদিত
নির্ণয় সিন্ধু
নৈষধীয় প্রকাশ টীকা
পতঞ্জলির মহাভাষ্য
পরাশর মাধব—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
বর্ণাশ্রম কাণ্ড—বৈদ্যনাথ
বল্লালচরিত
বাজসনেয়ি সংহিতা
বীরমিত্রোদয়
বৃহদ্দেবতা
বৃহন্নারদ পুরাণ
ব্যবহারনির্ণয়, বরদারাজ কৃত
—রঙ্গস্বামী আয়ার সম্পাদিত
মীমাংসা দর্শন
মেলচন্দ্রিকা
রাজতরঙ্গিণী
সংস্কার প্রকাশ
সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, বেদব্যাস পক্ষ
—রঙ্গাচার্য সম্পাদিত (মাদ্রাজ, ১৯০৯)
শূত্রদীপিকা—রুদ্রদত্ত
হরিভক্তিবিলাস
আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ—দেবেন্দ্রনাথ সেন ও
উপেন্দ্রনাথ সেন
কুসুমাঞ্জলিবোধিনী, ভূমিকা
—গোপীনাথ কবিরাজ
চৈতন্যচরিতামৃত
পুরোহিত দর্পণ—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ মাঘ, মণিপুরের জাতি
—কৈলাসচন্দ্র সিংহ
ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
ভারতের সংস্কৃতি
—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী
সম্বন্ধনির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি

A New Account of the East Indies : Captain Hamilton
A Study of Caste : Lakshmi Narasu
Ancient and Modern History : Brigand
Ancient India : Its Invasion by Alexander the Great ; MaCrinde
Asiatic Transactions : Colebrook
Baroda Census
Caste and Race in India : G. S. Ghurye
Castes and Tribes of Southern India : Thurston and Rangachari
Census of India
Census of India, 1901 ; 1921 ; 1231
Census of India, 1921, Assam, pt. 1
Census of India, 1932, Baroda
Census Report of India
Dayananda Commemoration Volume, 1933
Encyclopædia Brittanica, 11th Ed.
Encyclopædia of Religion and Ethics
Epigraphica Indica
Ethnology : Dalton
Evolution of Castes : R. Shama Shastri
Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W. F. Provincee
Hindu Castes and Tribes : Bhattacharya
Hinduism Ancient and Modern : Lala Baijnath (Meerut, 1869)
Indian Antiquary (1932)
Indian Castes
Indian Culture, January 1938
Indian Ethnology : Campbell
Indo-Aryan : Raja Rajendra Lal Mitra
Jainism in Northern India : C. T. Shah
Music of Hindusthan, Introduction : Captain N. A. Willard
Mysore G. O. L. Series
Mysore Tribes and Castes, Vol. IV : Nanjundayya, Ananta Krishna Iyer
Mysticism in Maharastra
Peoples of India : Risley
Punjab Castes
Religion of the Vedas
Sacred Book of Buddhists

Social History of the Races of Mankind ; Featherman
South Indian Inscriptions
The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India :
N. L. De
The History of Caste in India : Sridhar Ketkar
Tribes and Castes of the N. W. P. and Frontier Provinces :
W. Crooke
Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh, vol. 1 : W, Crooke
Vedic Index : Macdonell and Keith
Vedic Mythology : Hopkins
Vedische Studien : Pichel
What the Castes are ; Wilson

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৮	গোপন	প্রকাশ না
৫	১০	জাতিগত	জন্মগত
৮	২৪	চাতুর্বণ্য	চাতুর্বর্ণ্য
৯	২০	বর্ণাং	বর্ণাঃ
১০	১	চতুমু খঃ	চতুর্মুখঃ
১২	২	কর্মভিবর্ণতাং	কর্মভির্বর্ণতাং
১৫	৮	তাহাকেই	তাঁহাকেই
১৫	শেষ	বতমানস্থ	বর্তমানস্থ
১৮	১৬	দৃষ্টাধাবস্থতি	দৃষ্টাধ্যবস্থতি
২৪	৮	এ একটি	একটি
৩৩	১৩	ব্যসিষ্ঠো	বসিষ্ঠো
৩১	১৭	জমদগ্নিরভূদ্ব ক্ষা	জমদগ্নিবভূব্ ক্ষা
৩৫	১	য গ্রাষ্টি	ষত্রাষ্টি
৩৭	১২	আঙ্গরা	অঙ্গিরা
৪৪	১৪	তপস্বারা	তপস্বীরা
৪৮	১৪	শূদ্র	শূদ্রঃ
৪৮	১৫	পিত্রাদি শরীর	পিত্রাদিশরীর
৪৮	২৪	উবশ্যাম্	উর্বশ্যাম্
৫৩	২২	দ্বিজাতিতিঃ	দ্বিজাতিভিঃ
৬২	১৩	দেবং	দ্দেবং
৭১	ফুটনোট	1920	19-20
৭২	১৮	আর্যদের	অনার্যদের
৭৭	৮	ত্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ
৮৭	২৫	সব দেবান্	সর্বদেবান্
৮৮	২৫	দশমাত দশ	দশমাতৃর্দশ
৯১	১৮	বিবরণ	জাতি
৯৩	৭	পুল্যয়োরা	পুল্যরেরা
৯৬	৯	হইয়া	হইবার
৯৭	১৩	আর্যদের	আর্যদের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০২	১৯	়৩	৯৩
১০৮	১০-১১	সার্পরাজ্ঞী নামর্ষিকা	"সার্পরাজ্ঞী নামর্ষিকা"
১০৯	২৩	আর্যতর	আর্যেতর
১১০	১	সুবর্ণদের	সুপর্ণদের
১১০	২০	ঃদেখি	দেখি
১১২	শেষ	পচ্ছন্দ	পছন্দ
১১৬	৯	উষন্তী	উষস্তি
১১৬	২২	অভয়াদক্ষিণা	অভয়দক্ষিণা
১১৭	১৪	করিতেন	করিবেন
১২০	১২	সর্বাধিকারং	সর্বাধিকারঃ
১২০	১৯	পঞ্চদশ	পঞ্চদশঃ
১২২	৫	বরুণপাশাদ	বরুণপাশাদ্
১২২	৬	চোভয়ো রুৎসৃজ	চোভয়োরুৎসৃজ
১৩০	৫	জব্বালের	জব্বলের
১৩৯	২১	সিদ্ধপূরী	সিদ্ধপুরী
১৪১	২	আছে।	আছে।*
১৪৬	১৩	মুসলানদের	মুসলমানদের
১৫৩	৪।৫	আর্য	অর্য
১৫৩	২৫	পূত্র	পুত্র
১৫৪	২১	যস্মে	যস্মে
১৫৪	২৩	শস্থ্যায়ন	শাস্থ্যায়ন
১৬৮	৭	সেবকরা	সেবকেরা
১৭২	২০	দৃষ্টাথ	দৃষ্ট্বাথ
১৭২	২৫	সম্বর	শম্বর
১৭৫	২৭	সংসারা	সংসারী
১৯০	২০	কল্কক	কল্কক
১৯২	৯	ব্রহ্মচর্য	বহ্মচর্য
২০৯	১৫, ১৮ ও শেষ	৭৮	১৪১
২০৯	২৪	শূদ্রোহপি	শূদ্রেহপি
১৪১	ফুটনোট বসিবে	* মহাভারত, আদিপর্ব, ২৩৮, ২৩-২৫	

জাতিভেদ

আমার বাংলা পাণ্ডুলিপি হইতেই সংগৃহীত হইয়া হিন্দীতে "ভারতবর্ষমে জাতিভেদ" নামে গ্রন্থখানি ১৯৪০ অক্টোবরে বাহির হয়। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা বইয়ের পরিশিষ্টখানি খুবই উপাদেয়। তাহাতে নানা জাতির নাম ও সংখ্যা দেওয়া আছে। গ্রন্থাবসানে কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থের নামও আছে।

আমার এই গ্রন্থের নির্দেশপঞ্জী, শুদ্ধিপত্র ও সহায়ক পুস্তকের নাম শ্রীমান অমিয়কুমার সেনের সাহায্যে লিখিত। সেজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।